ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

দ্বিতীয় বর্ষ □ নবম সংখ্যা □ এপ্রিল ২০১৪ □ ৩০ টাকা

Read Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

মহাশ্বেতা দেবীর
আমার মা

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের
অগ্রন্থিত গল্প
ওয়াসিল ঘাট

মর্মালোচনা
শাহজাদা দারাশুকো

শুভাপ্রসন্নর
ধারাবাহিক আত্মকথা
আমার ছবিজীবন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্ট্রিট লেন বাই-লেন

ধারাবাহিক উপন্যাস
নীলকণ্ঠ ঘোষালের
কমলহিরের আলো

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ছিন্নবিচিন্তা

চিঠিপত্রে কমলকুমার
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে
লেখা চিঠি

জাহানারা ইমামের
একাত্তরের দিনগুলি
মুক্তিযুদ্ধের আগুনঝরা দিনের
চাক্ষুষ ধারাভাষ্য। শেষাংশ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
পাগলা গাছের
এলোঝেলো

ভ্রমণ কথা
ঘুরতে ঘুরতে
চলে আসা

কালীকৃষ্ণ গুহর কলমে গ্রিক কথামৃত | কবিতা-পরিচয় | রাজ্যপাট | চণ্ডীমণ্ডপ | বই-ঠেক | ক্ষণের বচন | শব্দবক্র

২৪"×৩০" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতীয় ভাষায় মহিলাদের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র

নারীযুগ

রোজ না পড়লেই নয়

রোজই পাচ্ছেন তো ?

নিশ্চিত পেতে সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে আজই বলে রাখুন

কোথাও না পেলে SMS : 90 51 414 333

অনলাইনেও পড়তে পারেন: www.enarijug.com

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

স্টলে প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে অর্ধেক দামে

এবার ঘরে বসে
অর্ধেক দামে নিয়মিত
পত্রিকা পেতে গ্রাহক হোন

নীচের নামে ও ঠিকানায়
১৮০ টাকার চেক পাঠান

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

অনলাইন গ্রাহক হতে লগ অন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in
Editor's Website: www.amarendrachakravorty.com

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

₹২০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ট-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

দ্বিতীয় বর্ষ। নবম সংখ্যা। এপ্রিল ২০১৪। বৈশাখ ১৪২১

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৭

ক্ষণের বচন ১০। শব্দবক্র ১০

চণ্ডীমণ্ডপ। সেকালের চিৎপুর। চণ্ডী লাহিড়ী ৯

আমার মা । মহাশ্বেতা দেবী ১১

চিঠিপত্রে কমলকুমার ২৩

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি ২৯

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের দলিল

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৩

পাগলা গাছের এলোঝেলো। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ১৯

নি য় মি ত

গ্রিক কথামৃত। কালীকৃষ্ণ গুহ ২১

আত্মজীবনী

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ৩৯

ছিন্নবিচিন্তা । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০

গ ল্প

গল্প লেখার গল্প । শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৪৭

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অগ্রন্থিত গল্প। ওয়াসিল ঘাট ৪৮

ক বি তা র পা তা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ৭৬

কবিতা-পরিচয়

দুঃসময়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭০

নরেশ গুহ ● শুভময় রায় ● দেবেশ রায় ● বিজয়া দাশগুপ্ত

ভ্র ম ণ ক থা

ঘুরতে ঘুরতে চলে আসা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৩৫

স্ট্রিট লেন বাই-লেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্যামবাজার মোড় ৭৮

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

কমলহিরের আলো। নীলকণ্ঠ ঘোষাল ৫৯

রাজ্যপাট। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৪৫

অ ন্যা ন্য

পাঠকের চিঠি ৩৩। বই-ঠেক ৫১

প্রচ্ছদ: ২৪"×৩০" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস
বিষাদগাথা
হারানো অতীত থেকে কাঁপানো বর্তমান
অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস।
নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে
দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র
কিংবা সমকালীন রূপকথা।
₹২০০

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in

ভ্রমণ
www.bhraman.com

ছেলেবেলা
www.echhelebela.com

কালের কষ্টিপাথর
www.ekashtipathar.com

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
কিশোর-উপন্যাস
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি

বরফের বাগান
আন্টার্কটিকার রহস্যময়
তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়
₹১২০

নতুন কিশোর উপন্যাস
গরিলার চোখ ₹৮০

শাদা ঘোড়া ₹৩০

আমাজনের জঙ্গলে
সপ্তম মুদ্রণ ₹৭০

গৌর
যাযাবর
পরিবর্ধিত
নতুন
সংস্করণ ₹১২০

লেখকের অন্যান্য বই: ঋষিকুমার ₹২০ ছেঁড়োকাঁথার গল্প ₹৭৫ ভূতের বাঁশি ₹৪০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি ₹২০

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

মৈত্রেয়ী নাগের
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫

Buy Online ▸ www.swarnakshar.in

সিডি হীরু ডাকাত বই

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে
জমজমাট
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
হীরু ডাকাত
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি
সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়। ₹৯৯

পাগলকরা ছন্দে দম বন্ধ
করা ডাকাতের গল্প

শিশুসাহিত্যে জাতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত।
৯ম মুদ্রণ ₹৪৫

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

১ম খণ্ড। ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০
২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে
থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার
পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা
নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন
বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ কবি। ₹১৫০

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com
www.ekashtipathar.com

আমাদের সব বই
সব পত্রিকা ও
হীরু ডাকাতের সিডি
এখানেও পাওয়া যায়:
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম
চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা ₹৫০ আফ্রিকার জঙ্গলে ₹৫০ আলাস্কা ₹৫০
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০

এছাড়াও: চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। মিশর। নেপাল। ব্যাংকক-পাটায়া। ইন্দোনেশিয়া। মোঙ্গোলিয়া।
সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ। নানা দেশের লোকনৃত্য ও আরও দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণচিত্র।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়: জম্মু ও কাশ্মীর। গোয়া। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান।
অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। বারাণসী। উইক এন্ড।

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

বৈশাখ ১৪২১ □ এপ্রিল ২০১৪

উৎসর্গ

বাংলা গল্প-উপন্যাসের এক আশ্চর্য শিল্পী ও দার্শনিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে এবছর ২৫ মার্চ তাঁর ৮১ বছর পূর্ণ হত। শ্যামলদাকে চিরদিন খুব কাছ থেকে দেখা সত্ত্বেও তাঁর নতুন নতুন গল্প-উপন্যাসের প্রচণ্ড শক্তি ও পরম স্বাতন্ত্র্য তখন-তখনই আমাদের কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাঁর ৮২ বছরের জন্মদিনে আমাদের অতিপ্রিয় এই মানুষটি তথা আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের কালজয়ী এক স্রষ্টাকে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। এই উপলক্ষ্যে এই সংখ্যায় তাঁর একটি অগ্রন্থিত গল্প ও তাঁর শেষ জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'দারাশুকো' নিয়ে নতুন এক গ্রন্থ আলোচনা প্রকাশিত হল।

সম্পাদকীয়

"একটি বাড়িতে ঢুকলে রবীন্দ্রনাথ থেকে পরবর্তী লেখকদের বই ক'টি দেখা যায়? এই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালিদের কাছেই শুনি, অমুকের বই তাদের ভীষণ ভালো লাগে। কিন্তু এত দাম, যে কিনতে পারি না।... বড়দের বই নাকি ভীষণ দামি। আর ছোটদের বই? তখন শুনতে হয়, "বাংলা পড়ে না বলে ওদের সমালোচনা করতে পারো না। বাংলাতে ছোটদের কোনও ইন্টারেস্টিং বই-ই নেই। ইংরেজিতে দেখো তো কী বিশাল রেঞ্জ।" এই সব ডাক্তার, অফিসার, অধ্যাপক, শিক্ষকদের ছেলেমেয়েরা কেমন স্বচ্ছন্দে তারাশঙ্কর-সতীনাথ-বিভূতিভূষণ-মানিক না পড়েও বড় হয়ে যায়। মনেও করে না কী হারালাম। ছোটরাও ওই ভাবে কত বই না পড়ে অজ্ঞ থেকে যায়।"

সম্পাদকের পাতায় এই কথাগুলি সম্পাদকের নয়, বাংলা সাহিত্যের অগ্রগণ্য লেখক, জাতীয়-আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত, নব্বই বর্ষমুখি মহাশ্বেতা দেবীর। অতি সম্প্রতি তাঁর এই ক্ষোভের কথা লিখেছেন 'নারীযুগ' দৈনিক সংবাদপত্রে।

বই না পড়ার পক্ষে যত জনের যত যুক্তি তিনি শুনেছেন, তার সবটাই সবার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সত্যি না হওয়া সম্ভব, সকলেই হয়তো ওই এক ভাবে একই সাফাই গাইবেন না, কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর দুঃখ-ক্ষোভের মর্মকথা তাতে মিথ্যে হয়ে যায় না। চার দিকে বাঙালির জীবনে, সমাজে যথেচ্ছ টানাপড়েন, রুচি ও মূল্যবোধের ঝোড়ো পরিবর্তন লক্ষ্য করলে সাহিত্যানুরাগে ক্রমবর্ধমান ভাটা অনেককেই ভাবাবে। বিশেষ করে ওপার বাংলার সঙ্গে তুলনায় এপার বাংলার এই ভাটা যেন বেড়েই চলেছে। গ্রন্থপ্রেমিক সাহিত্য প্রকাশক, সিগনেট প্রেস-এর কল্পজনক দিলীপকুমার গুপ্ত 'সারস্বত প্রকাশ' পত্রিকায় তাঁর সঙ্গী সম্পাদক বর্তমান কলমচিকে বাংলার বই প্রকাশে রুচি ও চাহিদার নিম্নমুখের কারণ হিসেবে বলেছিলেন, দেশ ভাগের আগে শুধু এক নারায়ণগঞ্জ থেকেই সিগনেটের বইয়ের যত অর্ডার আসত গোটা পশ্চিমবঙ্গের অর্ডারের চেয়ে তা ছিল বেশি।

বাংলাদেশ হবার পর দেখেছি, সে-দেশের বিশিষ্ট কবির জন্মদিনে প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের কয়েকটি পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে শুধুই সেই কবির কথা, কবির লেখা।

কী অতীতের, কী বর্তমানের, কী বড়দের, কী ছোটদের, অসামান্য সব বইয়ের লক্ষ লক্ষ বা এমনকী কোটিকোটি পাঠক বাংলায় আজও কেন হল না সেটা ওপর-ওপর হয়তো বোঝা সম্ভব নয়, সমস্যার মর্মে পৌঁছতে হয়তো ডুব দিতে হবে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও সাহিত্য পাঠের আগ্রহের সমাজতত্ত্বে।

একটা বড় কারণ অবশ্য এখনই বলা যায়। তা হল বাংলা বইয়ের দুর্বল বিপণন। প্রকাশন সংস্থাগুলির সম্মিলিত উদ্যোগের জায়গায় প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ক্ষীণ চেষ্টা। সুপরিকল্পিত, পর্যায়ক্রমিক, সম্মিলিত বিপণন উদ্যোগে বইয়ের চাহিদা কতটা বাড়ানো সম্ভব আজও তার পরীক্ষা হয়নি। সীমিত চাহিদা অনুযায়ী বই ছেপে নিতান্ত আগ্রহী ছোট একটা পাঠকগোষ্ঠীর কাছে বই বিক্রি করাই এখনও বাংলা প্রকাশন শিল্পে একমাত্র প্রচলিত পন্থা। ফোন করলেই বই বা অনলাইন বই কেনার আকর্ষণও শেষ পর্যন্ত সেই নিতান্ত আগ্রহী ছোট পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যেই আটকে থাকছে। বর্তমানের পাঠকপরিধি ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পাঠকদেরও নিশ্চিত পাঠক করে তোলার কোনও চেষ্টা এখনও শুরুই হয়নি।

সম্পূর্ণ অজানা, তিক্ত-কষায় স্বাদের চা প্রথমে যে-কোনও মেলায় খেলায় জনসভায় লোককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিনামূল্যে খাওয়ানো দিয়ে শুরু করে রেলস্টেশনে বা যে-কোনও প্রকাশ্যস্থানে চা পানের 'উপকারীতা'-র দীর্ঘ তালিকার বোর্ড টাঙানো ও সেইসঙ্গে মদ-তাড়ির নেশার কুফলের সূক্ষ্ম উল্লেখ-সহ 'চা তাতায় কিন্তু মাতায় না'-র বিজ্ঞাপন চা-পানকে চাহিদার এমন এক উত্তুঙ্গ স্তরে তুলল যে পরে রাস্তার ভিখিরি সারাদিনের ভিক্ষেলব্ধ গাঁটের কড়ি খরচ করেও চা-পান না করে পারেনি।

বই নিয়ে বাংলায় সেরকম উদ্ভাবনশীল বৈপ্লবিক বিপণন কোথায়?

সর্বজনীন দোল, দুর্গোৎসব, চড়ক, গঙ্গাসাগরের মতো বই পড়াকে সর্বজনের অভ্যাস করে তোলার কল্পনা কই? পরিকল্পনা কোথায়? মানুষের মর্মে ঘা দিয়ে ঘুম ভাঙাবার মানুষেরও হয়তো আজ অভাব।

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা **₹৭৫**

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড | ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০ **দ্বিতীয় খণ্ড** | ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা **₹৬০**

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: **2283 2320** Fax: **2287 6448**
E-mail: **info@swarnakshar.in**

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

চণ্ডীমণ্ডপ

সেকালের চিৎপুর

লেখা ও ছবি: চণ্ডী লাহিড়ী

সেটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল। চিৎপুর অঞ্চলটাই ছিল আসল কলকাতা। এই লেখার যাবতীয় তথ্য আমায় জুগিয়েছে জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ওই পাড়াতেই সে জন্মেছে। বড় হয়েছে। সে আজীবন গবেষক। পুরনো কলকাতার বিখ্যাত মানুষদের কে কোথায় ছিল সে জানে। রবি ঠাকুরের ইস্কুল ওরিয়েন্টাল সেমিনারির সে ছাত্র। ঠিক পিছনেই তার বাড়ি।

এখন যেমন শেয়ার ট্যাক্সি সবাইকে ভাগ ভাগ করে নামাতে নামাতে যায়, কোম্পানির আমলে কেরানিবাবুরা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যেতেন খোলা পালকিতে। ভরা দুপুরে পানের বাটা এবং গড়গড়া হাতে নিয়ে। চিৎপুর রোডে বিভিন্ন বটগাছতলায় পালকির বেহারারা পালকি নামিয়ে, গামছা নেড়ে হাওয়া খেয়ে আবার রাইটার্স বিল্ডিং যেতেন। কোম্পানির কেরানিরা এখানে বসে কোম্পানির হিসেব লিখে রাখতেন বলেই এখনকার মহাকরণের নাম হয়েছিল রাইটার্স বিল্ডিং। শুরুতে ছোট বাড়ি ছিল বলে রাইটার্স বিল্ডিং বলা হত, Buildings নয়। চিৎপুর রোড হল কলকাতার সবচেয়ে পুরনো রাস্তা, যার দু'ধারে ধনী মানুষদের বাস। সেজন্য প্রথম ট্রাম-রাস্তা তৈরি হয়েছিল চিৎপুরে।

বৃন্দাবন বসাকরা ছিলেন সেকালের খুব ধনী জমিদার। বড় রাস্তার বাঁদিকের বাড়িটা ছিল বাবুদের বসতবাড়ি। ডানদিকেরটা কাছারি বাড়ি। অর্থাৎ সেরেস্তা, এখন যাকে অফিস বলে। বাবু যখন বসতবাড়ি থেকে অফিস-বাড়ি যাবেন, গালিচা পেতে দেওয়া হত। বাবু চলে গেলে তোলা হত গালিচা। তার পর ঘোড়ার গাড়ি ছুটত যাত্রী নিয়ে।

ক্ষনের বচন

১০৫
চিৎকারের চেয়ে চিন্তা যদি করো বেশি
সত্যের সাহায্য তুমি পাবে শেষাশেষি।

১০৬
তর্জনে গর্জনে মেঘ যতই কাঁপাক
প্রকৃত বৃষ্টির স্নেহ দ্যায় ভাত-শাক।

১০৭
জীবন আশ্চর্য সৃষ্টি, অল্পেই অসীম
বড় লাভ-লোভে হয় শুষ্ক কাঠ, হিম।

১০৮
নিজগৃহে যদি দ্যাখো নিজ শিশুমুখ
নিজে সুখী হবে তুমি অন্যে দেবে সুখ।

১০৯
দয়ার চেয়েও বড় নেই আর কিছু
আর সব চলে শুধু তার পিছু পিছু।
দয়ামায়া দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও যদি
দেশ চিরে দুঃখ বয় দিগন্ত অবধি।

ক্ষণকথক

ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

১০৬। পুরুষাকার

বিশেষ্য; যে ব্যক্তির আকৃতি ভদ্রলোকের মতো হলেও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তার আচার আচরণ দেখলে মনে নানারকম সন্দেহ হয়।
এদের নিম্নলিখিত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যদিও একজন পুরুষাকারের ক্ষেত্রে একইসঙ্গে একাধিক, এমনকী চারটি বিশেষণই প্রযোজ্য হতে পারে।

১০৭। নির্ভরসা

বিশেষণ; যে পুরুষাকার 'আরে আমি তো আছি', 'সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও' জাতীয় মৌখিক ভরসা হামেশাই দিয়ে থাকে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় কখনওই হাজির থাকে না।

১০৮। পালিয়াৎ

বিশেষণ; যে পুরুষাকারের নামের পাশে পুলিশের খাতায় 'ফেরার' শব্দটি লেখা থাকে। বিভিন্ন জনসভায় এর পরিচিত মুখটি অবশ্য মাঝেমাঝেই দৃশ্যমান হয়।

১০৯। মার্গিলে

বিশেষণ; যে পুরুষাকারকে অন্যায়ভাবে আঘাত করলে বা আঘাতের হুমকি দিলে সে তা বিনা প্রতিবাদে হজম করে ফেলে।

১১০। মারদ

বিশেষণ; প্রতিপক্ষ শারীরিক ভাবে দুর্বল জানলে যে পুরুষাকার কোনওরকম বোঝাপড়ার সুযোগ না রেখে 'হাত থাকতে মুখ কেন' নীতির অবিলম্ব প্রয়োগ ঘটায়।

সেকালে মল্লিক পরিবারের বেশ রমরমা ছিল। জমিদারি উঠে যাবার পর সেসব ঠাটবাট গেছে। তবে ওই বংশে যে এতগুলো পুরুষাকার জন্মাবে তা কে ভেবেছিল! বড়টি এক নম্বরের নির্ভরসা, তিনবার ভোটে হেরে এখন ক্ষান্ত দিয়েছে। মেজোভাইয়েরও আর ভোটে দাঁড়াবার উপায় নেই, সে একজন পাক্কা পালিয়াৎ। ছোটটা একাধারে মার্গিলে এবং মারদ। এ পাড়ার বাচ্চাগুলোর ওপর খুব তড়পায় আর বেপাড়ায় গিয়ে মার খেয়ে আসে।

শব্দবক্রমুণি

আমার মা

মহাশ্বেতা দেবী

এখন শুনি, অনেক মা-মেয়ের জীবনে দুই প্রজন্মের দূরত্ব— প্রায় যেন মেরুপ্রান্তিক ব্যবধান। পরস্পরের মধ্যে ভাব-ভাষার সেতুটিই যেন নড়বড়ে।

মাকে আমার যেমন এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, মায়ের পরের দিকের ছেলেমেয়েরা, নাতি-নাতনিরা তেমন জানে না। তারা তো আর আমার মায়ের সবটুকু দেখেনি। আমরা প্রথম চার জন দেখেছি। মায়ের জন্মের পর নাভির কাছে 'ধ' অক্ষরের মতো একটি চিহ্ন ছিল বলেই নাকি নাম রাখেন মাতামহ, 'ধরিত্রী'। ডাকনাম কমলা। চিরকালই সুন্দরী তবে চোখ একটু ছোট। ছোটবেলা থেকেই ব্যক্তিত্ব ছিল। আমার দিদিমা ছিলেন স্বভাবে সম্রাজ্ঞী। মেয়েদের কারুকে পাঠাননি ইস্কুলে, আর ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো— সব তিনিই করেছেন। মায়ের মেজ মামিমা অনিন্দিতা দেবী, কবি অমিয় চক্রবর্তীর মা, তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়া হলে ভালো ভালো বই মায়েদের পাঠাতেন।

ইস্কুলের চেয়েও কড়া নিয়ম ছিল বাড়ির। ভোরে ওঠা ছিল বাধ্যতামূলক। দেশের বাড়ির সঙ্গে মায়ের আত্মিক

ওপরের ছবিতে নিজের বাড়িতে মহাশ্বেতা দেবী — নিজস্ব চিত্র

যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। এমন এক পরিবেশে মা মানুষ হন, যেখানে গ্রামের বাড়িতেও থাকে লাইব্রেরি ঘর। গ্রামের পরিবেশ যথেষ্ট স্বদেশ-সচেতন। ঢাকাতে দাদামশাই সাধারণ উকিল, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চমানের ত্রৈমাসিক 'প্রতিভা' কাগজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, লেখেন উচ্চমানের প্রবন্ধ। দিদিমা শুধু যে অগাধ পড়াশোনা করেন তা-ই নয়, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসকেও শ্রদ্ধা ও সাহায্য করেন। ফলে মায়ের মনে সাহিত্য ও স্বদেশপ্রেমের বীজ তখনই রোপিত হয়।

বিয়ে করে মা যে পরিবারে এলেন, সেখানেও বইয়ের সাম্রাজ্য। ঠাকুরদা সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী। বাবার সাহচর্যে মায়ের জীবনে আর-এক নতুন দিগন্ত খুলেছিল। বাবা মাকে দিতেন সবুজ সিল্কে বাঁধানো খেয়ালখাতা। ওপরে সোনালি জলে লেখা, 'খেয়ালখাতা-ধরিত্রী দেবী'।

অনেক খাতা ছিল মা-র। কোনও খাতার কোনও পাতাই সাদা ছিল না। মায়ের সাহিত্যরুচি রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত, ধ্রুপদী সাহিত্যপাঠের ঋজুতায় গঠিত। লেখাতেও ছিল তার ছাপ। আর মায়ের ছিল অদম্য জীবনীশক্তি, অস্বাভাবিক মনের জোর, আনন্দময়তা।

ওঁর আঠারো বছর বয়সে, বাবার তেইশে আমি জন্মাই। তারপর একে একে মা দশটি সন্তানের জননী হন। মা-বাবার গভীর বন্ধুত্ব দীর্ঘকাল আমিই দেখেছি। দিনাজপুর, ফরিদপুর, ঢাকা আর ময়মনসিংহে বাবা বদলি হচ্ছেন। মেদিনীপুরের দোতলা বাড়িটি মা ছবির মতো করে সাজিয়েছিলেন। বিকেলে বাবা আপিস থেকে ফেরার আগেই মা গা ধুয়ে চুল বেঁধে একটি টিপ পরে চা-খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করতেন।

১৯৩৬-এ মা অফিসারদের নিয়ন্ত্রিত জীবনাভ্যাসকে চমকে দেন। পঞ্চম জর্জের রাজত্বের রৌপ্যজয়ন্তীতে মায়ের কথার সম্মানে, আমার বাবা— যিনি ছিলেন এক জুনিয়র ইনকাম ট্যাক্স অফিসার— সরকারি হুকুমত অমান্য করেন। বাড়ি সাজাননি আলোয়, আমাদের পরাননি নতুন জামা, নিয়ে যাননি সেই জমায়েতে যেখানে ব্যান্ডে বাজছে, 'গড সেভ দ্য কিং'। সরকার বাবার ওপর খুশি হননি। মায়ের মাথা অনেক উঁচু হয়েছিল সে-দিন। সে-দিনের আমলা-গিন্নিরা তা বোঝেননি।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমার দুর্ভিক্ষত্রাণ কাজে মেতে ওঠার সময় মায়ের ছিল পূর্ণ সম্মতি। দেশের দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, দুর্গতিতে মা পরিধেয় দু'খানি কাপড় রেখে সব কাপড় দিয়ে দিতেন। শেষ বারের মতো নিজেকে জড়ান বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু শিবিরের সহায়তায়। কলকাতায় আসা হয় ১৯৩৯ সালে।

ফ্যান দাও: জয়নুল আবেদিনের তুলিতে বাঙালির চিরস্থায়ী মর্মবেদনার বিখ্যাত খণ্ডচিত্র। ১৯৪৩ সাল। পঞ্চাশের মন্বন্তর

মায়ের কাছে প্রতিবেশিনী কীরকম, তার মাপকাঠি একটাই, বাড়িতে বই আছে না নেই। দুর্ভাগ্য, 'বই নেই' পরিবেশেই জীবনের বহু সময় গিয়েছে ওঁর।

বহু দিন পর্যন্ত মা-বাবা খুব এক সঙ্গে ইংরেজি ছবি দেখতে যেতেন। ফিটনে বেড়িয়ে ফিরতেন। রঙিন সিল্কের শাড়ি পরনে মা, কাঁধে ব্রোচ, চুল সামান্য কান ঢেকে সুঠাম ঘাড়ের একটু উপরে তুলে বাঁধা খোঁপা, কপালে টিপ, সে চেহারা আমার খুব মনে পড়ে।

এমন এক জন মা পেয়েছিলাম, যিনি গয়না গড়াননি কখনও, দামি শাড়ি কেনেননি নিজের জন্য। আমাদের মা বই কিনেছেন, পড়েছেন, পড়িয়েছেন। মায়ের সাহিত্যরুচি ছিল রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত, ধ্রুপদী সাহিত্যপাঠের ঋজুতায় গঠিত। কবিকঙ্কন ও ভারতচন্দ্র থেকে বহু অংশ মায়ের কাছেই শুনেছি। আবার সেই মাকে মুগ্ধ হয়ে সেলমা লাগেরলফ, পার্ল বাক, রেমন্টসের 'পেজেন্টস', শলোকভের 'দন' আর গোর্কির 'মাদার' মুগ্ধ মনোনিবেশে পড়তে দেখেছি। মা স্মৃতি থেকে যেমন শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দদাস, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, মাইকেল, তেমনই শুনিয়েছেন টেনিসন, শেলি, মুর, হুড, ব্রাউনিং। আর চাণক্য শ্লোক মুখস্থ ছিল তাঁর। পরের দিকে ইয়েটসের কবিতাও পড়তে দেখেছি। বড় মামা বম্বেতে মায়ের সঙ্গে পার্ল এস বাক-এর দেখা করিয়ে দেন, উনি অটোগ্রাফ করে মাকে বইও দেন। বাংলার সব ধ্রুপদী উপন্যাস ও প্রবন্ধ মা বার বার পড়েছেন। তাঁর সাহিত্যরুচি ছিল কঠোর ও ঋজু মানের। তরল ভাব, অশিক্ষিত প্রকাশভঙ্গি, অসত্য মূল্য পরিবেশন মা সহ্য করতে পারতেন না।

মায়ের কাছে প্রতিবেশিনী কী রকম, তার মাপকাঠি একটাই, বাড়িতে বই আছে না নেই। দুর্ভাগ্য, 'বই নেই' পরিবেশেই জীবনের বহু সময় গিয়েছে ওঁর। তখন লাইব্রেরি ভরসা! মায়ের লেখা প্রথম কবিতা ছাপা হয় ওঁর সতেরো বছরে, ১৯২৫ সালে। অশেষ সৌভাগ্য আমাদের।

সৌজন্য: নারীযুগ

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

কুড়ি

১৩ ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭১

আজ আটটা-দুটো কারফিউ নেই। আমার বাজার ও রান্না দুই-ই সারা আছে, তবু শরীফের কথামতো আরও চাল ডাল, লবণ, তেল, বিস্কুট ইত্যাদি কেনার জন্য বাজারে বেরলাম। শরীফ গাড়ি নিয়ে অফিসে গেল, জামী বাবার কাছে থাকল, আমি লুলুকে নিয়ে প্রথমে মা'র বাসায় যাওয়ার জন্য বেরিয়ে দেখি রিকশা পাওয়া মুশকিল। সব রিকশাই বোঁচকা-বুঁচকি-স্যুটকেসসহ যাত্রী নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। কোথায় ছুটছে কে জানে। বেশ খানিকটা হেঁটে একটা খালি রিকশা পেলাম। ওটাকে আর ছাড়লাম না।

মা'র বাসায় গিয়ে দেখি ওঁর খালি একতলাটায় লালুর বান্ধবী আনোয়ারা সপরিবারে এসে উঠেছে। ওরা পোস্তগোলার দিকে থাকে, ওখান থেকে ভয় পেয়ে এ পাড়াতে চলে এসেছে। ওদের দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। যাক মা'র জন্য আমাকে আর অত ভাবনা করতে হবে না।

ওই রিকশা নিয়েই বাজার সেরে বাসায় আসতে আসতে বারোটা। যদিও ফ্রিজে রান্নাকরা মাছ-তরকারি আছে, তবু আরও মাছ-গোশত কিনে এনেছি। আবার কখন চব্বিশ ঘণ্টার কারফিউ দেয়, কে জানে। রান্নাঘরে তিনটে চুলো ধরিয়ে গোশত, মাছ আর ভাত বসালাম। একটু পরে শরীফ এল অফিস থেকে। রান্নাঘরে একবার মাত্র উঁকি দিয়েই ছাদে চলে গেল। দেখেই আমার রাগ হল। চেঁচিয়ে জামীকে ডেকে বললাম, 'দাদাকে গোসলখানায় নিয়ে যাও। গোসল হলে ভাত খাওয়াও। খবরদার এখন ছাদে যাবে না। খুনোখুনি হয়ে যাবে তাহলে।'

দুপুরে টেবিলে খেতে বসে আমি একটাও কথা বললাম না। ওরাও সব চুপ। দেড়টা বেজে গিয়েছে। দুটোয় কারফিউ শুরু। খেয়ে উঠেই লুলু চলে গেল।

আমি দু'হাতে ডাল ও গোশতের বাটি তুলে প্যান্ট্রিতে রেখে আবার এ ঘরে আসতেই দেখি, রেডিও বগলে শরীফ গুটিগুটি সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। তার পিছু পিছু জামী। দিনে দিনে ওদের স্বার্থপরতা বাড়ছে। আগে তবু নীচে থাকত, সাইরেন বাজলে কিংবা প্লেনের শব্দ পেলে তখন দুদ্দাড় উঠে যেত এখন তাও করে না। আগে থেকেই উঠে গিয়ে বসে থাকে। দাঁত কিড়মিড় রাগের মধ্যেই হঠাৎ খেয়াল হল আরে! আমিই তো শরীফকে বলেছি সবসময় অমন দুদ্দাড় করে জোরে সিঁড়ি না ভাঙতে— ভাত খাওয়ার পর তো নয়ই। ওতে শরীরের ক্ষতি হতে পারে।

একা একাই হেসে ফেললাম। কী যে ছেলেমানুষের মতো রাগ করি। যুদ্ধের টেনশান আমারও মন মাথায় ঢুকে গিয়েছে দেখছি। তাছাড়া শরীফেরও তো কষ্ট কম নয়। আগস্ট মাসে পাক আর্মি ওর ওপরে যে টর্চার করেছিল, তারপর থেকে ওর শরীরটা আর আগের মতো নেই। যদিও অফিস করছে, আমার সঙ্গে পাগলা বাবার বাসায় যাচ্ছে, টেনিস খেলছে, শত্রুর নাকের ডগায় বসে বিপজ্জনক কাজ-কারবারের বিলি বন্দোবস্ত চালিয়ে যাচ্ছে, তবু ক্রমাগত ওঁর ওজন কমে যাচ্ছে। আজকে দুপুরে খাওয়ার সময় ওর মুখটা খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে দোতলায় উঠে বাথরুমে ঢুকলাম। দু'দিন গোসল করা হয়নি, গোসলটা সেরেই ছাদে রোদে গিয়ে বসব। যদিও সব ব্যবস্থা নীচেই, তবু নিজের বাথরুমে গোসল না করলে আমার তৃপ্তি হয় না। তাই প্লেনের কড়কড়ানি থাকলেও সেটা খানিকক্ষণের জন্য উপেক্ষাই করি।

বেডরুমে আমাদের ডবল খাটে ছোবড়ার জাজিম উদোম হয়ে পড়ে রয়েছে। ওপরের পাতলা তোষক, চাদর, বালিশ, সব নীচে। আজ ভোরে ফজরের নামাজের পরে আমরা দুজনে খানিকক্ষণের জন্য এই খসখসে ছোবড়ার গদির ওপর এসে শুয়েছিলাম।

গোসল সেরে বেডরুমে পা দিয়েই চমকে গেলাম। শরীফ ছোবড়ার গদির ওপরে এলোমেলোভাবে উবুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। ছুটে ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'কী হয়েছে? এখানে এমনভাবে শুয়ে কেন?'

শরীফ খুব আস্তে বলল, 'বুকে ব্যথা করছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।'

পিঠে হাত দিয়ে দেখলাম ঘামে গেঞ্জি-শার্ট ভিজে সপসপ করছে। ওগুলো খুলে গা মুছিয়ে শুকনো জামা পরিয়ে দিলাম। তারপর ফোন তুলে ডাঃ এ কে খানকে ডাকলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে চলে এলেন।

স্টেথস্কোপ দিয়ে শরীফকে পরীক্ষা করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'পা ঝিনঝিন করছে কি? ঘাম হয়েছিল?'

শরীফ বলল, 'পা ঝিনঝিন করছে।'

আমি বললাম, 'ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছিল। এই দেখুন আবার ঘামছে।

এ কে খানের মুখ গম্ভীর হল। ব্যাগ থেকে একটা অ্যামপুল বের করে শরীফকে ইনজেকশান দিলেন। তারপর বললেন, 'এটা ওর প্রথম হার্ট অ্যাটাক। এটার জন্য যে ওষুধ দরকার, তা আমার কাছে ছিল, দিয়েছি। কারও কারও দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাক খুব তাড়াতাড়ি হয়। সেরকম হলে আমার কাছে আর ওষুধ নেই। সুতরাং সময় থাকতে হাসপাতালে রিমুভ করাই ভালো।'

বাঁ পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ডাঃ রশীদ পিজি-র সুপারিন্টেডেন্ট। ওঁকে ফোন করে পি জি তে শরীফের ভর্তির ব্যবস্থা এবং অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অনুরোধ করলাম।

কে জানে কদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। এ কে খান বললেন, 'কিছু কাপড়জামা, বিস্কুট, এক বোতল পানি, মোমবাতি, টর্চ এগুলো গুছিয়ে সঙ্গে নিন।'

শরীফ বলল, 'বাঁকা আর মঞ্জুরকে ফোন করে খবরটা দাও। বাঁকা কিন্তু উয়ারীতে থাকছে না। ওকে অফিসের তিনতলার ফোনে পাবে।'

ফোন ঘোরালাম। মঞ্জুরের ফোন

আমি ফোনের খোঁজে দরজা দিয়ে বারান্দায় এসে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার দেখে হতাশ হয়ে আবার ঘরের ভেতর ঢুকে তাকিয়েই আঁতকে উঠলাম। পি জি-র কর্তব্যরত ডাক্তার দু'জন শরীফের বেডের দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাতে করে কার্ডিয়াকে ম্যাসাজ দিচ্ছেন। আমি এ কে খানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মেশিনটা? মেশিনটা লাগাচ্ছেন না কেন?'

এনগেজড, বাঁকার ফোন কেউ ধরছে না। অ্যাম্বুলেন্স এসে গিয়েছে। এ কে খানও আমাদের সঙ্গে হাসপাতালে যাবেন বলেছেন। সানু এসে রাতে এ বাড়িতে থাকবে। কারণ বাবা বেশি বুড়ো, অথর্ব। আর জামী ছেলেমানুষ। রাতে আবার যদি কিছু হয়, জামী একা সামাল দিতে পারবে না।

এখন বিকেল পাঁচটা। এলিফ্যান্ট রোডের নির্জন রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার দ্রুত চারদিক ঢেকে ফেলেছে। এরই মধ্যে পশ্চিম আকাশের লালচে রংটা কেমন যেন ভয়াবহ দেখাচ্ছে। চারদিকে ফুটফাট শব্দ হচ্ছে— বন্দুকের, গ্রেনেডের। মাঝে-মাঝে ঠাঠাঠাঠা— মেশিনগানের। প্লেনের আনাগোনা কেন জানি খানিকক্ষণ নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে জিপ বা মাইক্রোবাস হুস করে চলে যাচ্ছে।

শরীফকে পি জি-র তিনতলায় ইনটেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের সামনে তোলা হয়েছে। ভেতরে বেড রেডি করা হচ্ছে, শরীফ বারান্দার মেঝের স্ট্রেচারের ওপর শুয়ে। তার বাঁ পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে আমি তার হাত ধরে রয়েছি। ডান পাশে দাঁড়িয়ে এ কে খান আর পি জি-র ডিরেক্টর প্রফেসর নুরুল ইসলাম।

প্রফেসর ইসলাম আমাদেরও বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচিত। উনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বলে দিচ্ছেন: ধোপার ধোয়া চাদর যেন বের করে পাতা হয়, কম্বল যেন পরিষ্কার দেখে দেওয়া হয়। কোনওদিক দিয়ে যত্নের যেন ত্রুটি না হয়।

ইনটেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের ডাক্তার, নার্স ও ওয়ার্ড বয়দের স্পেশাল কেয়ার নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে প্রফেসর নুরুল ইসলাম দোতলায় নেমে গেলেন। দোতলার কেবিনগুলোতে পি জি-র অনেক ডাক্তার সপরিবারে এসে উঠেছেন। প্রফেসর ইসলামও তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে একটা কেবিনে আছেন।

দেখতে দেখতে গোধূলির আবছায়া মুছে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ইনটেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের কাচের জানালাগুলো বিরাট বিরাট— সব দরজার মাপের। কোনও কাচে কাগজ লাগানো নেই, পর্দাগুলো টেনে ঠিকমতো ঢাকা যায় না— কোনওখানে পর্দা নেই।

শরীফকে তার পরিষ্কার চাদরপাতা বেডে তোলা হয়েছে। এর মধ্যেও শরীফ আমাকে বলছে, 'মঞ্জুরকে ফোন করে খবরটাও দাও।' এ কে খান বলেছেন, 'শরীফ একদম কথা বলবে না। চুপচাপ রেস্টে থাকো।'

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি আমার ব্যাগ থেকে একটা মোমবাতি বের করে জ্বালাতেই পি জি-র কর্তব্যরত ডাক্তার হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'বন্ধ করুন। নীচে গার্ডরা দেখলে চিল্লাচিল্লি করবে।'

আমি হকচকিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে বললাম, 'কিছু যে দেখা যাচ্ছে না, কাজ করবেন কী করে?'

'টর্চ আছে? টর্চ থাকলে দিন।' অন্য একজন ডাক্তার বললেন, 'গার্ডগুলো এমন হারামি না, বাতি দেখলেই ওপর মুখ করে গুলি ছুড়ে বসে।'

শরীফ বলল, 'আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অক্সিজেন...'

'অক্সিজেন সিলিন্ডার আনতে গিয়েছে। বুঝলেন, অক্সিজেনের একটু ঘাটতি আছে।'

এখান প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে। এখনও অক্সিজেন এল না। শরীফের শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। ডাঃ এ কে খান ওর নাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। শরীফ বলল, 'অক্সিজেনের জন্য মঞ্জুরকে ফোন করো। ও জোগাড় করে দিতে পারবে। ডা এ কে খান বললেন, 'কথা বোলো না একদম চুপচাপ রেস্টে থাকো।'

অক্সিজেন সিলিন্ডার একটা নিয়ে এল ওয়ার্ড বয়। কিন্তু সিলিন্ডারের মুখের প্যাঁচটা খোলার রেঞ্চটা আনেনি।

'রেঞ্চ কই? রেঞ্চ আনো, শিগগির।' একজন ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন।

'রেঞ্চ তো স্যার দুতলায় নিয়া গিয়েছে।'

হাত দিয়ে সিলিন্ডারের মুখে প্যাঁচটা ঘোরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে কর্তব্যরত ডাক্তার আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ ওয়ার্ডের রেঞ্চ

কেন দোতলায় দেওয়া হয়েছে? দৌড়াও, রেঞ্চ নিয়ে এসো।'

অন্ধকারে সাবধানে হোঁচট বাঁচিয়ে ওয়ার্ড বয়টা দৌড়লো।

শরীফ খুব ছটফট করছে। এ কে খান তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বারবার মৃদুকণ্ঠে বলছেন, 'একটু ধৈর্য ধরে চুপচাপ থাকো শরীফ। একদম কথা বোলো না, নোড়ো না। এখনই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

শরীফ ছটফটানির মধ্যেই আবার জিজ্ঞেস করল, 'মঞ্জুরকে ফোন করতে পেরেছো?'

আমার কান্না পাচ্ছে। এই অন্ধকারে কোথায় ফোন কোনদিকে যাব? আমার আনা টর্চটা নিয়েই ডাক্তাররা কী কী যে করছে, কিছুই বুঝি না।

একজন ডাক্তার হঠাৎ এ কে খানকে বলল, 'স্যার পেশেন্টকে পাশের ছোট ঘরটাতে নিয়ে যাই, ওখানে জানালা নেই, মোমবাতি জ্বালানো যাবে। ওখানে ডিফিব্রিলেটার মেশিনটা আছে।'

অতএব, আবার শরীফকে স্ট্রেচারে তুলে টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে পাশের ছোট ঘরে নেওয়া হল। ঘরটা আসলে অন্য একটা ঘরের কিছুটা অংশ পার্টিশন করা— সরু অংশ। একটি মাত্র বেড, বেডের পাশে একটা মেশিন। দু'পাশে এত কম জায়গা দু'তিনজন লোক কোনওমতে দাঁড়াতে পারে। এখানে এসে একটা মোমবাতি জ্বালালাম। শরীফকে বেডে তোলা হল। আমি ফোনের খোঁজে দরজা দিয়ে বারান্দায় এসে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার দেখে হতাশ হয়ে আবার ঘরের ভেতর ঢুকে তাকিয়েই আঁতকে উঠলাম। পি জি-র কর্তব্যরত ডাক্তার দু'জন শরীফের বেডের দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাতে করে কার্ডিয়াকে ম্যাসাজ দিচ্ছেন। আমি এ কে খানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মেশিনটা? মেশিনটা লাগাচ্ছেন না কেন?'

শরীফের বুকে হাতের চাপ দিতে দিতে একজন ডাক্তার বললেন, 'লাগাব কী করে? হাসপাতালের মেইন সুইচ বন্ধ। ব্ল্যাক আউট যে।'

'হাসপাতালের মেইন সুইচ বন্ধ রেখে ব্ল্যাক আউট? এমন কথা তো জন্মে শুনিনি। তাহলে মরণাপন্ন রোগীদের কী উপায় হবে? লাইফসেভিং মেশিন চালানো যাবে না?'

১৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

শরীফকে বাসায় আনা হয়েছে সকাল দশটার দিকে। মঞ্জুর, মিকি— এরা দু'জনে ওদের পরিচিত ও আত্মীয় পুলিশ অফিসার ধরে গাড়িতে আর্মড পুলিশ নিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা পিকআপ জোগাড় করে হাসপাতাল থেকে ওকে নিয়ে এসেছেন।

সকালবেলায় প্লেনের আনাগোনা একটু

হঠাৎ ভীষণ ঝড়ঝড় শব্দে প্লেন উড়ে গেল, মনে হল যেন আমাদের বাড়ির ছাদ ধসিয়ে দিয়ে গেল। তার পরপরই ভীষণ আর্তনাদে চারদিক ছেয়ে গেল। আমরা সবাই চকিত হয়ে উঠলাম। কী ব্যাপার! আশপাশে কোথাও বোমা পড়ল নাকি?

কমই ছিল। আজ কারফিউ ওঠেনি। তবু আমাদের গলিটা কানা বলে, খবর পেয়ে সব বাড়ির লোকেরা এসে জড় হতে পেরেছেন। খবর পেয়ে আনোয়ার তার বোর্ড অফিসের মাইক্রোবাসটা অনেক ঝঞ্ঝাট করে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে এসেছে শেলি আর সালাম। ওই মাইক্রোবাস পাঠিয়ে মা আর লুলুকে আনা হয়েছে ধানমন্ডির বাসা থেকে। মঞ্জুর তার গাড়িতে কয়েকটা ট্রিপ দিয়ে এনেছেন বাঁকাকে, ফকিরকে, আমিনুল ইসলামকে। ডাব্লিউ আর খান জোগাড় করে দিয়েছেন কাফনের কাপড়।

বাড়ির পাশের খালি জায়গাটাতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোক দুপুর সাড়ে বারোটায় জানাজায় শামিল হলেন। চার-পাঁচটা গাড়িতে করে জনাকুড়ি লোক গোরস্থানে গেলেন। সানু, খুকু, আর মঞ্জু আমার কাছে রইল। বাবা একেবারে নির্বাক হয়ে তাঁর ইজিচেয়ারে পড়ে রয়েছেন।

দেড়টা থেকে হঠাৎ প্লেনের কড়কড়ানি বেড়ে গেল। বারে বারে খুব নিচু দিয়ে প্লেন এলিফ্যান্ট রোড এলাকার ওপর ভীষণ শব্দ করে উড়ে যেতে লাগল। যারা গোরস্থানে গিয়েছে তাদের জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। দুটোর মধ্যে সবাই ফিরে এলেন। জামীকে পৌঁছিয়ে আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে যে যার বাসায় চলে গেলেন। আমার দুই ভাগনি ইভা ও সুরত, জামীর বন্ধু আলী, মা আর লুলু এ বাসায় রয়ে গেল।

গত রাত থেকে কিছু মুখে তুলতে পারিনি, আলসারের ব্যথা নিয়ে নিঃসাড়ে বিছানায় পড়েছিলাম। ওধারে মা বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদছেন, লালু বাবার হাত ধরে মৃদুকণ্ঠে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। জামী এসে সামনে দাঁড়িয়ে হুহু করে কেঁদে উঠে বলল, 'মা আমার আর যুদ্ধ করা হল না।'

আমি উঠে বসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, ও কান্নার সঙ্গে চিৎকার করে হাত-মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল, 'আমি ওদের দেখে নেবো। ওরা ভাইয়াকে কেড়ে নিয়েছে, ওরা আব্বুকে খুন করেছে, ওদের ছেড়ে দেবো না।'

আলী এসে জামীকে ধরে ওপাশে নিয়ে গেল, মা কান্না থামিয়ে ওর কাছে গেলেন।

হঠাৎ ভীষণ ঝড়ঝড় শব্দে প্লেন উড়ে গেল, মনে হল যেন আমাদের বাড়ির ছাদ ধসিয়ে দিয়ে গেল। তার পরপরই ভীষণ আর্তনাদে চারদিক ছেয়ে গেল। আমরা সবাই চকিত হয়ে উঠলাম। কী ব্যাপার! আশপাশে কোথাও বোমা পড়ল নাকি?

সকাল থেকেই বহুজনের মুখে গুজব শুনছি নিয়াজী নাকি এলিফ্যান্ট রোডের একটা হলুদ রঙের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। আরও শুনছি, মোহসীন হলে, ইকবাল হলে, সলিমুল্লা হলে পাক আর্মিরা পজিশান নিয়েছে। তাই এ পাড়ায় এত ঘন ঘন, এত নিচু দিয়ে ইন্ডিয়ান প্লেন উড়ছে।

একটু পরেই আমাদের দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। কিন্তু তা মুহূর্ত মাত্র। ধাক্কার সঙ্গে বহু কণ্ঠের কান্না ও কথার শব্দ ভেসে আসতেই আমরা সবাই দৌড়ে দরজার দিকে গেলাম। জামী দরজা খুলতেই দেখি বারান্দায় রক্তাক্ত দেহে এলিয়ে পড়ে আছে সামনের বাঁদিকের বাড়ির আকবর, ওকে ঘিরে ওদের বাড়ির সবাই— কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে মাতম করছে। ওদের পাশের বাড়ির আমির হোসেনরাও সবাই ভয়-বিস্ফোরিত চোখে দাঁড়িয়ে।

কান্না, আর্তনাদ এবং টুকরো কথার ভেতর দিয়ে ঘটনা জানা গেল। আকবরদের বাড়িতে বোমা পড়েছে। ওরা প্লেনের শব্দ শুনেই ছাদে দৌড়েছিল, বোমা পড়বে ভাবতে পারেনি। বোমার আঘাতে আকবরদের বাড়ির পিছনের অংশ এবং আমির হোসেনদের বাড়ির কোণা ধসে গিয়েছে। দুটো ছোট ছেলেমেয়ে ছাদে মারা গিয়েছে, আকবর গুরুতর জখম। ও বাড়ির সবাই আকবরকে তুলে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে।

জামী আর আলী রক্তাক্ত আকবরকে তুলে ভেতরে এনে ডিভানটার ওপর শুইয়ে দিল। বাকিরা কেউ সোফায়, কেউ চেয়ারে, কেউ মেঝেতে পড়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। আমার দু'দিনের না-খাওয়া শরীরে কোথা থেকে জোর এল জানি না। বাড়িতে তিনজন সদ্য পাশ করা ডাক্তার ইভা, সুরত ও খুকু। আমি ওদেরকে বললাম, 'তোরা প্রথমে দেখ কার কতটা জখম হয়েছে। আমি মেডিক্যাল ফোন করছি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য।' ভাগ্যক্রমে একবার ডায়াল করেই মেডিক্যালে হাসপাতাল পেয়ে গেলাম। বাসার ঠিকানা ও ডিরেকশান দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য অনুরোধ করলাম।

আকবর ছাড়াও দু'চারজনের জখম বেশ গুরুতর। যারা জখম হয়নি তারাই বেশি কান্নাকাটি করছে। এক শিশি ভ্যালিয়াম-টু ইভার হাতে দিয়ে বললাম, 'প্রত্যেককে পাইকারি হারে দুটো করে খাইয়ে দাও। ওদের একটু শান্ত হওয়া দরকার। খুকু তুমি পানির জগ আর গ্লাস নাও।'

ভ্যালিয়াম খাওয়ানো শেষ হলে খুকু, ইভা ও সুরতকে কিছু তুলো, আয়োডিন, ডেটল, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি দিয়ে বললাম, 'যতটা পার ফার্স্ট এইড দাও।'

সাড়ে চারটে বাজে। আরেকটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আমি, আমির হোসেন, বাবলু, সাজ্জাদ ও আরও কয়েকজনকে বললাম, 'তোমরা প্লেনের শব্দ কমলেই দৌড়ে বাড়ি গিয়ে রান্নাকরা খাবার, বাচ্চার দুধের টিন, চালের টিন, আটার টিন, এক এক করে নিয়ে এসো। রাতে মেঝেয় শোয়ার মতো লেপ-তোষকও নিয়ে এসো।'

আজ সারাদিন কলকাতা রেডিও খোলা আছে। বারবার শুনতে পাচ্ছি— পাক আর্মিকে সারেন্ডার করার নির্দেশ। এজন্য আজ বিকেল পাঁচটা থেকে আগামীকাল সকাল নটা পর্যন্ত আকাশযুদ্ধ বন্ধ থাকবে— বলা হচ্ছে।

গেস্টরুমের তালাটা ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা, একফাঁকে দেখে এলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে রসদ জমিয়েছি, তা কিছুতেই এখন খরচ করব না। তাছাড়া ওদের ঘরে তো আছেই। ওগুলো নষ্ট করার দরকার কী?

পাঁচটার সময় অ্যাম্বুলেন্স এল। আকবরসহ বাদবাকি আহত সবাই এবং তাদের দেখাশোনার জন্য সুস্থ কয়েকজন অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে মেডিক্যাল হাসপাতালে চলে গেল।

দশ মিনিট পরেই আরেকবার ভীষণ শব্দে চারপাশ কেঁপে উঠল। এবার মনে হল আমাদের পিছনে দিকের গলিতে বোমা পড়েছে। ফট করে কারেন্ট চলে গেল। ফোন

তুলে দেখি ওটাও ডেড! ব্যস, এবার ষোলোকলা পূর্ণ হল। ফ্রিজ চলবে না, পানির পাম্প চলবে না। কেরোসিন ফুরোলে ইলেক্ট্রিক হিটার দিয়ে কাজ সারা যাবে না। কারফিউর সময় ফোনটাই ছিল একমাত্র যোগসূত্র। সেটাও গেল। এখন সত্যি সত্যি কবরখানা।

সারা মেঝেজুড়ে বিছানা পাতা হয়েছে। সিঁড়ির ঠিক নীচে খাটে প্রথমে বাবা, তারপর জামী ও আলী। নীচে মেঝেয় খাট ঘেঁষে আমি, ইভার, সুরত, মা, লালু। আমাদের পরে প্রথমে আকবরের ভাবীর মেয়েরা, তারপর ওদের বাড়ির পুরুষরা। ওদের পরে আমির হোসেনদের বাড়ির পুরুষরা, তারপর ওদের বাড়ির মেয়েরা। ওদের বিছানা ঘরের ওপাশের দেয়ালে খাবার টেবিলের পা পর্যন্ত গিয়েছে।

রাত দুটোর সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কারা যেন ডাকাডাকি করছে জামীর নাম ধরে। উঠে টর্চ জ্বালালাম, জামী জানালার কাছে গিয়ে একটা পাল্লা খুলল। আমাদের বাড়ির একদম নাক বরাবর সামনের বাড়ির হোসেন সাহেবের গলা। ওঁদের পিছনের বাড়ির কোনায় আগুন জ্বলছে। কী করে আগুন ধরেছে কে জানে। কিন্তু এখন যদি ওপর থেকে দেখে কোন প্লেন বোমা ফেলে?

আমি বললাম, 'জামী আলী বাবলু আর সাজ্জাদ তোমরা গরম জামা পরে নাও। হোসেন সাহেবের বাড়ির ছাদে উঠে দেখবে কীভাবে আগুনটা নেভানো যায়।'

মা'র গলা শোনা গেল, 'এর মধ্যে আবার জামী কেন? ও ছোট ছেলে, ওর যাওয়ার দরকার নেই।' বাবলু সায় দিল হ্যাঁ, হ্যাঁ, জামীর যাওয়ার দরকার নেই।' আমি ধমকের সুরে বললাম, 'না, জামী অবশ্যই যাবে।'

আমি গেস্টরুম থেকে মোটা দড়ির একটা বান্ডিল আর মাঝারি একটা বালতি এনে রাখলাম। ওরা গরম কাপড় পরে দড়ি-বালতি নিয়ে হোসেন সাহেবের বাড়ি গেল।

১৫ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭১

আজ হোসেন সাহেব এবং ওঁর নীচতলার ভাড়াটে আসলাম সাহেব সপরিবারে আমাদের বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এখন ছেলে-বুড়ো মিলে পঁয়তাল্লিশজন লোক আমার বাসায়।

আজ সারাদিন কান ঝালাপালা করে রকেটিং এবং স্ট্রেফিং চলছে। সারাদিন কানে তুলো, ঘাড়ে লেপ, মাথা বিছানায় গোঁজা।

আজ সাড়ে আটটা- সাড়ে বারোটা কারফিউ নেই। খবর পেলাম গতকাল পিছনের গলির এক বাড়িতে বোমা পড়ে শরীফের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার তোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে মারা গিয়েছে। ওই বোমার আঘাতেই গতকাল

আজ ভোরে বাসায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হল। সবাই কাঁদতে লাগলেন। আমি কাঁদতে পারলাম না। জামীর হাত শক্ত মুঠিতে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ইলেক্ট্রিক এবং টেলিফোনের তারও ছিঁড়েখুঁড়ে গিয়েছে।

আজ সারাদিন কলকাতা রেডিও খোলা আছে। বারবার শুনতে পাচ্ছি— পাক আর্মিকে সারেন্ডার করার নির্দেশ। এজন্য আজ বিকেল পাঁচটা থেকে আগামীকাল সকাল নটা পর্যন্ত আকাশযুদ্ধ বন্ধ থাকবে— বলা হচ্ছে।

এইরকম মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণের মধ্যেই সারা সকাল ধরে এসেছে ইলা, বাদশা, আত্তা ভাই, কলিম, নজলু, হুদা, রেণু, মঞ্জুর, আতিক, হামিদা, জুবলী, রফিক, মাসুমা। সবাই এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর আমি সবাইকে বকছি এরকম স্ট্রেফিংয়ের মধ্যে কেন বেরিয়েছে? মাথার ওপর প্লেনের শব্দ হলেই ওদেরও দু'হাতে কান চেপে বিছানায় মাথা গুঁজে বসতে বলছি। মঞ্জুর বললেন যে গভর্নমেন্ট হাউসে হেভি বম্বিং হয়েছে। বাঁকাকে তাই মতিঝিলের অফিস থেকে তুলে ধানমন্ডিতে তার ভাগনে প্রিন্সের বাড়িতে দিয়ে এসেছেন। গভর্নর মালেক হোটেল ইন্টারকনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ইন্টারকনকে এখন ইন্টারন্যাশনাল জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

লুলু গত দু'দিন আসতে পারেনি। আজ এগারোটার দিকে এসে ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না মাত্র দেড় দিনের ব্যবধানে শরীফের হার্ট অ্যাটাক, মৃত্যু, জানাজা এবং দাফন পর্যন্ত শেষ! বিছানায় মাথা গুঁজে অবোধ শিশুর মতো কাঁদতে লাগল সে।

এর মধ্যে রান্নাঘরের দিকটাও সামলাতে হচ্ছে। ছটি বাড়ির ছটি বিভিন্ন পরিবারের পঁয়তাল্লিশজন লোকের রান্নার দায়িত্ব কেউই আগবাড়িয়ে নিচ্ছে না। অগত্যা লক্ষ্ণৌয়ি আদব-কায়দা বিসর্জন দিয়ে আমাকেই আগ বাড়াতে হল। একেবারে নাম ধরে ধরে ডেকে সকালের নাশতা ও চা বানানো থেকে শুরু করে দুপুর ও রাতের রান্না ও পরিবেশনের ডিউটি বণ্টন করে চার্ট বানিয়ে দিলাম।

এই ডামাডোলের মধ্যে বাবার জন্য স্পেশাল রান্না করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঞ্জু সমাধান করে দিল এ সমস্যার। ওদের বাসা থেকে বাবার জন্য সকালের নরম রুটি, দুপুরে

নরম ভাত, কম মশলার মাছের ঝোল, এসব করে বয়ে এনে বাবাকে খাওয়াচ্ছে।

১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সকাল ন'টা পর্যন্ত যে আকাশযুদ্ধ বিরতির কথা ছিল, সেটা বিকেল তিনটে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। দুপুর থেকে সারা শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। পাক আর্মি নাকি সারেন্ডার করবে বিকেলে। সকাল থেকে কলিম, হুদা, লুলু যারাই এল সবার মুখেই এক কথা। দলে দলে লোক জয় বাংলা ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কারফিউ উপেক্ষা করে। পাকসেনারা, বিহারিরা সবাই নাকি পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে পথেঘাটে এলোপাতাড়ি গুলি করে বহু বাঙালিকে খুন-জখম করে যাচ্ছে। মঞ্জুর এলেন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে, গাড়ির ভেতরে বাংলাদেশের পতাকা বিছিয়ে। তিনিও ওই এককথাই বললেন। বাদশা এসে বলল, এলিফ্যান্ট রোডের আজিজ মোটরসের মালিক খান জিপে করে পালাবার সময় বেপরোয়া গুলি চালিয়ে রাস্তার বহু লোককে জখম করেছে।

মঞ্জুর যাওয়ার সময় পতাকাটা আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'আজ যদি সারেন্ডার হয়, কাল সকালে এসে পতাকাটা তুলব।'

আজ শরীফের কুলখানি। আমার বাসায় যাঁরা আছেন, তাঁরাই সকাল থেকে দোয়া দরুদ কুল পড়ছেন। পাড়ার সবাইকে বলা হয়েছে বাদ মাগরেব মিলাদে আসতে। এ কে খান, সানু, মঞ্জু, খুকু সবাই বিকেল থেকেই এসে কুল পড়ছে।

জেনারেল নিয়াজী নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে আজ বিকেল তিনটের সময়।

যুদ্ধ তাহলে শেষ? তাহলে আর কাদের জন্য সব রসদ জমিয়ে রাখব?

আমি গেস্টরুমের তালা খুলে চাল, চিনি, ঘি, গরম মশলা বের করলাম কুলখানির জর্দা রাঁধবার জন্য। মা, লালু, অন্যান্য বাড়ির গৃহিণীরা সবাই মিলে জর্দা রাঁধতে বসলেন।

রাতের রান্নার জন্যও চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি এখান থেকেই দিলাম। আগামীকাল সকালের নাশতার জন্যও ময়দা, ঘি, সুজি, চিনি, গরম মশলা এখান থেকেই বের করে রাখলাম।

১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

আজ ভোরে বাসায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হল। মঞ্জুর এসেছিলেন, বাড়িতে যাঁরা আছেন, তারাও সবাই ছাদে উঠলেন। ২৫ মার্চ যে ফ্ল্যাগপোলটায় বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে আবার নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেই ফ্ল্যাগপোলটাতেই আজ আবার সেদিনের সেই পতাকাটাই তুললাম।

সবাই কাঁদতে লাগলেন। আমি কাঁদতে পারলাম না। জামীর হাত শক্ত মুঠিতে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গত তিনদিন থেকে জামীকে নিয়ে বড়ই দুশ্চিন্তায় আছি। শরীফের মৃত্যুর পর থেকে ও কেমন যেন গুম মেরে আছে। মাঝে মাঝেই খেপে ওঠে, চেঁচামেচি করে, ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়, বলে পাঞ্জাবি মারবে, বিহারি মারবে, আব্বুর হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ওকে যত বোঝাই এখন আর যুদ্ধ নেই, যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবি মারলে সেটা হত শত্রুহনন, এখন মারলে সেটা হবে মার্ডার— ও তত খেপে ওঠে। কী যে করি! ওর জন্য আমিও কোথাও বেরতে পারছি না। তাছাড়া এই যে গুষ্টি রয়েছে বাড়িতে! গত রাতেই হোসেন সাহেব ও আসলাম সাহেবরা নিজেদের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। কিন্তু বাকিরা নড়তে চাইছে না। কী এক দুর্বোধ্য ভয়ে এই ঘরের মেঝে আঁকড়ে বসে আছে!

আত্মীয়-বন্ধু পরিচিতজন কত যে আসছে সকাল থেকে স্রোতের মতো। তাদের মুখে শুনছি রমনা রেসকোর্সে সারেন্ডারের কথা, দলে দলে মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় আসার কথা, ইন্ডিয়ান আর্মির কথা, লোকজনের বিজয়োল্লাসের কথা। এরই মধ্যে রক্ত-হিম করা একটা কথা শুনছি। মুনীর স্যার, মোফাজ্জল হায়দার স্যার, ডাঃ রাব্বি, ডাঃ আলিম চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার এবং আরও অনেকেরই খোঁজ নেই। গত সাত-আটদিনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কারফিউয়ের মধ্যে এঁদের বাসায় মাইক্রোবাস বা জিপে করে কারা যেন এসে এঁদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে পড়ল গত সাত-আটদিনে যখন-তখন কারফিউ দেওয়ার কথা। কারফিউয়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে বেসামরিক মাইক্রোবাস ও অন্যান্য গাড়ি চলাচলের কথা। এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে উঠল।

বিকেল হতে হতে রায়েরবাজারের বধ্যভূমির খবরও কানে এসে পৌঁছল। বড় অস্থির লাগছে। কী করি? কোথায় যাই, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। রুমী! রুমী কি বেঁচে আছে? আমি কী করে খবর পাব? কার কাছে খবর পাব? শরীফ এমন সময়ে চলে গেল? দু'জনে মিলে রুমীর জন্য কষ্ট পাচ্ছিলাম, রুমীর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখন একাই আমাকে সব করতে হবে, একাই সব কষ্ট বহন করতে হবে।

ফোন ও ইলেক্ট্রিকের লাইন এখনও ঠিক হয়নি। কে ঠিক করবে? সারা ঢাকার লোক একই সঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে। স্বাধীনতার জন্য হাসি। কিন্তু হাসিটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। এত বেশি রক্তে দাম দিতে হয়েছে যে কান্নার স্রোতে হাসি ডুবে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর একটা মোমবাতি জ্বেলে ভুতুড়ে আলোয় জামীকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। তার আগে বাসার সামনে জিপগাড়ি থামবার শব্দ পেয়েছি। উঠে দরজা খুললাম। কাঁধে স্টেনগান ঝোলানো কয়েকটি তরুণ দাঁড়িয়ে। আমি দরজা ছেড়ে দু'পা পিছিয়ে বললাম, 'এসো বাবারা, এসো।'

ওরা ঘরে ঢুকে প্রথমে নিজেদের পরিচয় দিল 'আমি মেজর হায়দার। এ শাহাদত, এ আলম। ও আনু, এ জিয়া ও ফতে আর এই যে চুল্লু।'

হায়দার আর আনু ছাড়া আর সবাইকেই তো আগে দেখেছি।

চুল্লু এতদিন সেন্ট্রাল জেলে ছিল। ওকে জেল থেকে বের করে এনে রুমীর অনুরাগী এই মুক্তিযোদ্ধারা রুমীর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আমি ওদেরকে হাত ধরে এনে ডিভানে বসালাম। আমি শাহাদতের হাত থেকে চাইনিজ স্টেনগানটা আমার হাতে তুলে নিলাম। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম। তারপর সেটা জামীর হাতে দিলাম। চুল্লু মাটিতে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসল। আমার দুই হাত টেনে তার চোখ ঢেকে আমার কোলে মাথা গুঁজল। আমি হায়দারের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জামী পারিবারিক অসুবিধার কারণে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেনি। ও একেবারে পাগল হয়ে আছে। ওকে কাজে লাগাও।'

মেজর হায়দার বলল, 'ঠিক আছে জামী, এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার বডিগার্ড হলে। এক্ষুনি আমার সঙ্গে আমার অফিসে চলো, তোমাকে একটা স্টেন ইস্যু করা হবে। তুমি গাড়ি চালাতে পার?'

জামী সটান অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে ঘটাং করে এক স্যালুট দিয়ে বলল, 'পারি।'

'ঠিক আছে, তমি আমার গাড়িও চালাবে।'

জামীর পাশেই আলী দাঁড়িয়ে ছিল। জামী বলল, 'স্যার, আমার বন্ধু আলী—'

মেজর হায়দার গম্ভীর মুখে বলল, 'ইনফ্যাক্ট আমার দু'জন বডিগার্ড দরকার— তোমার বন্ধুকেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া গেল। কিন্তু ভেবে দেখো, পারবে কি না। এটা খুব টাফ জব। চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি।'

পাঁচদিন পর জামী এই প্রথমবারের মতো দাঁত বের করে হাসল,

'আটচল্লিশ ঘণ্টার হলেও পরোয়া নেই।'

(শেষ)

পাগলা গাছের এলোঝেলো ॥ মিথ্যার সাজপোশাক

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

পাগলা গাছ

পৃথিবীর বনজঙ্গলে ঘুরলে কতরকম গাছের দেখা পাওয়া যায় সেটা এক আলাদা বিস্ময়। একবার আমাজনের জঙ্গলে কলকাতার দোকানের অবিকল ভিক্সের গন্ধ নাকে যেতে ভারি অবাক হয়েছিলাম। সেই প্রথম জানলাম ভিক্স রাসায়নিক ওষুধ নয়, উদ্ভিদ থেকে হয়। সঙ্গের পর্তুগিজ গাইডকে জিজ্ঞেস করে সে-বার অনেক অদ্ভুত গাছের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

আমার পিছনেই ছিলেন কেরলের বিখ্যাত পত্রিকাগোষ্ঠী 'মাতৃভূমি'-র পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার। তাঁর হাতে ছোট্ট একটা টেপ রেকর্ডার। গাইডকে আমার প্রশ্নের খুঁটিনাটি ও তার মোটামুটি উত্তর— সবই নাকি রেকর্ড করে নিয়েছেন। এ ভাবেই তিনি ন'খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার দু'খানা নাকি অস্ট্রিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য।

আফ্রিকা আর স্পেনের প্রায় মাঝামাঝি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের বুকে ছোট্ট একটা তিলের মতো টেনেরিফ দ্বীপে জঙ্গলের ঢালে একটা অদ্ভুত গাছ দেখেছিলাম, সে-গাছের একটা পাতাও অন্যটার মতো নয়। প্রত্যেক পাতার আকার আলাদা। গাছটার নাম পাগলা গাছ। সাউথ আফ্রিকায় ও জিম্বাবোয়েতে ভিক্টোরিয়া ফলস-এ জাম্বোজি নদীর উৎসের অন্য প্রান্তের কাছাকাছি রাস্তায় বা বিশাল বাওবাব গাছের কাছেও একটা পাগলা গাছ ছিল কি? কলকাতার মোহরকুঞ্জে সমর নাগ একটা পাগলা গাছ দেখিয়েছিলেন মনে আছে।

পাতাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকারভেদেই এ গাছের এমন নাম।

এলোঝেলো

অনেকটা জিবেগজার মতো। রন্ধনপ্রণালীও এক। তফাত শুধু ছুরি চালানোয়। একেকটা ময়দার জিবের ওপর নিম্নমধ্যবিত্তের বাড়ির বারান্দার সস্তার রেলিংয়ের মতো ফালি ফালি করে কাটা। কিছুটা বটের ঝুরির মতোও বলা যায়। যারা নোরিনা গাছের পাতা দেখেছেন তাঁরাও এলোঝেলোর কাটা-কাটা জিব কল্পনা করতে পারবেন। আর জিবেগজা যাঁরা দাঁতে কেটে নিজেদের জিভে তার স্বাদ নিয়েছেন তাঁদের পক্ষে সব তুলনাই অনাবশ্যক।

সেই পাগলাগাছের এলোঝেলো দু'চার কথা বলতেই এত ভণিতা। যখন যেমন পড়ে পড়ে বলব। সবই আসলে পাগলা গাছের টক ঝাল মিষ্টি তেতো কথা। পাগলা গাছের পাগলামিও ভাবতে পারেন।

কাউকে আঘাত করা বা কারও আত্মবিশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটানো এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। তবু যদি লেখকের অজ্ঞাতে কেউ কখনও কোনও ভাবে সামান্য আহতও বোধ করেন, তা হলে আমার দুঃখের শেষ থাকবে না, আগেভাগেই সে-জন্য মার্জনা চেয়ে রাখি।

ষাটের দশকের জ্বলন্ত কবি তুষার রায় কফি হাউসে ঢুকে ধীর বকের মতো এদিক-ওদিকে চেনা মুখের সন্ধানে শান্তভাবে ঘাড় ও পা চালিয়ে আমার টেবিলে বসে একদিন বললেন, 'মৃত্যুর রং একদম মহিষের তলপেটের মতো!'

চুপ করে আছি দেখে আবার বললেন, 'ন'দিন ধরে আপনার 'নিরন্তর' কবিতাটার ফিল্ম স্ক্রিপ্ট করে ফেললাম। সিনেমাটা করে সবাইকে বোবা করে দেব। মহিষের তলপেটের রং কীভাবে আনব জানেন? কাঠকয়লার আগুনে খয়ের পুড়িয়ে তার ধোঁয়া থেকে।'

কথার সঙ্গে তাঁর স্বরভঙ্গের নানা স্তর ও শরীর দোমড়ানোর বিভিন্ন ভঙ্গি দেখেও আমি নীরব লক্ষ করে এবার স্বর নামিয়ে বললেন, 'এক কাপ কফি হলে ভালো হয়।'

আমার সর্বৈব বিফল একটা দীর্ঘ কবিতা নিয়ে সিনেমা বানানোর অর্থহীন চেষ্টার এই গল্প এর আগেও আমাকে বার কতক বলেছেন তাঁর খেয়াল নেই। তবে তাঁর মুখ দেখে আমি যা বোঝার বুঝে নিয়ে কফির সঙ্গে চিকেন স্যান্ডুইচের অর্ডার দিতেই তুষার যথারীতি মৃদু কিন্তু জোরালো বাধা দিয়ে বললেন, 'আজ একটা পকোড়া খাবারও জায়গা নেই পেটে। কাল মেজদি এসেছেন। অ্যাতো বড় বড় চিংড়ির মালাইকারি, খাসির বিরিয়ানি, ইলিশের ইয়া চওড়া ডিমের টক — মেজদির তদারকিতে রান্না করা নানান লোভনীয় পদের লম্বা তালিকা পেশ করে চিবুকের ঠিক নীচেই গলায় বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর বেড় দিয়ে বললেন, 'গলা ওব্দি ভরা। শুধু কফি খেতে পারি।'

স্যান্ডুইচ শেষ করে বিখ্যাত এক প্রোডিউসারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে পড়তে বললেন, 'একটা সিকি আছে আপনার কাছে?' সিকি অর্থাৎ ২৫ পয়সা ছিল তখনকার একপিঠের ট্রামভাড়া।

এই মিথ্যা, এ হল সম্মান রক্ষার মিথ্যা। কিংবা বুকের দুঃখ ঢাকবার।

আবার, তাড়া করা শিকারির হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর তাড়নায় আশ্রয়প্রার্থী বাজপাখিকে লুকিয়ে রেখে শিকারিকে ভরতের মিথ্যে বলার মধ্যেও স্বার্থসিদ্ধির লোভ নেই, আছে করুণাধারা।

এও আমরা সবাই জানি, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের মুখে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' এক তিলও সত্যি নয়, সত্যের নিপুণ ছলনা।

মনের মিথ্যা ঢাকবার জন্যই সত্যের এমন ছলনা, এমন রকমারি সাজ-পোশাক। যত দিন যাচ্ছে মিথ্যাও তত বাড়ছে। বাড়ছে তার সাজ-পোশাকের ঘটা। উদ্দেশ্য, সত্যের নকল সাজসজ্জায় মিথ্যাকেই যেন সত্য বলে মনে হয় শ্রোতার। দিনে দিনে সত্যের অবমূল্যায়ন দেখে প্রকৃত চক্ষুষ্মানদের যতই চোখ কড়কড় করুক, এটা তো একটা বড় সত্যি যে সত্য সাধারণত স্বার্থ ঢাকতেই বেশি লাগে।

যে দেশ যত শিক্ষাহীন, সে-দেশে দলীয় রাজনীতিতে মিথ্যার চলন তত বেশি। দলবদ্ধ সেই চাল শেষ অব্দি ভাতে না বাড়লেও চট করে তার কাঁকর বাছা সাধারণের পক্ষে সহজ নয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনেই মোক্ষ লাভ, সাধারণের মনে সাজা ভোটটি উল্টে পেতেও তাই চেষ্টার ত্রুটি থাকলে চলে না। পাল্লা দিয়ে চলে দলীয় গলার চিৎকার। সত্য-মিথ্যা সেখানে বড় নয়। বড় নয় সত্য-মিথ্যার বিচার।

বামফ্রন্টের পতনের শেষ দিকে তখনকার বিরোধী দলনেত্রীর উদ্দেশে আরামবাগের সিপিএম নেতার অঙ্গভঙ্গি সহকারে চূড়ান্ত কুকথাবর্ষণ ও মেধা পাটেকরের উদ্দেশে কোনও এক দুর্বিনীত কোণ্ডারের কুৎসিত প্রত্যঙ্গ প্রদর্শনের হুমকি বা বাংলার পরিবর্তিত শাসনপর্বে অনুক্ষণ ব্রতধারীর নিজ দলের নির্দল প্রার্থীদের ঘর

দলীয় রাজনীতির একটা বড় সমস্যাই তো এই যে সব দলকেই অন্য দলের নিন্দা করতে হয় পাঁচমুখে। সব দলকেই গর্বভরে গাইতে হয় নিজের গুণ। এ সেই ঈশপের গল্পের মতো। প্রত্যেকেরই যাবতীয় দোষের বড় পোঁটলাটা থাকে তার পিঠে, গুণের পুঁটলি দোলে বুকে। ব্যক্তি যদি বা কখনও এটা খেয়াল করে, দল নৈব নৈব চ। এবার ভাবুন, সব ক'টি দল একজনের সামনে আর এক জন যদি গদি লাভের লক্ষ্যে এগোতে থাকে তাহলে প্রত্যেক দলই তার সামনের দলের পিঠের পোঁটলাটাই দ্যাখে, আর নিজের বুকের পুঁটলি।

জ্বালানো বা সে কাজে বাধাদানকারী পুলিশের মাথায় বোমা নিক্ষেপের সগর্জন নির্দেশদান সাধারণ মানুষের সাদা মনে যতই সমাজের কালো বলে মনে হোক, শাসকদলের তখনকার বা এখনকার কর্ণধারের বিবেচনায় তা কিন্তু তেমন কালো নয়। সত্যের এও এক রকমফের। কালোকে কেউ যেমন কালো বলেই চেনে, কেউ তেমনই কালো চিনতেই পারে না। কিংবা চায় না। এ হল সত্যকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির তফাত। স্বার্থের ছানি পড়া না পড়ার পার্থক্য।

তার মানে এই নয় যে রাজনৈতিক দলের মহৎ কোনও নীতি নেই, বড় কোনও আদর্শ নেই। এমনও নয় যে রাজনীতির মানুষ মাত্রই শুধু মিথ্যা বলে, শুধু স্বার্থে চলে। মানুষের মহাভাগ্য যে এখনও সবাই সর্বত্র এমন নয়।

দলীয় রাজনীতির একটা বড় সমস্যাই তো এই যে সব দলকেই অন্য দলের নিন্দা করতে হয় পাঁচমুখে। সব দলকেই গর্বভরে গাইতে হয় নিজের গুণ। এ সেই ঈশপের গল্পের মতো। প্রত্যেকেরই যাবতীয় দোষের বড় পোঁটলাটা থাকে তার পিঠে, গুণের পুঁটলি দোলে বুকে। ব্যক্তি যদি বা কখনও এটা খেয়াল করে, দল নৈব নৈব চ। এবার ভাবুন, সব ক'টি দল একজনের সামনে আর এক জন যদি গদি লাভের লক্ষ্যে এগোতে থাকে তাহলে প্রত্যেক দলই তার সামনের দলের পিঠের পোঁটলাটাই দ্যাখে, আর নিজের বুকের পুঁটলি।

এই দেখায় ভুলের চেয়ে বেশি থাকে মিথ্যা। আর কি কখনও কবে এমন যুগটি হবে— যখন মানুষ তার দোষের পোঁটলা বুকে ঝোলাবে, আর গুণের পুঁটলি পিঠে!

সৌজন্য: নারীযুগ

তুষার রায়

“

বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে
শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়া নিভে গেলে
ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা।

এখন আমার কোনও কষ্ট নেই, কেননা আমি
জেনে গিয়েছি দেহ মানে কিছু অনিবার্য পরম্পরা
দেহ কখনও প্রদীপ সলতে ঠাকুর ঘর
তবু তোমরা বিশ্বাস করোনি

বার বার বুক চিরে দেখিয়েছি প্রেম, বার বার
পেশী অ্যানাটমি শিরাতন্তু দেখাতে মশায়
আমি গেঞ্জি খোলার মত খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে...

”

ভারতীয় ভাষায় মহিলাদের
প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র

নারীযুগ

পুরো বা আংশিক সময়ের বা ফ্রি-ল্যান্সভিত্তিক
অভিজ্ঞ মহিলা রিপোর্টার চাইছে

উপযুক্ত প্রার্থীদের সংবাদপত্রে অন্তত তিন বছরের অভিজ্ঞতা এবং নারীসংগঠন ও মহিলাদের সামাজিক সমস্যা-বিষয়ক লেখার দক্ষতা থাকা দরকার।

Quark Xpress-এ লেখা ও পেজ মেকিংয়ের জ্ঞানও আবশ্যিক।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ সহ
৭ দিনের মধ্যে আবেদন করুন: narijug@gmail.com

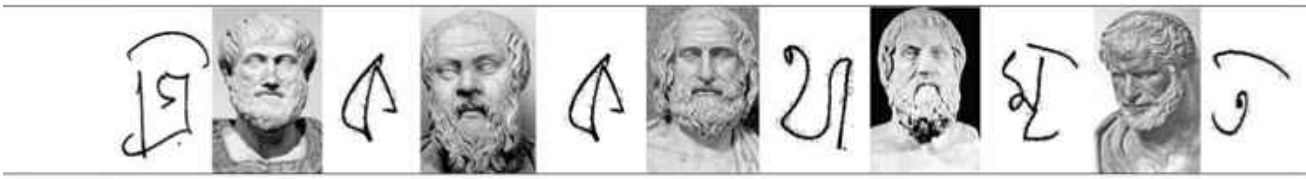

সংকলক ও অনুবাদক
কালীকৃষ্ণ গুহ

পর্ব ৪

আধুনিক সভ্যতার বা ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য সভ্যতার শুরু বলা যায় গ্রিসে। ভারত, চিন ও এশিয়ার প্রাচীনতর সভ্যতাগুলির পরিপূর্ণ চেহারা লিপিবদ্ধ নয় বলে সেইসব সভ্যতাকে পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলাই হয়তো সংগত। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, যা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি, তা গড়ে উঠেছিল বলা যায় ৭০০ খ্রিঃ পূঃ সময়ে— এক অন্ধের কাব্যপাঠে। মহাকবি অন্ধ হোমার এক-একটা জনপদে পৌঁছে সারাদিন দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্য আবৃত্তি করতেন— গ্রিকদের জয়ের কাহিনি— ইলিয়াড ও ওডেসি। অজস্র দ্বীপে বিভক্ত একটা অঞ্চল বা একটা ছোট ভূ-ভাগ গ্রিসদেশ হিসেবে পরিচিত হয় পরে। জ্ঞানচর্চায় শ্রেষ্ঠ দ্বীপরাজ্য বা নগররাজ্যটি ছিল আথেন্স। যেমন যুদ্ধচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল স্পার্টা। এই আথেন্সে জন্মেছিলেন একের পর এক মহাজ্ঞানী লেখক, ভাবুক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনায়ক। বিভিন্ন সময় তাঁরা যে সকল উক্তি করেছিলেন সেইসব কথা বা কথামৃত আজও মনে হয় অব্যর্থ। বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে এই জ্ঞানীদের উক্তিগুলির সংকলন ও অনুবাদ করেছিলাম একসময়। উক্তিগুলি এতই শক্তিশালী ও মহৎ যে অনুবাদের অনুবাদেও তা মহৎ থেকে গিয়েছে, এই আমাদের বিনীত ধারণা। মনে রাখা যায় যে, প্রাচীন গ্রিক মনীষীদের জ্ঞানেরই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, প্রায় দেড় হাজার বছর পর।

অ ভ্যা স

চরিত্র হল একজনের বহুদিনের যাপিত অভ্যাস।
প্লুটার্ক

শৈশবদশা থেকে আমরা কী ধরনের অভ্যাস গড়ে তুলি তার গুরুত্ব কিছু কম নয়, তা বিরাট পার্থক্য তৈরি করে দেয়, তা-ই বস্তুতপক্ষে সমস্তরকম পার্থক্য তৈরি করে দেয়।
অ্যারিস্টটল

একই জিনিস বারংবার করে যাওয়া শুধু একঘেয়ে ব্যাপার নয়, তা-ই আসলে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তুমি আর তা নিয়ন্ত্রণ কোরো না।
হিরাক্লিটাস

তুমি যদি কিছু করতে চাও, তাহলে তা অভ্যাস করো। যদি তা না-করতে চাও, তাহলে তা থেকে বিরত থাকো। অন্যকিছু করো।
এপিকটিটাস

যে তার কামনাবাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে

পারে না, তার সঙ্গে অজ্ঞতম পশুটির পার্থক্য কোথায়?
জেনোফোন

একটা (খারাপ) অভ্যাসের বিরোধিতা করতে হলে কী কী করতে হবে? কেন, বিপরীত একটা অভ্যাস গ্রহণ করতে হবে।
এপিকটেটাস

প্রকৃতির বিরুদ্ধে কিছু করার ব্যাপারে আমরা ততটা স্পর্শকাতর নই, যতটা কোনো সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছু করার ব্যাপারে হয়ে থাকি।
প্লুটার্ক

স ম্মা ন

মনে রেখো সম্মানের ওজন কথা রাখার থেকেও বেশি। মিথ্যা কথা বোলো না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দাও।
সোলোন

সম্মানের প্রতি ভালোবাসা একটা অস্পষ্ট সামগ্রী।
হেরোডোটাস

আমার পক্ষে গ্রিসের জন্য মৃত্যুবরণ সমগ্র মানবজাতির শাসক হওয়ার থেকেও বেশি কাম্য।
স্পার্টার রাজা লিওনিডাস

মাংস মদ ঘুম আর যৌনকর্মে সমস্ত প্রাণী একই রকমভাবে আনন্দ পায় বলে মনে হয়। কিন্তু সম্মানের প্রতি ভালোবাসা কোনো হিংস্র জন্তুর মধ্যে নেই। আর তা

প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেও নেই।
জেনোফোন

যখন কোনো লোক সামাজিক-বিধানের বিরুদ্ধে যায়, এমন কোনো সুখের পথে হাঁটে, তখন সে কোনোভাবেই তার আপন সত্তাকে সম্মান দেখায় না, বরং ভয় আর বিষাদের মধ্যে পড়ে নিজেকে আনন্দিত করে।
প্লেটো

বিচার যাঁর অবিচার

ক্রোধ, ভয়, লালসা, যন্ত্রণা, ঈর্ষা বা কামনার দ্বারা মনের উপর সন্ত্রাস সৃষ্টি করাকেই আমি সাধারণভাবে 'অবিচার' বলি।
প্লেটো

চেহারায় ন্যায়সংগত হওয়ার দরকার নেই, প্রকৃতপক্ষেই ন্যায়সংগত হতে হবে।
অ্যাসকাইলাস

ইচ্ছাকৃত অন্যায়গুলির মধ্যে অধিকাংশই ঘটে লোভ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে।
অ্যারিস্টটল

কোনও লোকের জঘন্যতম অন্যায় কাজ হল তার এই কথা বিশ্বাস করা যে সে ন্যায় করছে, যদিও সে অন্যায় করছে।
প্লেটো

তুমি যখন কোনো সৎ কাজ করো, তখন দেবতারা তোমার সহযোগীর ভূমিকায় থাকেন।
মিনেনডার

তুমি যদি ভয়াবহ কাজ করো তাহলে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে তোমাকে, যেহেতু অন্যায় জ্বলজ্বল করে জ্বলে।
সোফোক্লিস

যে শহরে কোনো অন্যায় ঘটে না সেখানকার নাগরিকরা মঙ্গলচিন্তায় নিমগ্ন থাকে।
মিনেনডার

বিবেকহীন মানুষ অন্যের সঙ্গে একত্রে কোনও কিছু সৃষ্টি করতে পারে না কখনও।
প্লেটো

যে শহরের প্রতিটি মানুষ ঘৃণাবর্ষণ করে আর যা-খুশি তাই করে সে শহর একদিন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায়।
সোফোক্লিস

একটা বিন্দু আছে, যা ছাড়িয়ে গেলে ন্যায়ও অন্যায় হয়ে দাঁড়ায়।
সোফোক্লিস

অন্যায় করার তুলনায় অন্যায়ের শিকার হওয়া বেশি কাম্য।
সক্রেটিস

সাহসী হও, বিচার পাবেই।
ইউরিপিডিস

যা বিধিসম্মত তা শুধু কিছু মানুষের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না। ন্যায়ের বিধান সুদূরবিস্তারী বাতাসের মতো, সীমাহীন আলো আর আকাশের মতো।
এমপোডোক্লিস

অন্যায়ের ফলাফল থেকেই জনসাধারণ ন্যায়ের সৌন্দর্যের শিক্ষা গ্রহণ করে।
ইউরিপিডিস

একমাত্র সময়ই একজন সৎ ও বিবেকবান মানুষকে চিনিয়ে দেয়, একজন বদ লোককে একদিনেই চেনা যায়।
সোফোক্লিস

বিচারক যা করেন তা হল সাম্যের পুনঃস্থাপন।
অ্যারিস্টটল

সুবিচার মিথ্যা সাক্ষীদের বা মিথ্যাচরণকারীদের অতিক্রম করে যাবেই।
হিরাক্লিটাস

অবিচার করাই সব থেকে বড় পাপ।
প্লেটো

আগামী সংখ্যায় আরও

মানবমুখের স্কেচ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

চিঠিপত্রে কমলকুমার

পর্ব : ৩

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

১

স্নেহের
সুনীল

গত রবিবারে তুমি কেটিতে[১] শুনিলাম আসিয়াছিলে। আশ্চর্য্য সেই দিনটিতেই বহু কাল পরে আমার কামাই হইল। ইহাতে আমি খুব কষ্ট পাইয়াছি। তুমি অনেককাল পর অথচ আসিলে ইহাকেই বলে কপাল! কবে আবার তুমি আসিতে পারিবে জানাইও।

ইদানীংকালে কাহারও সহিত বড় একটা দেখা হয় না, তাহার মধ্যে একজনকে মিস করা বড় কষ্টের। ইতিমধ্যে একদিন সন্দীপন-এর সহিত সাক্ষাৎ হয়, সে তাহার নব-প্রকাশিত মিনিবুক আমাকে দিল—এইটি তোমার বই। আমি তাহাকে বলিলাম সুনীল এই সব কি লেখে, জেনো, পাঠক হিসাবে আমরা বলিতে পারি। তখন সে আমায়-আমাদের (কেন না সেখানে অনিরুদ্ধ[২] ও অন্যান্য) তোমার প্রগতিপরায়ণতা বিষয়ক অনেক কথা বলিল একথা আমি কহিলাম (আমাদের ঝাড়া ৩-৪৫ হইতে ৭-৩০ অবধি কোন কথা কহিতে দেয় নাই)— দেখ, দারিদ্র্য দুঃখ উচ্চবর্ণেরা মনে রাখে— আর নিম্নরা ভোগে আর কবিতা পদ্য লেখাই একটা বিদ্রোহ— আবার তাহার বিষয় রূপে এইসব হইবে এ আমার মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় না! সে তখন বহু বিষয়ে আমাদের তত্ত্ব (তথ্য না) বলিতে লাগিল আমরা খুবই আকর্ষিত হই (আকৃষ্ট নহে) মাঝে মাঝে (অবশ্য এখন) মনে হইতেছিল— হয়ত তাহার চমৎকার কণ্ঠস্বরই আমাদের ভাল লাগিতেছিল। ইহাও ধ্রুব তাহার দৃষ্টিভঙ্গী যারপরনাই তীক্ষ্ণ! তবে সে দেখিলাম আর কথা সূত্রে বড় বেশী persecution-এ ভুগিতেছে— জানি না, ইহা তাহার লেখার বিষয়ও হইতে পারে।

দারিদ্র্য দুঃখ উচ্চবর্ণেরা মনে রাখে— আর নিম্নরা ভোগে আর কবিতা পদ্য লেখাই একটা বিদ্রোহ

যাহা হউক এখন তোমার দিনক্ষয়— কেমনে হইয়া থাকে। আমি ত লোকের সহিত ঝগড়া করিতে করিতে গেলাম, ইন্দ্রনাথ যিনি অগতির গতি (তাই ভাবি ইন্দ্রনাথ, তুমি তোমরা না থাকিলে কবে শালা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতাম) তিনি জঙ্গলমহলে গিয়াছিলেন। গত পরশ্ব তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে বড় ধরিয়াছিল— যদি তাহার সহিত k.t.-তে যাই! k.t.-তে ইদানীং রাত্রে যাওয়া বড় ভাবনার— মারপিঠ রোজ করা যায় না। ও ভারী মজার কথা বলি— তুমি ভবানীবাবুকে চেন কি? ইনিও বুর্জোয়া-যম। নিজে Statesman কাগজের প্রতিপত্তিশালী কর্মী, একজন অভিমানী! চেহারায় উচ্চবর্ণ; french revolution এতে যেমন পরচুলা ফেলিয়া দিলেই যে কোন ভদ্র, ছোটলোকদের সহিত

আমরা যেখানে থাকি তাহার আশপাশ স্থান সর্ব্বদা বোমা-তর্জনে কম্পিত! দুদল নকশাল ও সিপিএম— শক্তি পরীক্ষা চলিতে আছেই। ক্রমাগত বোমা পড়িতেছে, দূরে দূরে দ্বিতলে ত্রিতলে বৌঝিরা প্রত্যক্ষ করে, ধীরে ধীরে চুলে চিরুণী চালাইতে থাকিয়া

প্রাণভয়ে কোনরূপে মিশিয়া যাইত— ইঁহার সে উপায় নাই (গাত্র ত্বক হস্তী-দন্ত মার্জ্জিত) ইনি কেমনভাবে— ধরণী রক্তাক্ত হইবে— তাহার ছবি মন্ত্রবলে জাগাইলেন। (রাজনীতি কম্যুনিজম আছে বলিয়া আর কাহাকেও perverse abnormal বলিতে হয় না)— অবশেষে কহিলেন আত্মস্তুতিতে— যে আগে আমি পাঁঠা ছিলাম তাই (মৎলিখিত) আপনার বই পড়িয়াছিলাম— আমি উত্তর করিলাম— মহাশয় মৎলিখিত পুস্তকই আপনাকে ঐ অবস্থা হইতে ইদানীংকার অবস্থায় আনিয়াছে। ঐ অভিমানী ব্যক্তি স্বীকার করিলেন। বিশেষে তর্ক হইত। কিন্তু আমাকে উঠিতে হয়— আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি— ঠাকুর আমাকে বড়ঘরে জন্ম দিয়াছেন ফলে এইসব বাজে ব্যাপার আমার ভাবার দরকার নাই সমষ্টিভাবে বাঁচিবার মত আমার— শালা গোয়ার্ত্তুমি নাম— পূর্ব্বজন্মকৃত পাপও নাই।

যাহা হউক আমার ইচ্ছা ছিল— অনেকদিন যাবৎ নূতন-সম্প্রতির লেখক কবিদের লইয়া কিছু লেখা অমিতাভর[৩] সম্পাদিত— কবিতার পুরুষ[৪] সূত্রে তাহা শুরু করিয়াছি। (সব থেকে বাধা দিতেছে আমাদের রসিকতা! এই stupid মনোবৃত্তির মত আর অন্য নাই) ইহাতে নীরেন চক্রবর্তীর একটি চমৎকার নির্ম্মাণ আছে তবে শেষ পারাটিতে আবার সেই মাটিতে পদদ্বয়।

গতকাল সেয়ালদা station দিয়া যাইতেছি আটবার না-নান উচ্চারণে বুর্জোয়া কথাটি শুনিলাম, যাহারা বলিতেছিল— তাহাদের মুখমণ্ডল রোদের সুন্দর নহে— এত ভীড়েও ব্যাটারা অসহায়।

ঠাকুর করুন তুমি ভাল থাক!

ইতি

কমলকুমার মজুমদার

টীকা:

১ খালাসিটোলা নামে প্রসিদ্ধ দেশি মদের পানশালা

২ অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, প্রাবন্ধিক

৩ কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত

৪ অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পাদিত কবিতার সংকলন

২

স্নেহের

সুনীল

যেদিন আমি তোমাদের কথা দিয়েছিলাম যে পীঠস্থান যাইব, নিশ্চিত মনে পড়িবে যে সেদিন আমার গায়ে পুল-ওভার ছিল, যে এবং তখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম না, যদিও এইরূপ আশা ছিল যে আমি ৪/১০ তে যাইবার মত জোর পাইব! আমায় অনিরুদ্ধ কহিল, তোমরা সকলে আসিয়াছিলে। নিজের উপর রাগ করা ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নাই!

এখন আমি বেশ সুস্থ; কিন্তু বাড়ী হইতে বাহির হইবার কোন জবর ছুতো পাইতেছি না। বিশেষত আমরা যেখানে থাকি তাহার আশপাশ স্থান সর্ব্বদা বোমা-তর্জনে কম্পিত! দুদল নকশাল ও সিপিএম— শক্তি পরীক্ষা চলিতে আছেই। ক্রমাগত বোমা পড়িতেছে, দূরে দূরে দ্বিতলে ত্রিতলে বৌঝিরা প্রত্যক্ষ করে (অবশ্য লড়াই-এর সময়তে লোকে বোমারু বিমান দেখিত), ধীরে ধীরে চুলে চিরুণী চালাইতে থাকিয়া; অপরের দেওয়ালে যে অল্পবয়সী ঘুঁটে দেয়, সে নির্ব্বিকার; বোমার ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বাস তেমনই হাত বাজাইতে থাকিয়া উধাও, বোমার আওয়াজ লোকের ভাল লাগে, যে এবং উঠতি মেয়েদের মুখমণ্ডল রম্য অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে (পুরাণ মতে গোধূলি লুক্কায়িত ছিল), আদিমতা দেখিতে বর্ব্বরতা শুকিতে ইহার কি হন্যে— কি পর্য্যন্ত ভালোবাসে। ছুরিতে যখন রক্ত যখন রাস্তায় তখন আবালবৃদ্ধবনিতা চোখ বন্ধ করে— কচি ইস্! শ্রুত হয়। বোমার তীব্র আওয়াজে আমার চক্ষুপক্ষ্ম আবার কখনও বাষ্প কম্পিত হয়— অমোঘ সুলক্ষণ! অদ্ভুত পুরাকাল আমাতে স্পন্দিত। বোমা এক অভয়! আধ্যাত্মিকভাবে— রাজনৈতিকভাবে নহে। অবশ্য অন্যপক্ষে ইহাও ঠিক যখন বেলুনওয়ালা সবেগে ছুটিতে থাকে— তখন বড় মায়া হয়— ইহাও ঠিক যখন বাদামওয়ালা ত্বরিতে তাহার পসরা মাথায় লইয়া, খেমটা গতিতে পাছা দুলাইয়া নিরাপদ জায়গার অভিমুখে— তখন আমি শিশু ভাবাপন্ন নই তবু থিয়েটার দেখার এসথেটিকস

(!) লইয়া পারিপার্শ্বিকতাকে দেখি—! দেখা ছাড়া কিছু বলিবার নাই করিবার নাই এতই একলা! (অদ্যকার কাগজে আনন্দবাজারে— যদিও আমি কাগজ পড়ি না, তবু দেখি এক পুলিশ সাহেব বলিতেছেন, গৃহস্থরা তাহাদের সাহায্য করে না— কবে তাহারা গৃহস্থদের প্রতি চাহিয়াছেন— স্বাধীনতার পর হইতে শালারা আর এক খালি ঘুষ খাইতেই শিখিয়াছে, সন্তোষ বাগচি মহাশয়ের নিকট পুলিশের কেরামতির গল্প শুনিও। বেটাদের মারিতেছে— তখন কেরে কেরে! কত হত্যাকাণ্ড শহরে হইল কোন হদিশ পর্য্যন্ত নাই! ঐ প্রবন্ধে আছে— বিজ্ঞের মত পুলিশটি বলিতেছে— আদর্শবাদী যুবকদের সহিত পাকা-খুন-করিয়ে থাকে, সে-ই— ঐ সব খুন করে— বোঝো এত পাকা-খুন-করিয়ে কলিকাতায়! আর পুলিশ বেশ আছে) দু একদিনের মধ্যে যদি বাহির হইতে পারি তবে তোমাকে ফোনে জানাইব।

এখান হইতে এখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছি—। অবশ্য ইচ্ছা অনেক দিনের কিন্তু সব সময় একতলা পাই। আমি দ্বিতল ভিন্ন যাইতে রাজি নই কেন না একতলায় যত শালা ভিখারী ইন্দুর আরশোলা, চাঁদাওয়ালা ফেরিওয়ালা হরদম আক্রমণ করিয়া থাকে!

আদত কথা এই যে আমি হঠাৎ 'দেশে'তে টেলিফোন করিয়া, শুনি, আজ অনেকদিন হইল (সম্ভবত ২৮/২৯/৯)— যে সাগরবাবু[১] অসুস্থ, তিনি এখন কেমন আছেন। তুমি যদি যাও ত আমার কথা বলিও। আমি একটি চিঠি দেশে পাঠাইতেছি।

শরৎচন্দ্র[২] কি চলিয়া গিয়াছে? বেচারার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, বড় দুঃখ রহিল— যদি না গিয়া থাকে তাহা হইলে জানাইও!

তুমি ও তোমার স্ত্রী কেমন আছ—! বাচ্চাটি কি খুব ছটোপুটি করে?

ঠাকুর তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন।

ইতি

কমলকুমার মজুমদার

১৩.১০.৭০

টীকা:

১ সাগরময় ঘোষ

২ কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অরুণকুমার সরকারকে লেখা

স্নেহের অরুণচন্দর,

সম্ভবত মাস দেড়েক পূর্ব্বে তোমার চমৎকার চিঠি আমি পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমি যারপরনাই বিবিধ রোগে ভুগিতে থাকার কারণে উত্তর দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এবং ইহাও সত্য যে, এ কারণ ব্যতীত ধ্রুবই যে আমি এক পবিত্র মানসিকতা খুঁজিতেছিলাম। (সাধারণত যখন কেহ না কেহ, কাহারও নিকট স্তব্ধতা চাহে, আন্তরিকতা প্রত্যাশা করে, তখনই 'কাহারই' মুখ কি বিচ্ছিরি দেখিতে হয়— এই কাহারও শালা মহা আতান্তরে পড়ে— এক গাছা মিথ্যা! কি ভয়ঙ্কর) আপাতত এই বিচ্ছিরি মুখ লইয়া তোমাকে উত্তর লিখিতে আছি। প্রথমত, আমি খুব এক চিঠিবাজ নই, তাই সবই বড় পয়জার হইবে।

তোমাদের মাসিক পত্রিকাটি[১] পাইলাম। এখনও আমি দেখিতে পারি নাই। তোমার আর কোন নতুন বই বাহির হইয়াছে কি! হইলে খবর দিও, কিনিব! এখানে আমার একটি গল্প[২] তোমার বিরক্তি উৎপাদনের জন্য পাঠাইলাম তবে মানিয়া লইও যে আমি ইহা ছাড়া আর কি লিখিতে পারিতাম! ইদানীং, আমার বিশ্বাস, অনেক মহৎ সাহিত্যকার আছেন, যাহারা নিয়মিত বাঙলা ভাষার মান মনোরম করিতে অজস্র আত্মত্যাগ করিতেছেন, তাহাদের সহিত একাসন আমি কখনই পাইতে পারি না; আমি অত্যন্ত গ্রাম্য গোছের; আধুনিকতা মানবিকতা, শোষণ শ্রেণী সংগ্রাম (আমি যদি প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য শিবরামবাবু হইতাম তাহা হইলে, শ্রেণী শব্দ লইয়া pun করিতাম) ব্যর্থতা, বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা, এসব আমার বিষয় নহে; সম্পূর্ণ ভালবাসাই আমার ধর্ম, তাই ঠাকুরের কৃপায় লিখিয়া থাকি, লেখার বিষয় নহে!

আমার ভাষা লইয়া অনেকে অনেক কিছু রটাইয়াছে, কেহ কেহ বলে বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রয়োজন— তাহারা অপপ্রচার করে। আমি গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি আমার মত সরল খুব নাই, সত্যিকারের বাঙালীরাই আমার মত সরল। যদি কিছু জটিল হয়, তাহা যেহেতু আমরা বাঙালিত্ব হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছি। আমরা ইদানীং স্বদেশী শুধু জানি শ্রাবণ-ভাদ্রর মাসে বিছুলীঘাটের ইলিস উঠে, শীতে নলেন গুড় এবং শরতে দুর্গা পূজা হয়। বাঙালিত্ব আমরা ভুলিয়াছি! পৃথিবীর মধ্যে এত বড় জাতি আর নাই! শুধু তাহার ধর্ম্ম দারুণ সুন্দর কুসংস্কারপূর্ণ (ব্রাহ্মশালাদের মতে) ধর্ম্ম তাহাকে সতেজ রাখিয়াছে— আমি সেই বাঙালীদের কথা বলি যাহারা শালা নাগরিক নয়। অর্থাৎ তুমি আমি। যাহা হউক গল্পটি পাঠাইলাম পড়িতে যদি পার। আচ্ছা তোমার কি গৌরে ছোঁড়ার[৩] কথা মনে পড়ে। তাহার কথা বহুবার ভাবি সে ইদানীং দৈনিক-শ্রী হইয়াছে ফলে আমাদের মত ইস্কুলমাস্টারদের মনে রাখে না, সে যখন হাসপাতালে তখন দেখিতে যাই কিন্তু কপাল এমন যে বেচারী তখন বাড়ী গিয়াছে হয়ত সে আমাকে অপদার্থ মনে করে— দেখা যদি হয় বলিও আমি তাহাকে মনে রাখি।

ইতি

কমলকুমার মজুমদার

১৮.১১.৬৯

টীকা:

[কমলকুমার মজুমদার তাঁর হাতে-গোনা পাঠকদের মধ্যে কয়েকজনকে মুদ্রিত গল্পের অফপ্রিন্ট উপহার দিতেন। অনুমান করা যায় এই চিঠিটি সেইসূত্রে লিখিত হয়েছিল। চিঠিটি কবি

আমার ভাষা লইয়া অনেকে অনেক কিছু রটাইয়াছে, কেহ কেহ বলে বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রয়োজন— তাহারা অপপ্রচার করে। আমি গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি আমার মত সরল খুব নাই, সত্যিকারের বাঙালীরাই আমার মত সরল।

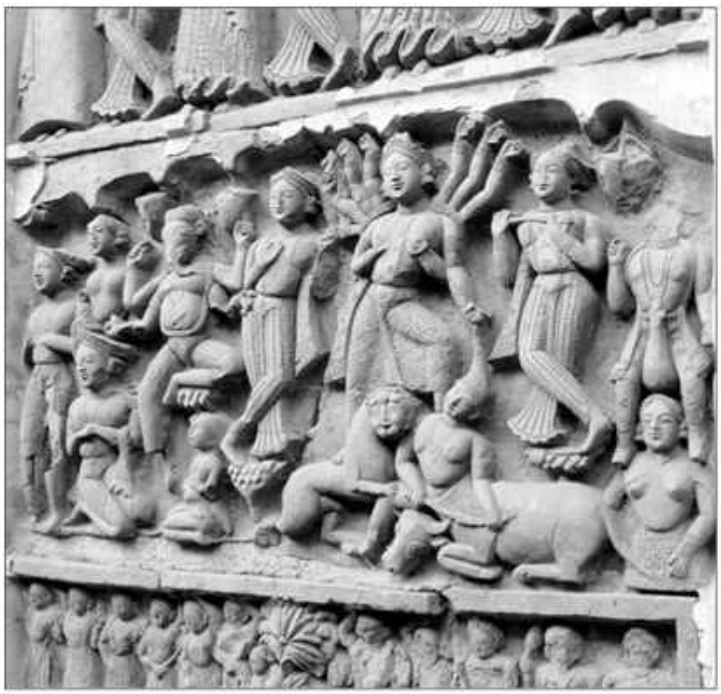

ধর্ম্ম তাহাকে সতেজ রাখিয়াছে: বাংলার টেরাকোটা মন্দিরগাত্র থেকে

অরুণকুমার সরকারের পুত্র বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অভিরূপ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত। 'আদম' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ২০১১ সংখ্যায় চিঠিটি মুদ্রিত হয়েছিল।]

১ আলোক সরকার ও দীপঙ্কর দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'শতভিষা'

২ কমলকুমার মজুমদার প্রণীত 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক'

৩ গদ্যকার ও সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ

আমি জানি না, অদ্যকার কৃত্তিবাসের পাঠকদের, ঐ গল্পটি কেমন লাগিবে; সুনীল আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই উহা ছাপিল— আমি ইহাতে বড় সঙ্কোচেই আছি!

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

১

১০.৯.১৯৭৫

স্নেহের দেবাশিস

তোমার চিঠিখানি আমি যথা সময় পাইয়াছি, তুমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছ; তাহার যথার্থ উত্তর আমার নাই; এখনই দিবার মতন চতুর বুদ্ধি আমার নাই; চাতুর্য্যকে বাজ পড়িয়াছে; তুমি নিশ্চয় করিয়া জান সরলতা ভিন্ন মানুষের গতি নাই; ঠাকুর ইহা আমাকে বলিয়াছেন (!); আমাদের দেশে বাঙলা ভাষা এখন চমকপ্রদ রূপ ধরিয়াছে: Parody লেখার নিমিত্ত এমত সুদারুণ ভাষা আর নাই! প্রথম হইতে ইহা, মানে ১৯ শতাব্দীর গোড়া থেকে (হইতে), নিদ্দম প্রতিবাদ আর শ্লেষ করিয়া আসিতেছে; (অথচ যখনই সংস্কৃত সাহিত্য যুক্তি তর্ক বাঙলা করে তখন ভারী সুন্দর!) আজও থামে নাই! বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমলবাবু, বঙ্কিম, সঞ্জীব চাটুজ্জে। পরম সরলতার আকর। আমার মধ্যে যে সরলতা তাহা আবিষ্কার করি। আমি অবশ্যই সদাসর্ব্বদা ঠাকুর দ্বারা চালিত! তিনি যাহা করিবেন! যতটুকু করিবেন! (আমি ছেলেবেলাতে বারীণবাবুর[১] লেখাতে পড়ি, আমার দাদা (শ্রীঅরবিন্দ) কৃষ্ণসমর্পিত মন! সমর্পিত কথাটা আমাকে যে দারুণ পাগল করিয়াছে।) বালক বয়স হইতে আমি বহুবার গঙ্গায় চান করিয়াছি;— নিগঙ্গার দেশ বলিয়া আমার মা রিখিয়াতে যাইতে চাইতেন না! গঙ্গা মৃত্তিকা আমাদের বাড়িতে মজুত থাকিত। আমার ভাবনা নাই। তিনি তোমারে ঠাকুর, আনন্দে রাখুন।

ইতি অনুগত

কমলকুমার মজুমদার

১৩/৯ তারিখে শনিবার বিকাল ৫টাতে আসিও

টীকা:

১ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। লেখক। ঋষি অরবিন্দ ঘোষের ভাই

২

২.৪.১৯৭৬

স্নেহের দেবাশিস,

তোমার লিখিত ২৯/৯ এর জোড়া পোস্টকার্ড আমি ঠিকসময় পাইয়াছি। আমি জানি না, অদ্যকার কৃত্তিবাসের পাঠকদের, ঐ গল্পটি কেমন লাগিবে; সুনীল আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই উহা ছাপিল— আমি ইহাতে বড় সঙ্কোচেই আছি! তবে ইহা সত্য যে কৃত্তিবাসেতে ছাপা দেখিয়া আমি খুবই গর্ব্বিত বোধ করি। আদতে ঐটি কৃত্তিবাসের জন্য রাখা ছিল! এক্ষণ আমার নিকট অতি বাজে কাগজ। অবশ্য বলিতে পারো এক্ষণে তিন চারটি গল্প ছাপাতে হইয়াছে— সেটা আমার দুর্ভাগ্য! আমার ইচ্ছা সব সময়, নূতন কোন কাগজে দেওয়া— যাহা উহাদের, এক্ষণ, হইতে ঢের ভাল।

এখন কৃত্তিবাস ছাপিল— ইহা হইতে আর কি আশা করিব। এদিকে শামসের[২] আমাকে চিঠি দিয়াছে জানি না কি করিব। রাত্রে আমি কাজই করিতে পারি না; হাঁপানি বড় বিশ্রী অসুখ! —সারাদিন ইস্কুলে, তাহার উপর এখন ১০/৪৫ এ হাজিরা নিয়ম হইয়াছে ফলে আমাকে ৯/১৫ হইতে প্রস্তুত হইতে হয়— রাত্রে ঘুম নাই। ৭।। টায় উঠিয়া আর কিছু করিবার সময় থাকে না।

এই বোধ করি ঠিক ছিল যে কোন কাজই করতে পারিব না। তবু চেষ্টা করিব! অদ্য সুব্রতর একটি পোষ্ট কার্ড পাইলাম। তাহার সহিত বহুকাল সাক্ষাৎ নাই। দেখি কবে তাহাকে আসিতে বলিতে পারি।

তুমি আগামী বৃহস্পতিবার ৬।। টার সময় যদি সময় করিতে পারত আসিও আমি খুশী হইব।

ঠাকুর তোমাকে আনন্দে রাখুন
ইতি কমলকুমার মজুমদার
আর জোড়া পোষ্টকার্ড দিও না— উহা আমি তামাশা করিয়া বলিয়াছিলাম।

টীকা:
১ শামসের আনোয়ার

৩

২৫.৫.১৯৭৬
স্নেহের দেবাশিস

তুমি যে কষ্ট করিয়া অজয়ের[১] কাজটুকু করিলে তাহার জন্য তোমার নিকট কেনা রহিলাম। তোমার কথা আমার স্মরণে আছে, আমি ওই লইয়া ভাবিতেছি; বীরভূমে যখন আমি সেনসাসে কাজ করিতাম এবং তাহার পূর্ব্ব হইতে বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা করি। আমার জানাটা একেবারে পীঠস্থান হেতু! এবং এক চাকাতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বাড়ী। ওইখানে যে সব প্রবাদ চলিত: যেমত 'চেনা মানুষকে চিনিতে লারলাম গো' 'তে (ত্রি) সন্ধ্যা তোমার ঘুন্সীতে বাঁধা বটেক' এমন ধারা কথা! আমার বেশী মনে থাকার কথা নয়, লেখা ছিল। যেমন পোস্ত কতরূপে খাওয়া হয়! আমি যারপরনাই চেষ্টা করিব। বিশেষত বহুকাল আগেতে আমার ভগিনী[২] তখন শান্তিনিকেতনে পড়িতেছে, তাহাকে আনিতে যাই বা কোন সূত্রে যাই তখন তৃতীয় শ্রেণীতে একটি মেয়ে গুসকরা হইতে উঠিল, বিবাহ হইয়াছে। যেই না অজয় পার হইল অমনি মেয়েটি বলিয়া উঠিল এই আমার বাপের বাড়ির দেশ! কি nostalgic!

যে কোন দিন সময় পাইলে আসিও।
ঠাকুর তোমাকে আনন্দে রাখুন।
ইতি কমলকুমার মজুমদার

টীকা:
১ অজয় গুপ্ত। কমলকুমারের ছাত্র। 'দানসা ফকির' নাটকের মুখ্য চরিত্রের অভিনেতা
২ ভগিনি— বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শানু লাহিড়ী

নির্মাল্য আচার্যকে লেখা

১৪.৯.৭২

স্নেহের নির্ম্মাল্য,

গতকল্য তুমি চলিয়া যাইবার ঠিক পরেই আলো চলিয়া গেল— তখন তোমাকে হস্তান্তর করা লেখাটি বিষয়ে আমার বুদ্ধি অনুযায়ী ইহাই ভাবিলাম, উহা ছাপিতে দেওয়া তোমাদের কাগজে— বা যে কোন ছোকরা কাগজেও— উচিত হইল না। কারণ লেখা ব্যাপারটাকে আমি গান আঁকার মতই শক্ত ভাবি— আর তুমি দেখিলে চারখানি পাতা ন্যাড়া লেখা হইয়া রহিয়াছে।

গল্পটি[১] আমার কাছে ভারী কঠিনরূপে দেখা দিয়াছে— আমি ঠিক তাহা খেলাইয়া তুলিতে পারি নাই। বিরাট ফাঁক থাকিয়াছে। অবশ্য জানি, তোমার এমন একটি পাঠক নাই যে নিজের লেখা ছাড়া অন্যরটি পড়িয়া থাকে— যেমন কিছু মনে করিও না, তুমিও পড় না। অতএব ভয় পাইবার কিছু নাই। ভয় আমার নিজের জন্য, ভয় ঠাকুরের কাছে যিনি এত দুঃখময় একটা ভীষণ ছুট্-কলঙ্ক দেখাইলেন, আমি তাহা নয়ছয় করিলাম।

ইহা প্রাণীতত্ত্বর— বিশেষত প্রাইমেট, বানর জাতীয়দের— গ্রিপ বা মুষ্টি এখানে আমাদের বক্তব্যের লক্ষ্য। ছোট একটি মুঠো (মুষ্ঠি) বালক— যে ঐ মুঠোর দ্বারা সমস্ত ইহকাল— সমস্ত ওতপ্রোত স্থাবরজঙ্গমকে ধরিতে চাহিবে, সেই মুঠোর কি শালা হাল! বালকটি, মুঠোটি কতগুলি Bio-Data-দের (দেশীয় ইংরাজীতে ডবল সর্ব্বনাম— বাইও-ডাটাস) মধ্যে কেমনভাবে গড়িয়া উঠিতেছে! ইহা, আমি বাইও-ডাটা শব্দটি ব্যবহার করি না— তাহা হইলে শ্লেষ হয়, smart হয়। এবং ঐ শব্দে সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হইবে— যদিস্যাৎ কেহ পড়ে— সেই শব্দতে রগড় পাইবে— গল্পের যন্ত্রণাতে যাইবেক না।

ঐ মুঠোটি আমাকে বড় আতান্তরে নিক্ষেপিয়াছে, অন্ধকারের মধ্যে একটি মুঠো, যে তৃণও ধরে।

পরোক্ষেও বলা হইয়াছে। চেতন ও অচেতন তবে খুব সূক্ষ্ম (তুমি হয়ত ইহাকে abstraction বলিবে) সে যখন বিভক্ত হইল।...

এখন আমার অনুরোধ যদি প্রেসে না দিয়া থাক তাহা হইলে আমাকে ফিরৎ দাও— আমি উহাকে আর কয়েকবার ঘষামাজা করিয়া গল্প তৈয়ারী করি— না হইলে ঠাকুর রুষ্ট হইবেন।...

ইতি অনুগত কমলকুমার মজুমদার

টীকা:
১ 'এক্ষণ'-এ প্রকাশিত গল্প 'খেলার আরম্ভ'

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা

২৪.১২.৭৮

শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথবাবু,

আপনার পোস্ট কার্ড আমি যথাসময়ে পাইয়াছিলাম— ৮ই/১২ কিন্তু তখন আমি এমনই রোগাক্রান্ত যে চিঠি পাঠ পর্যন্ত আমার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। আমি গত ৪/১২ সন্ধ্যা হইতে হাঁপানির প্রকোপে পড়িলাম— অদ্যাবধি প্রায় শয্যাগত, কোনরকমে এই

অজয় নদ

এখন আমার অনুরোধ যদি প্রেসে না দিয়া থাক তাহা হইলে আমাকে ফিরৎ দাও— আমি উহাকে আর কয়েকবার ঘষামাজা করিয়া গল্প তৈয়ারী করি— না হইলে ঠাকুর রুষ্ট হইবেন।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র স্রষ্টা
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

যে শতাব্দীটা বাঙলার প্রতিভা গড়িয়াছিল— তাহা কেমনভাবে আমরা নষ্ট করিলাম তাহা ভাবিলে সত্যই কষ্ট হয়! বলুন এমন সাহিত্যভাণ্ডার কাহার— যেমন ঠাকুরমার ঝুলি— তেমনই বঙ্কিম বিদ্যাসাগর। তাহাকে কি বিনষ্ট করিব।

অসুস্থ অবস্থায় একবার ডাক্তারবাড়ি যাই—, এবং ২২/১২ ইস্কুলে গিয়াছিলাম। এইবারের ধমক আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। রাতের পর রাত ঘুম নাই। আপনার চিঠিতে বুঝিলাম আপনি আমার অবস্থা বুঝিয়াছেন—, সত্যই আতাউরের[১] স্মরণসভায় না যাওয়া অপরাধ, তাহার মত বন্ধুবৎসল লোক ক্বচিৎ দেখা যায়— নিজের কোন ambition তাহার ছিল না। অবশ্য স্ত্রীপুত্র পরিবারকে আনন্দে রাখা ছাড়া অন্য কোনরূপ বৃত্তি তাহার ছিল না। কত কথাই না মনে পড়ে! তাহার সেই 'গুপ্ত রহমান গুপ্ত' প্রকাশক সংস্থা হইতে অনেক কথা। 'চতুরঙ্গ' এমনইতে তখনকার 'পরিচয়'এর মতই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহা তাহার দ্বারাই ঘটিল, সাহিত্যের মান সম্পর্কে তাহার একটা স্বভাবসিদ্ধি ছিল। কত কবিকেই না সে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। অনেক কথা।

আপনার গত সংখ্যা[২] যাহাতে নবনীতার লেখা[৩] আছে— তাহা আমি প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াই আপনাকে চিঠি দিয়াছিলাম। কোন মন্তব্য করি নাই। নবনীতার লেখা সম্পর্কে আমার কোন মন্তব্য নাই— তাহার খেয়াল হইল, সে লিখিল। আমি যে কি লিখি তাহা ভদ্রমহিলার জানিবার প্রয়োজন নাই। যে লেখাটি লইয়া সে তচনচ করিয়াছে তাহা ব্যতীত আমার অনেক গল্প, এবং বড় গল্প 'খেলার প্রতিভা' প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তাহার দিকে যান নাই। ইহা তাঁহার ধর্ম— আমার কিছু বলিবার নাই। তবে তিনি যে উচ্চারণ লইয়া টিট্‌কিার দিয়াছেন তাহা ঠিক হয় নাই। কতগুলি উচ্চারণ চলিত থাকে তাহাকে মানিতে হয়, যেমন মহামতি বেথুন এখানে কেহ বিটান বলে না। যেমন উনি ধরেন নাই যে আমরা 'বদলেয়ার' বলি। কথাটা উচ্চারণের দিক দিয়া Baude laire>laire। ল্যের হওয়া উচিত— যেমন plaire আনন্দ খুশী taire-চুপ অর্থাৎ aire (ai-এর— আর আমরা করি এয়ার > বদলেয়ার) আমরা লেখাতে প্রচলিত উচ্চারণই দিয়াছি।

গল্প মনে আছে— বহুকাল আগে আমার কাকারা তখন বিলাত-প্রত্যাগত (১৯২৮) দেওঘরে ফ্যানসী স্টোরে সাবান কিনিতে গিয়াছিলেন— একজন পেয়ার্স সাবান চান, তখন দোকানদার ভদ্রলোক বলেন, ঐ সাবান নাই। তখন অন্যজনা সাবানটি দেখাইয়া দেন, ইহাতে দোকানদার ভদ্রলোক বলেন, ভুল উচ্চারণ করিলে কি করিয়া বুঝিব, পিয়ার্সকে পেয়ার্স বল! এই বিলাত-যাওয়া! (ভদ্রলোক খুব পরিচিত)

ভদ্রমহিলার জ্ঞানী গুণী নাম শ্রীসম্পন্ন হইল। কিন্তু মজা এই তিনি কোথাও আমাদের লেখাকে বিষয়গতভাবে নাকচ করেন নাই। তিনি জানেন আমরা flattery করিয়া লিখি না, বস্তি উন্নয়ন আমরা লেখার বিষয় বলিয়া ভাবি না। ভক্তি-ভালবাসা যে দ'য়ে মজিতেছে ইহা তাহাদের মনেই আসে না, ভগবান তো মরিয়াছেন। ইহারা অন্য পাশ্চাত্য তরিখায় 'আইডেনটিটি' লইয়া মাথা ঘামাইতেছে— একবারও মনে হইল না, আমি কে এ বিষয় বহু কথাতর্ক এখানে রহিয়াছে। অবশ্য যে যাহার আনন্দে থাকিবে এমন কথাই ঠিক— হঠাৎ আমাকে লইয়া কেন তাহা আমি বুঝিয়া পাই না। শুনিলাম আপনার কাগজের লেখাটি বিদেশে কোথাও তিনি যাহা পড়িবেন তাহার ছক বা অনুবাদ।

আপনি একস্থানে চিঠিতে লিখিয়াছেন 'আমার নিকট অনেক প্রত্যাশা' ইহা ভাবিতে ভাল লাগা উচিত; কিন্তু যে শতাব্দীটা বাঙলার প্রতিভা গড়িয়াছিল— তাহা কেমনভাবে আমরা নষ্ট করিলাম তাহা ভাবিলে সত্যই কষ্ট হয়! আমার কাছেও সেই ধ্বংস করার প্রবৃত্তিটা কোন না কোন খাতে বহিতেছে— তাই ভয় হয়: বলুন এমন সাহিত্যভাণ্ডার কাহার— যেমন ঠাকুরমার ঝুলি— তেমনই বঙ্কিম বিদ্যাসাগর। তাহাকে কি বিনষ্ট করিব।

যাহারা ইদানীংকালের নামকরা লেখক প্রত্যেকেই সেই পুরাতন সম্পর্কবোধ স্ত্রী-পুরুষ (বাবা-মা ভাইবোন বঙ্কিমবাবু নস্যাৎ করিলেন— নবীন সেন[৪] দুঃখ করিলেন, বঙ্কিম আনিলেন প্রেমিক-প্রেমিকা)। কিন্তু এখানে ভালবাসা নাই। খোঁজখবরও নাই। পটভূমিকা: খোলা মাঠ কিন্তু চাষী। ইহারা নিপীড়িত। আমিও সেই খাত ছাড়া আর কি। তবে ঠাকুর জানেন, আমি চেষ্টা করি মানুষকে কেমন দেখিতে, মানুষ যে কি কষ্ট পাইতেছে, তাহার জানা জগত দিয়া— বিশ্বাস দিয়া তাহা বুঝি। অতবড় বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে লিখিলেন, বড় হইয়া উৎস সম্পর্কে অনেক পড়িয়াছি— কিন্তু আমি জানি উহা মহাদেবের জটা হইতে। অনেক কথা আসিয়া পড়ে; আমি যাহা আমি তাহাই! এখন আপনাদের কাগজে লেখা দিতে আমার ভারী ইচ্ছা আতাউরকেও বলিয়াছিলাম— তবে আমার কাছে একটি লেখা আছে তাহা প্রায় আপনার কাগজে ১০০ পৃষ্ঠা হইবে। গল্পটি নকশাল ব্যাপারে আমাদের প্রেম। গল্পটার নাম 'খেলার অপসরা'— আর দুয়েকটি আছে তবে কপি করিতে সময় যাইবে। আপনি আমাকে দয়া করিয়া পরামর্শ দিলে— আমি সেইমত কাজ করিব।

ঠাকুর আপনাকে আনন্দে রাখুন

ইতি অনুগত

কমলকুমার মজুমদার

২৪.১২

টীকা:

১ আতাউর রহমান, সম্পাদক: চতুরঙ্গ

২ 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার মাঘ চৈত্র ১৩৮৪ সংখ্যা

৩ নবনীতা দেবসেন লিখিত সমালোচনামূলক নিবন্ধ 'পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক এবং/অথবা'

৪ নবীনচন্দ্র সেন

(শেষ)

উৎস: 'কমলকুমার মজুমদারের চিঠি'। সংকলন ও সম্পাদনা: প্রশান্ত মাজী, গৌতম মণ্ডল

সৌজন্য: আদম

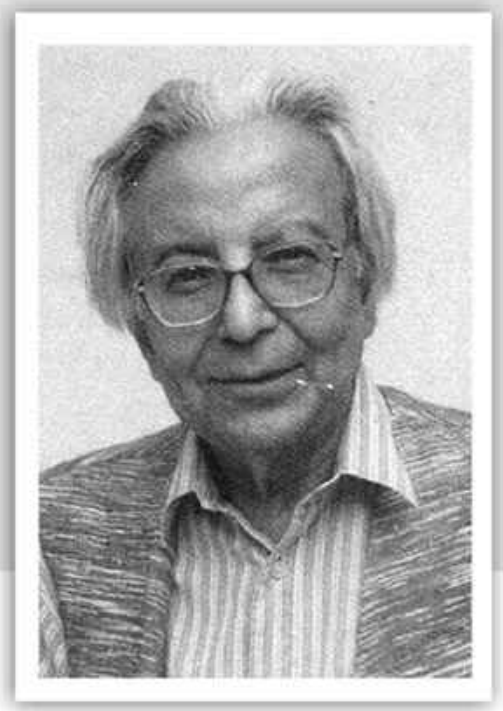

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি

পর্ব : ৩

শঙ্খ ঘোষ। মীণাক্ষী মুখোপাধ্যায়
কবিতা সিংহ

শঙ্খ ঘোষের চিঠি

বড় রকমের বিপদ ঘিরে আসছে মনে হয়, কিন্তু আমরা এখনও মেতে আছি ছোটো ছোটো দলাদলি নিয়ে।

শ্রী

24 জুন, 1998

অলোক,

'গ্যোয়েটে'র[১] প্রুফটা পাঠাতে পরিকল্পিত সময়ের থেকে একটু বোধহয় দেরিই হল। অরিজিতের[২] যন্ত্র মাঝখানে বিগড়ে গিয়েছিল, যন্ত্রীরাও থেকে-থেকে উধাও হচ্ছিলেন। তারপর সমস্যা হল তোমার নির্ধারিত যুবাটির[৩] সঙ্গে যোগাযোগ করা। ফোন করে কখনো কখনো নারীকণ্ঠের ধমক শুনতে হচ্ছে 'এখানে ও-নামে কেউ থাকে না', আর কখনো-বা স্বরে শুনিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'যে-নম্বরটা ঘোরাচ্ছেন সেটা একটু পরীক্ষা করে দেখুন।' বিস্তর পরীক্ষা করলেও ফল দাঁড়াচ্ছে অবশ্য একই।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত চন্দন[৪] এবং রাজার[৫] যুগ্মসহায়তায় একটা ভরসা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে, সম্ভবত ছাব্বিশ তারিখের ডেসপ্যাচে এ-ফাইল তোমার দিকে রওনা হবে। দেখে আবার সময়মতো ফেরত পাঠাবে, এ নিয়ে এ-তল্লাটে কোনো দুর্ভাবনা নেই।

প্রুফ দেখবার সময়ে কয়েকটা জিনিস মাথায় রেখো।

প্রথম কথা হল: কিছু-কিছু বানান হয়তো দেখবে যেটা তোমার নিজস্ব অভ্যাসের পরিপন্থী। একই সিরিজের বই হচ্ছে বলে বানানের ব্যাপারে সর্বসমতা না হলেও খানিকটা সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা চলছে বলে তোমার বানানও দু-একটা পালটানো হয়েছে। নিরুপায়। অন্য কথাগুলি এই:

১৪ পৃষ্ঠার ১১-১২ লাইনে কোনও গঠনগত সমস্যা নেই তো? একটু ভেবে দেখো। ১৮ পৃষ্ঠার ১৩-১৪ লাইনে 'রুশ সাহিত্যের দিক্‌পাল গল্পলেখকও' বলে ছেড়ে দেবে, না কি গল্পলেখকের নামটাও দিয়ে দেবে? ২২ পৃষ্ঠার ১১-১৩ লাইনে 'সে'-জাতীয় কোনো একটা কর্তৃপদ কি কোথাও দেওয়া যায়? আর ৬০ পৃষ্ঠায় লক্ষ কোরো, শেষদিকে চার লাইনের মধ্যে গ্যোয়েটের পুত্রবধূর নামটা তিনরকম হয়ে আছে। ওকে একাকার করে দিয়ো।

তুমি দেখে দেবার পর আমি একবার পড়ে দেব, তোমার সংশোধন যদি কিছু থাকে তা যাতে ঠিকমতো সাধিত হয় সেদিকেও নিশ্চয় নজর রাখব। প্রুফ প্রসঙ্গটা শেষ করবার আগে এইটুকু শুধু বলি যে, আরো একবার পড়তে গিয়ে মনটা বেশ প্রসাদে ভরে উঠল। এই সিরিজে, এ একেবারে আমার মনের মতো লেখা। আর আমার মনটা যেহেতু বারো বছরেই থমকে আছে, আশা করছি ওই-বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে

গুন্টার গ্রাসের সঙ্গে

এটা আমার এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আপনি বাধা দিলেন তাই জানাতে পারলাম না আপনার কত কবিতা আমি মুখস্থ বলতে পারি।

এর খুবই আদর হবে। বিষয়ের মহিমাকে কিছুমাত্র লাঘব না করেও যে অল্পবয়সীদের সঙ্গে তাদেরই ভাষায় কথা বলা যায়, অনেকেই সেটা বুঝতে চান না। তুমি ঠিক সেইভাবেই বলতে পেরেছে, রীতিমতো গরীয়ান ভাবে।

কয়েকদিন আগে দিল্লি থেকে প্রকাশের[১] একটা চিঠি পেয়ে আমি একেবারে আলোড়িত হয়ে আছি। মাসিমার কাছ থেকে নিয়ে ও 'ছোট্ট একটা স্কুল' গড়েছে আর তা-ই নিয়ে আমাকে লিখেছে। আমি তো তাজ্জব।

এদিকে 'ভারত কেবলই ঘুমায়ে রয়'টা যে আমরা আর মানতে চাইছি না সে তো টের পাচ্ছ ওখান থেকে। বিস্ফোরণের তাপে জার্মানিও কি গরম হয়ে উঠেছে? অন্তত, লোকে তো বলছে দার্জিলিঙে এখন যে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে ঘুরে বেড়ানো যাচ্ছে, পোখরানই তার কারণ।

ভয়ের কথা হচ্ছে, এমন একটা কাণ্ডে দেশের বেশির ভাগ মানুষই আহ্লাদে আত্মহারা, প্রবল জাতীয় গর্বে আর বিজাতীয় প্রতিস্পর্ধিতায় লোকে বেশ ভালোভাবেই খেপে উঠেছে। বড় রকমের বিপদ ঘিরে আসছে মনে হয়, কিন্তু আমরা এখনও মেতে আছি ছোটো ছোটো দলাদলি নিয়ে।

তুমি বেশ ব্যস্ত আছো তো? আমি আছি যথারীতি আমার ভারাক্রান্ত অকর্মণ্যতা নিয়ে, বিলাপমন্থর ব্রস্ততায়।

শঙ্খদা

টীকা:

১. গ্যোয়েটে: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রকাশক: প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা- ৪।

২. অরিজিৎ কুমার। 'প্যাপিরাস' প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার।

৩. জার্মানি থেকে স্বদেশমুখী এক বন্ধু যাঁর হাত দিয়ে 'গ্যোয়েটে' সংক্রান্ত জীবনীর খসড়া পাঠানো হয়েছিল।

৪. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর ভাই।

৫. জনৈক বন্ধু।

৬. প্রকাশ বসু। অলোকরঞ্জনের ভগ্নীপতি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

মীণাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

১৮ মে, ২০০৮
বার্লিন

অলোকদা*

ভাগ্যিস হানসের[২] নিমন্ত্রণ স্বীকার করে হাইডেলবার্গ[৩] গিয়েছিলাম, তাই এতবছর পরে আপনার সঙ্গে আলাপ হবার সুযোগ হোলো। এটা আমার এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আপনি বাধা দিলেন তাই জানাতে পারলাম না আপনার কত কবিতা আমি মুখস্থ বলতে পারি।

আপনার সই করা বই উপহার পেলাম— সেটা আমার তরুণী [sic] সুজিতকে জানাতে ইচ্ছে করছিল। সেও ছিল আপনার কবিতার উৎসাহী পাঠক। সেদিন রাত্রেই হোটেলের ঘরে বসে 'পাতাল গ্যারেজ থেকে'* পড়লাম। একবার নয়, অনেকবার। অনেকবার। অনেকদিন পরে আবার আপনার শব্দের জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ। 'অহং-ঝনৎকার'* 'স্বননসূর্য'* সমানে মাথার মধ্যে ঘুরছে। 'ছাইদানের ভিতরে কলম থেকে/ঝরে পড়তে থাকে গনগনে মোমের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।' সহজে ভোলার নয়।

আপনার ঠিকানা দিয়েছেন— মাঝে মাঝে বিরক্ত করব।

শুভেচ্ছা সহ
মীনাক্ষী*

*কবিতার বই-এর পিছনে আপনার জন্মসাল থাকে, তাই জানি আপনি অগ্রজ। কিন্তু দাদা বলার অধিকার অর্জন করেছি কিনা জানি না। তাই মার্জনা চেয়ে রাখি।

টীকা:

১. হান্স্ হার্ডার অলোকরঞ্জনের ছাত্র।

২. হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে অলোকরঞ্জন নব্যভারততত্ত্ব পড়ান।

৩. অলোকরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থ 'পাতাল গ্যারেজ থেকে গাড়ি তুলে সূর্যের সফর' (অনুষ্টুপ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ২০০২)

৪. 'আমি তখন অহং-ঝনৎকারে/অন্ধকার গুহায় গেলাম ছুটে।' ('ঘরানা' কবিতার অংশ, উক্ত কাব্যগ্রন্থের)

৫. 'স্বননসূর্য— এ কোন শব্দ/ফুলচন্দন হয়ে হঠাৎ/টুপ করে যেই পড়ল ঝরে' ('নতুন শব্দ' কবিতার অংশ, উক্ত কাব্যগ্রন্থের)

৬. মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সাহিত্যের ঐতিহাসিক।

কবিতা সিংহর চিঠি

ওঁ

৬/১১/৮৬
W2A(R) 14/9
Phase IV, Golf Green,
Cal 700045

ভ্রাতৃপ্রতিমেষু

ফ্রাঙ্কফুর্ট[১] থেকে ১১ তারিখে রওনা হয়ে প্যারিস touch করে লন্ডন যাই। সেখানে আমার presentation সুগৃহীত হয়েছিল। তারপর Paris না গেলেই পারতাম। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের[২] উপস্থিতির জন্য তিক্ততা তত প্রবল হয়নি এই মাত্র বলতে পারি।

কলকাতায় ফিরে শুনলাম জনে জনে বলছেন ফ্রাঙ্কফুর্টে আমরা নাকি সমাদৃত হইনি এবং জার্মান লেখকরা আমাদের প্রতি আগ্রহ দেখান নি। এমন কথা ছাপার অক্ষরে এমন একজন জার্মানী থেকেই লিখে পাঠিয়েছেন যিনি T.V. এবং মার্ক রোজগারে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। মুকুল গুহ[৩] জানালেন তিনি এর প্রতিবাদে লিখছেন। আমাকেও বোধহয় মুখ বন্ধ করে থাকা চলবে না। আপনি যদি সম্ভব হয় নির্দেশ দেবেন ওঁদের আমাকে যেন কিছু write-up পাঠান যাতে আমার লেখা তথ্য নির্ভর হয়।

আপনার ও ট্রুডবার্টার[৪] ভালোবাসা ও সহৃদয় সাহায্য ভুলব না। আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন, আমার confidence ফিরিয়ে দিয়েছেন। একলা একলা যুদ্ধ করে চলেছি। আপনার ভাই শ্রীমান অভিজিত আমাদের বেতারে অনুষ্ঠান করছেন। দীপংকরকে[৫] আশির্বাদ [sic] জানাবেন। আপাতত on promotion কিছু দিনের জন্য দ্বারবঙ্গে বদ্‌লি হচ্ছি। কারণ কলকাতা বা বাংলা Station-এ post খালি নেই। T.V. বা কলকাতা বেতারে চলে আসছি কিছু মাসের ব্যবধানে। আপনি ভালো থাকুন। শ্রীবৃদ্ধি হোক।

ট্রুডবার্টা ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শান্তিতে থাকুন। এখানে অতন্দ্র গোলাপ[৬] সবাই খুবই পছন্দ করেছেন। আমার অভিজ্ঞতায় আন্তিগোনে[৭] কিন্তু আজও imagination ছাড়িয়ে গেছে।

ভালোবাসা।
—কবিতা

পুনশ্চ: দায়িত্বহীন কাজ ও দায়িত্ব বিহীন Station-এ আমরা যে কি ভাবে সম্পর্কের ক্ষতি করি, তা লিখে বলব না মুখেই জানাবো। আর অপাত্রে করুণা দান করলে যে কি হয় তাও।

টীকা:

১. ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ব বইমেলা। বিষয়: ভারতবর্ষ।
কবিতা সিংহ ছাড়াও সেই বছর ফ্রাঙ্কফুর্টে উপস্থিত ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, মুলকরাজ আনন্দ, দিলীপ চিত্রে, অরুণ কোলাৎকার-সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্ব।

২. কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (৫ মে ১৯৩৫— ৬ মার্চ ২০১১)।

৩. সাংবাদিক। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন রাইনার মারিয়া রিলকের 'ডুইনো এলিজি'।

৪. ট্রুডবার্টা ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

৫. অলোকরঞ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি দীপঙ্কর দাশগুপ্ত।

৬. অতন্দ্র গোলাপ: রাইনার মারিয়া রিলকের জীবন ও শিল্প নিয়ে কোলাজ। ভাবনা, নাট্যভাষ্য ও অনুবাদ: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ম্যাক্সমুলার ভবন মঞ্চে এই নাটক প্রথম অভিনয় হয় ৯ আগস্ট ১৯৮৬, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

৭. আন্তিগোনে: গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লেসের (আনুমানিক ৪৯৬-৪০৫ খ্রী. পূ.) নাটক। অনুবাদ: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৩। সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রালের ময়দানে শামিয়ানা নাটমঞ্চে (৬ এপ্রিল — ৫ মে, ১৯৭৯) এই নাটকের অভিনয় হয়। নাট্যপরিচালক: হান্স্ গুন্টার হাইমে। *(শেষ)*

আপনার ও ট্রুডবার্টার ভালোবাসা ও সহৃদয় সাহায্য ভুলব না। আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন, আমার confidence ফিরিয়ে দিয়েছেন। একলা একলা যুদ্ধ করে চলেছি।

উৎস: 'অহর্নিশ', বিশেষ সম্মাননা সংখ্যা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৮০। সম্পাদনা: শুভাশিস চক্রবর্তী

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

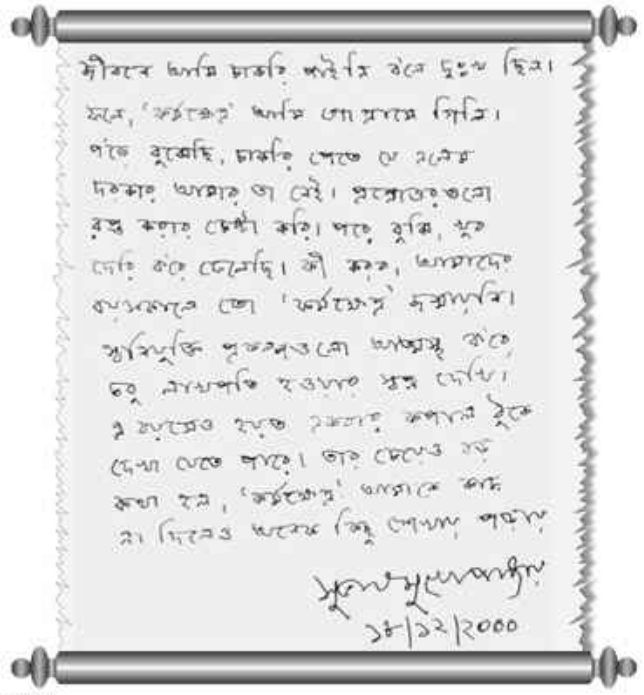

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

পাঠকের চিঠি

বিষয়: মহাজনসঙ্গ

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার শুরু থেকেই আমি এর পাঠক। খুব মন দিয়ে প্রতিটি লেখা পড়ি, কারণ, যথার্থ সাহিত্যপত্রিকা বলতে যা বোঝায় বাংলাবাজারে 'কালের কষ্টিপাথর'ই সেই অর্থে একমাত্র। আমার অনেক প্রিয় লেখককেই আপনারা আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। অমিতাভ চৌধুরি আমার তেমনই একজন প্রিয় লেখক। কয়েক সংখ্যা আগে তাঁর কতগুলি ছড়াও আপনারা ছেপেছেন। তার মুখবন্ধটি বড় মর্মস্পর্শী। চোখে জল এনে দিয়েছিল। শুনলাম তিনি অসুস্থ। হয়তো স্বহস্তে লিখতেও অপারগ। তবু রসবোধ, রাজনীতি-চেতনা ইত্যাদি যে একটুও হারাননি, তার প্রমাণ ওই ছড়াগুলি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমার প্রিয় ছড়াকারের, তাঁরই ভাষায় 'শেষ খাতাটি' পাঠকের সামনে হাজির করার জন্য।

'কালের কষ্টিপাথর' মার্চ সংখ্যায় তাঁর দীর্ঘদিন ধরে চলা ধারাবাহিক স্মৃতিকথা 'মহাজনসঙ্গ'ও শেষ হয়ে গেল। অনেক দুর্লভ ছবি এই সংখ্যায় দেখতে পেলাম। লেখক এই পর্যায়ের শেষ লেখাটি, যেটি মার্চ সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে, তাতে খেদ করেছেন, আরও অনেককে নিয়েই লেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু লেখা হল না। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, লেখক শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করলেও, শান্তিনিকেতন এবং তার মানুষজন কিন্তু সেভাবে সামনে আসেননি। যতদূর মনে পড়ছে এক রানি চন্দ-অনিল চন্দ এবং আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ছাড়া। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গেও লেখকের নিবিড় সম্পর্ক ছিল, আছেও। সেই সূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথিতযশা গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গেও তাঁর গভীর সখ্য ছিল, একথা জানতাম। কিন্তু সে জগতটাও সেভাবে ধরা পড়ল না। মার্চ সংখ্যায় একটা ছবিতে দেখলাম, লেখক এবং পুত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র মুখোমুখি বসে কথা বলছেন। অথচ সুচিত্রাদেবী তাঁর কোনও স্মৃতিচারণায় এলেন না। একথা বলছি এই জন্য যে সুচিত্রা মিত্রকে নিয়ে কথা হলেই, অবশ্যই ফিরে আসত আই পি টি এ বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উজ্জ্বল অতীতের কথা। নিশ্চয়ই কথাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হতেন সলিল চৌধুরি, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রবিশঙ্কর। এবং অবশ্যই সুচিত্রা-কণিকার জনপ্রিয়তার চাপা-লড়াই কিংবা দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্রকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই চিরকালীন বিতর্ক। রবীন্দ্রসঙ্গীত শান্তিনিকেতনের গায়কি-ছকের বাইরে আসবে নাকি চলবে আক্ষরিক অর্থে সিলেবাস মেনে, তাই নিয়ে ষাট-সত্তরের দশকের সেই দ্বন্দ্ব। কত ছবিই এই প্রসঙ্গে মনে আসে! অভিমানী দেবব্রত তখন আক্ষরিক অর্থেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের তথাকথিত অভিভাবকদের কাছে 'ব্রাত্য'। শ্রোতারা অবশ্য তাঁর কাছ থেকে কখনওই দূরে সরে যাননি। রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসদনে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গাইছেন। মঞ্চের ডানদিকে হঠাৎ দেখলাম তাঁকে। একমুখ দাড়ি। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, লুঙ্গি। গাইবেন না, শুনতে এসেছেন।

এইসব ছবি নিশ্চয়ই জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত শ্রীচৌধুরির কলমে। হয়তো তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণেই একটা ছেদ পড়ে গেল। অধরা রয়ে গেল বাংলা সংস্কৃতির এক চলমান ইতিহাস। সাংবাদিক হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই অনেক বিস্ফোরক ঘটনারও সাক্ষী। এতদিন পরে সেসব কথা খুলে বললে নিশ্চয়ই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মানুষজনকে বিব্রত করা হত না। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না, 'মহাজনসঙ্গ' নিয়ে এটা একটা বড় হতাশার জায়গা।

মার্চ সংখ্যায় 'মহাজনসঙ্গ' কলমে প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ মহাজনসঙ্গ: শেষ কথা' শিরোনামের লেখায় চোখে পড়ল তিনি এমন অনেকের নাম করে তাঁদের সম্পর্কে লিখতে না পারার জন্য খেদ করেছেন, যাঁরা তাঁর সমকালীন তো নয়ই, পৃথিবীর ইতিহাসের এক-একটি প্রাচীন চরিত্র। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, তৈমুর লং, সমুদ্রগুপ্ত, চাণক্যদের নাম কেন তিনি উল্লেখ করলেন, তা স্পষ্ট নয়।

তবু সব মিলিয়ে একটি উপভোগ্য ধারাবাহিক লেখা উপহার দেওয়ার জন্য প্রবীণ এই লেখককে প্রণাম জানাই।

প্রণব বৈদ্য
হাওড়া

যুক্তবিচিন্তা

'কালের কষ্টিপাথর' মার্চ সংখ্যায় 'ছিন্নবিচিন্তা' স্তম্ভে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি পড়ে এই চিঠি লেখার জন্য অনুপ্রাণিত হলাম। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মফস্সলবাসের দিনগুলির কথা লিখেছেন। জীবনের শুরুর দিকে এরকমই এক নতুন গড়ে ওঠা জনপদে বর্তমান পত্রলেখককেও থাকতে হয়েছিল। এবং কোনও মহল্লা নতুন গড়ে ওঠার সময় যা হয়, অর্থাৎ সেখানকার সামাজিক কাজকর্মেও ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। অফিসফেরত সন্ধের আড্ডা থেকে এভাবেই উঠে এসেছিল একটা লাইব্রেরি করার ভাবনা।

পাড়ায় দু'-একটি পরিত্যক্ত জমি তখনও ছিল। তড়িঘড়ি পেল্লাই ফ্ল্যাট উঠে পড়ার যুগ সেটা নয়। পঞ্চায়েতে তদ্বির করে একটুকরো জমি জোটানো গেল। পল্লিতে যাঁরা ইট-বালি-সিমেন্টের ব্যবসা করতেন, আমাদের এককথায় এগিয়ে এলেন সাহায্যের জন্য। সম্মিলিত চেষ্টায় একটা ঘর দাঁড় করানো গেল। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে পুরনো বই চেয়েচিন্তে এনে লাইব্রেরি শুরু করে দিলাম। রোজ বিকেলে লাইব্রেরি-ঘর খুলত পাড়ার কিশোর-যুবকদের দলটি। আমরা অফিস থেকে ফিরে সেখানে একজোট হতাম।

এই লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে কীভাবে একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেকথা বলি। আমরা প্রথম-প্রথম প্রত্যেক বছর রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী পালন করতাম লাইব্রেরির তরফে। কাজের সূত্রে শহরে আসতেই হত। সেখানকার চেনাজানা গায়কবন্ধুদের নিয়ে যেতাম মফস্সলে আমাদের পল্লিতে। স্থানীয়রা তো থাকতেনই। সে কী উদ্দীপনা! ভাবলে এখনও হৃদয় ভরে যায় সুখে।

ক্রমে আমরা আমাদের সামাজিক কর্মের পরিসরটাকে বাড়াচ্ছিলাম। সামান্য ফান্ড তৈরি করে প্রত্যেক বছর দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা থেকে শুরু করে, নাটক কিংবা আবৃত্তির ওয়ার্কশপ আয়োজন, এমনকী বইমেলা। কয়েকবছর ছোট আকারে বইমেলাও করেছি আমাদের মফস্সলে।

পরে নানা কারণে আমরা বন্ধুরা এই রাজ্য কিংবা দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ি। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হয়ে যাই। যাঁদের হাতে আমাদের শুরু করে দেওয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ব্যাটন গেল তাঁরা খুব বেশিদিন সেটা ধরে রাখতে পারলেন না। এসব ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সর্বত্র যা হয়, কিছু রাজনীতিবিদের নজর পড়ল। সহজে

পাঠকের চিঠি

লোকপ্রিয় হওয়া আর পাড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণরক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠল লাইব্রেরি। ভেঙে গেল একটা সাধু উদ্যোগ। মাঝেমধ্যে মনে হয়, আজকের যুগ হলে কি কিঞ্চিন্মাত্রও সফল হতে পারতাম আমরা? কাদের জন্য লাইব্রেরি গড়তাম? কারা পড়ত? পড়ার অভ্যাসই চলে গিয়েছে।

আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্য পড়তে ভালোবাসি। আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই খুব কর্কশভাবে বলা হল। দেবীপ্রসাদবাবু আমার বক্তব্যটাই অনেক পরিশীলিত ভঙ্গিতে বলেছেন। তাঁর খেদের কথা পড়ে মনে হল, আমার অভিজ্ঞতাটাও সকলের সঙ্গে ভাগ করা উচিত। তাই এই চিঠি।

অর্ণব মুখোপাধ্যায়
বাগবাজার, কলকাতা

বক্র শব্দ, বাঁকা কথা

'শব্দবক্র' বিভাগটি খুবই ভালো লাগছে। আগে আমরা ফরাসি ভাষায় এমন ধাঁচের কাজ হতে দেখেছি। ফ্লবেয়ারের 'ডিকশনারি অব রিসিভড আইডিয়াস' অনেকটা অভিধানের আকারই নিয়েছিল। যদিও শব্দকে সেখানে বদলানো হয়নি। সমসাময়িক প্রেক্ষিত ধরে তার অর্থকেই কেবল একটু শ্লেষ ও বিদ্রূপ মিশিয়ে পেশ করা হয়। গত শতকের প্রথম দশকে বেরনো অ্যামব্রোজ বিয়ার্সের 'দ্য ডেভিলস্ ডিকশনারি'ও ইংরেজি ভাষায় অনুরূপ উল্লেখনীয় কাজ। কিন্তু সেখানেও শব্দের মূল রূপ পাল্টানো হয়নি। বরং তা ফ্লবেয়ারের ধাঁচকেই অনুসরণ করেছে।

আমাদের বাংলায় শব্দের এমন ভাব-ভাষাগত শ্লেষাত্মক বিনির্মাণের কাজ হয়েছে, তবে তুলনায় অল্প। ফ্লবেয়ারের অভিধানের একটি চমৎকার বঙ্গানুবাদ সম্ভবত পড়েছি চিন্ময় গুহ'র কলমে। হিমানীশ গোস্বামী তাঁর 'অভিধানাইপানাই'-এ অসাধারণ কিছু উদাহরণ রেখে গিয়েছেন। হিমানীশবাবু বাংলা ভাষার শব্দাবলি নিয়ে আজীবন সিরিয়াস চর্চা করেছেন। এক্ষুনি মনে পড়ছে, তাঁর একটি ছোটগল্পে পড়েছিলাম, বিজ্ঞানী সত্যেন বোস যে-পাড়ায় থাকেন সে-পাড়ার নাম ঈশ্বর মিল লেন। পাড়ার দেয়ালে সাঁটা পাড়ার নামবাহী টিনের প্লেট দেখে হিমানীশবাবু ভাবতেন, মুদ্রণপ্রমাদেই হোক বা অন্য কোনও কারণে, নামের শেষ দু'টি শব্দ যদি একই মাত্রার নীচে চলে আসে, তাহলে নাস্তিক বিজ্ঞানীর আপন পাড়ার নাম দাঁড়াবে ঈশ্বর মিললেন। আরও ক'বছর বেঁচে থাকলে হিমানীশবাবু নিশ্চয়ই দেখে যেতেন, ঈশ্বর সত্যিই মিলেছেন, তবে কণা-অবতারে। তার নেপথ্যে ঈশ্বর মিল লেনের বাসিন্দার অবদান যথেষ্ট।

শব্দ নিয়ে খেলাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আর-একজন। তিনি, শিবরাম চক্রবর্তী। অব্যর্থ ছিল তাঁর 'পান'।

অনেকদিন পর আবার 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাভাষায় শব্দ নিয়ে, শব্দের বক্রতাকে নিয়ে মেধাবী একটি লেখা সত্যিই মন ভরিয়ে দিচ্ছে। এখানে লেখক শব্দের ধ্বনিগত অবস্থান বজায় রেখে হালকা করে শব্দগুলোকেও ঈষৎ পাল্টে দিচ্ছেন, তাতেই ধরা পড়ছে সমসাময়িক সমাজের নানা দোষাভাষ, সেটাও সার্থক। হয়তো এই ধারাবাহিক রচনা থেকেই একদিন বাংলাভাষার মূল স্রোতের অভিধানেও যুক্ত হবে নতুন কোনও শব্দ।

প্রশান্ত ভট্টাচার্য
কালনা, বর্ধমান

উপভোগ্য আলোচনা

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকায় 'বই ঠেক' স্তম্ভে বই সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং উপভোগ্য হচ্ছে। সেইসঙ্গে মার্চ সংখ্যায় সাগর চৌধুরী লিখিত 'বইবাজার'ও অত্যন্ত স্বাদু রচনা। বইপত্র নিয়ে এমন অনেক লেখা ফিরে ফিরে পড়তে চাই 'কালের কষ্টিপাথর'-এর পাতায়। সেইসঙ্গে অনুরোধ, প্রত্যেক সংখ্যায় যদি আমাদের প্রিয় লেখক-লেখিকাদের সাক্ষাৎকার ছাপেন, খুব ভালো হয়। আরও জানাই, মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের এগারোটি কবিতাও চমকে দিয়েছে তাদের বিদ্যুৎঝলকের মতো দীপ্তি দিয়ে। ওঁর কবিতা আগে কখনও পড়িনি। সব মিলিয়ে খুবই ভালো হচ্ছে 'কালের কষ্টিপাথর'।

কৃষ্ণা গুহ
ভদ্রেশ্বর, হুগলি

একটি পত্রিকার জন্য

'কালের কষ্টিপাথর'-এর পীড়াদায়ী দিক একটাই। নিয়মিতভাবে এর অনিয়মিত প্রকাশ। তবে বেশ কয়েকটি সংখ্যায় সাহিত্যপত্রিকা তথা সাহিত্যের প্রতি নব্যযুগের বিশ্বধাবী বাঙালির উদাসীনতা বিষয়ে সম্পাদকের মননশীল মনস্তাপ পড়ে এরকম উচ্চমানের মৌলিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের বাধাবিঘ্ন কিছুটা অনুমান করতে পারি। বাংলা পত্রিকার সোনালি যুগের 'বিচিত্রা' বা 'প্রবাসী'র মতো ইতিহাস সৃষ্টিকারী পত্রিকা এখন আর আদৌ টিকত কিনা সন্দেহ। 'ভারতবর্ষ', 'বসুন্ধরা', 'শনিবারের চিঠি'-ও কালের কপোলতলে বিলীন। পরবর্তী কালের সাহিত্যপত্র 'নতুন সাহিত্য'ও তো কই দীর্ঘায়ু হয়নি। এ বোধহয় বাংলার জলবায়ু বা বাঙালি মনের শরৎমেঘতুল্য সহজ আনন্দে ভেসে থাকার ফল। তার একটা বড় প্রমাণ তো আমাদের সর্বস্বগ্রাসী টিভি চ্যানেলগুলোর অব্যর্থ নেশাদ্রব্যঠাসা সিরিয়ালের মহাপ্লাবন। সব মূল্যবোধ ও নীতি পণ করে চ্যানেলগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা।

এই অবস্থায় সাহিত্যপত্রিকার প্রয়োজন আগের কালের চেয়ে এখন বেশি বই কম না। 'কালের কষ্টিপাথর'-এর মতো মননশীল সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশ কত কঠিন তা বুঝেও আশা করব, এ পত্রিকা দীর্ঘায়ু হবে।

এ পত্রিকার সম্পাদক সকলেরই ধন্যবাদার্হ, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি পত্রিকার মতো এই পত্রিকাও দীর্ঘায়ু হবে, এ আমাদের সকলেরই আশা। আন্টার্কটিকা থেকে আমাজন, মহাচিন থেকে মোঙ্গোলিয়া তিনি স্বচক্ষে দেখে সশ্রমে তুলে এনে দেখিয়েছেন বাঙালিকে। তাঁর নতুন সম্পাদনা— 'ভারতীয় ভাষায় মহিলাদের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র' ''নারীযুগ'' দেখেও এ-আশা আরও দৃঢ় হয়। তাঁর মনের কোনও স্বপ্ন নিয়ে শুরু করা কোনও পত্রিকা তিনি মাঝপথে ছেড়ে দেবেন না বলেই বিশ্বাস করি। তবে একটাই অনুযোগ। এতগুলি পত্রিকা পরিচালনার নিদারুণ ব্যস্ততায়ই কি 'বিষাদগাথা'র প্রায় এক বছর পরও তিনি নতুন কোনও ধারাবাহিক শুরু করলেন না? ওইরকম বড় ক্যানভাসে তাঁর আরও একটি উপন্যাস 'কালের কষ্টিপাথর'-এ পড়বার অপেক্ষায় রইলাম। বাল্যে তাঁর 'শাদা ঘোড়া', 'হীরু ডাকাত' পড়ার আশ্চর্য মুগ্ধতা আমার এই প্রৌঢ় বয়েসে নতুন করে ফিরে পেলাম তাঁর গভীর পরিণত জীবনসন্ধানী উপন্যাস 'বিষাদগাথা'য়।

অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর, হুগলি

ভ্রমণ কথা

ঘুরতে ঘুরতে চলে আসা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সোয়াশোঁ

সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম লাঁও। লাঁও পাথরে তৈরি এক প্রাচীন ও মায়াবী শহর, ফ্রান্সের ইতিহাসের গন্ধে-স্পর্শে ভরা। প্যারিসে এসেছি সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখে। ২৬ তারিখ সন্ধে প্রায় সাতটা পর্যন্ত ছিলাম কলকাতায়, অফিসে।

সোয়াশোঁ

অফিস থেকেই সোজা এয়ারপোর্ট। দিল্লি হয়ে সেই রাতেই প্যারিসের পথে। ভোরে ভিয়েনায় বিমান বদলিয়ে প্যারিস। প্যারিসের কাছেই গ্রিজি-অঁ-ফ্রাঁস-এ একটি আলোচনাচক্রে আমার নিমন্ত্রণ।

দু'দিন সারাদিন দফায় দফায় আলোচনা। এক-একটি টেবিলে পাঁচ দেশের পাঁচজন পত্রিকা পরিচালক। ভারতের তিনজনকে তিন টেবিলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত থেকে এসেছেন আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট চিত্রভানু সেন, দ্য হিন্দু পত্রিকার জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর নরসিংহম মুরলী আর 'ভ্রমণ' ও 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকার আমি। প্রত্যেক টেবিলেই আরও চারটি দেশের আলোচক। আমার টেবিলে আছেন অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জামানি ও দক্ষিণ কোরিয়ার চারজন।

দেশবৈচিত্রের দিক থেকে আমার কাছে আরও আনন্দের হয়েছিল আলাদা ওয়ার্কশপগুলো। বিশাল হল-এ সকাল ও বিকেলের দু'টি করে দীর্ঘ অধিবেশনের মাঝে আলাদা পাঁচটি ঘরে এই ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা। এক-একটি ঘরে নানা দেশের বারোজন পত্রিকা পরিচালকের একান্ত আলোচনা ও মতবিনিময়। আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে ছিলেন ন'টি দেশের মোট এগারোজন। হন্ডুরাস, আয়ারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ইতালি, ডোমিনিক্যান রিপাবলিক, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ছাড়া জামানি ও ইংল্যান্ডের দু'জন করে। ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের Editorial AA পত্রিকার প্রেসিডেন্ট আনিবালডি কাস্ত্রো আমাকে তাঁদের দেশে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। মূল অধিবেশনে ও ওয়ার্কশপে আমার সহআলোচকদের গণ্ডির বাইরে পেরুর Expreso কাগজের প্রকাশক ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক এদুয়ার্দো কালমেল তো আমার বন্ধুই হয়ে গেলেন। তাঁর বিজনেস কার্ডের পিছনে 'যত শীঘ্র সম্ভব পেরুতে

সোয়াশোঁ

ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখি খুবই ছোট্ট হোটেল, বোধহয় চার-পাঁচটা ঘর, ঘরের দেওয়াল জোড়া জানলা আর সেই জানলা জোড়া নদী। ভাড়া? স্টেশন থেকে হোটেল পর্যন্ত ট্যাক্সির যা ভাড়া হোটেলেরও তাই ভাড়া। ৮০ ফ্রাঁ।

আসতে আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি'— লিখে কার্ডটি আমাকে দিলেন।

২৮ তারিখ দু'টি দীর্ঘ অধিবেশন, দুদফা ওয়ার্কশপ, নৈশভোজ শেষ হল রাত এগারোটায়। তখন, এখন আর মনে নেই তিনি কোন দেশের কোন পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর সঙ্গে গ্রিজির প্রায় জনহীন পথে ঘুরে বেড়ালাম, সঙ্গে গ্রিজির মানচিত্র। দূরে দূরে নিরহঙ্কার ছোট ছোট বাড়ি, সব বাড়িতেই ছোট বড় বাগান, এমন পরিপাটি মফস্‌সল শহর, ঠিক যেন পটে আঁকা, কয়েকটা দিন থেকে যেতে ইচ্ছে হয়।

হোটেলে ফিরে এলাম রাত একটায়। ঘড়িতে তখন ২৯ তারিখ। কলকাতায় ওই তারিখেই বিকেলে রবীন্দ্রসদনে একটি সাহিত্য পুরস্কার গ্রহণ করে আমার কিছু বলবার কথা। সেটি লিখে, ফ্যাক্স করে শুতে গিয়েই আনন্দে চমকে উঠলাম— কাচের জানলা ছাপিয়ে গিজগিজে তারা ভরা আকাশ! অনেকদিন আগে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে স্নান সেরে পরদিন উত্তরকাশীতে এই তারাভরা আকাশ দেখেছিলাম।

দু'দিনের আলোচনাচক্রের শেষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ট্যুরিস্ট কোচে প্যারিস পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা, অথবা যাঁরা দেশে ফিরবেন, তাঁদের বিমানবন্দরে। আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম লাঁও। জায়গাটার কথা হোটেলের একটি ছেলের কাছেই শুনেছিলাম। তার ছেলেবেলা কেটেছে তার প্রিয় ওই দুর্গনগরীতে। সে-ই আমাকে সঙ্গে করে প্রথমে শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে ও সেখান থেকে গার দু নর-এ পৌঁছে দিয়ে যায়। গার দু নর বা উত্তরের স্টেশন থেকে লাঁও (Laon) ১৪০ কিলোমিটার। দু'ঘণ্টার রাস্তা, ভাড়া ১৪০ ফ্রাঁ, আমাদের হাজার টাকার মতো।

ছোট্ট ছিমছাম স্টেশন, ছোট্ট শহর, যেন একটা দোতলা শহর, রাস্তা ছেড়ে দেড়শ-দুশো সিঁড়ি ভেঙে দোতলার সেই পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছতে হয়। এই অংশটাই প্রাচীন দুর্গশহর। ইতিহাস-উৎকীর্ণ পাথরের শহর। শহরটির নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে লাঁওকে আলোর শহরও বলা হয়। দুর্গ গির্জা প্রাচীন অট্টালিকার গায়ে বিকেলের অদ্ভুত আলোর জন্যই এ শহরকে আলোর শহর বলতে ইচ্ছে করে।

এখানেই দু-সারি প্রাচীন বাড়িঘরে ঘেরা একটা গলির মধ্যে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে এসে আলাপ হল এক বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে। কথায় কথায় বললেন, কাল তাঁরা যাচ্ছেন সোয়াশোঁ (Soisson). সোয়াশোঁ ছিল ফ্রান্সের প্রথম রাজধানী, কাল সেখানে মধ্যযুগোৎসব, সোয়াশোঁর রাস্তা জুড়ে বসবে মধ্যযুগীয় বাজার।

সোয়াশোঁ কোথায়, কোন দিকে, কত দূর?

দু'জনেই সমান উৎসাহে আমাকে সোয়াশোঁর হদিশ দিলেন। লাঁও থেকে প্যারিসের দিকে মাত্রই ৩৫ কিলোমিটার। সোয়াশোঁতে এন (AISNE) নদীর ধারে একটা হোটেলের খবরও দিলেন এঁরা।

পরদিন সকালের ট্রেনে সেখানে পৌঁছে শুনলাম হোটেলটা বেশ দূরে। দূরত্বের কথা বলে এক ভদ্রলোক অদূরের একটা ট্যাক্সির ডিকি খুলে আমাকে বললেন— রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে নদীর ধারে শুয়ে থাকতে বোধহয় তোমার বেশি ভালো লাগবে। তোমার হোটেলটা একেবারে নদীর ওপরেই।

ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখি খুবই ছোট্ট হোটেল, বোধহয় চার-পাঁচটা ঘর, ঘরের দেওয়াল জোড়া জানলা আর সেই জানলা জোড়া নদী। ভাড়া? স্টেশন থেকে হোটেল পর্যন্ত ট্যাক্সির যা ভাড়া হোটেলেরও তাই ভাড়া। ৮০ ফ্রাঁ।

আমি এর নাম না জানলে কী হবে,

সোয়াশোঁ বহুকাল ধরেই ফ্রান্সের একটি বিখ্যাত শহর। এ শহর শিল্প আর ইতিহাসের শহর। ৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে গল-এ ক্লোভির কাছে শেষ রোমান জেনারেল সিয়াগ্রিয়াসের পরাজয়ের পর সোয়াশোঁ হয়ে গেল মেরোভিনজিয়ান বংশের রাজাদের অধীনে ফ্রান্সের প্রথম রাজধানী। এই ক্লোভিকে আবার খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন সেন্ট রেমি, পঞ্চম শতকে ৩৫ কিলোমিটার দূরের লাঁও সাধু রেমির শাসনাধীনে ধর্মশাসিত শহর হয়ে ওঠে। এই যে আমি লোকের মুখে শুনে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম লাঁও আর সোয়াশোঁ, এই পুরো এলাকাটার নাম পিকার্ডি অঞ্চল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সোয়াশোঁর অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। এখনও যেখানে যেটুকু আছে, যাঁরা প্যারিসে আসেন তাঁরা অন্তত একবেলার জন্যও এসে দেখে যেতে পারেন। আমার মতো ঘুরতে ঘুরতে যদি চলে আসেন তো আরও ভালো, তাহলে হয়তো আরও কোনও না জানা জায়গার সন্ধান পেয়ে যাবেন। তবে লাঁও-সোয়াশোঁ এলে প্রথমে আসবেন সোয়াশোঁ তারপর লাঁও। প্যারিসের গার দু নর থেকে সোয়াশোঁই আগে পড়বে।

সোয়াশোঁর বিধ্বস্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কিছু কিছু মূলের মতোই পুনর্গঠন করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ থেকেও আদি সৌন্দর্য খানিকটা হয়তো আঁচ করা যায়। পুরো শহরটা হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ালাম, ভারি ভালো লাগল।

মধ্যযুগের বাজার বলতে পশুপাখি টুপি-দস্তানা হাতা খুন্তি ছুরি তলোয়ার পাথর বা ধাতুর বাহারি পানপাত্র— প্রাগ-আধুনিক যুগের যাবতীয় জিনিসের পশরা। পশুপাখির মধ্যে ঘোড়া কুকুর বিচিত্র পাখি ইত্যাদি বিধাতার হরেক সৃষ্টি।

মধ্যযুগউৎসবে মধ্যযুগের এই বাজারে আধবেলা ঘুরে ফ্রান্সের সে-যুগের ঘর-সংসারের খানিকটা যেন আঁচ পেলাম।

এবার গ্রিজি-অঁ-ফ্রান্সে এসে প্যারিসের পরিচিত কাউকে সে-খবর জানাইনি। প্রথমত নিশ্ছিদ্র আলোচনাচক্র, তারপর ৮ অক্টোবর এখান থেকেই যাব দূর দেশের নিমন্ত্রণে, মাঝের ক'টা দিন দেশে ফেরার পক্ষে ব্যয়বহুল, প্যারিসের প্রিয়জনসঙ্গের পক্ষে অপ্রতুল। প্রথম ফোন করলাম সোয়াশোঁ থেকে, মালাকফের মাদাম ঘোষকে। তিনি টেলিফোনেই হইহই করে উঠলেন— প্যারিসে পুজো হচ্ছে আর আপনি এখানে এসেও কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন! এক্ষুনি চলে আসুন, মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ-এ বাঙালিদের এই দুর্গাপুজো দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ মনে আছে? সেই যে সিতে য়্যুনিভারসিতেতে।

শুনলাম আজ নাকি অষ্টমী।

সিতে য়্যুনিভারসিতে বা ইউনিভার্সিটি সিটিতে পৃথিবীর নানা দেশের নিজস্ব মেজোঁ বা ভবন, সাত নম্বর প্রবেশপথ দিয়ে সোজা মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ, ভারতভবন। ঢাকের আওয়াজেই চেনা যায়। সঙ্গে কাঁসর-ঘণ্টা। নিমেষে মন নেচে ওঠে। দোতলায় উঠেই পুজোর প্রসাদ, দুপুরে ভোগ— ভাত আর পাঁচরকম সবজির গরম চচ্চড়ি বা তরকারি, প্লাস্টিকের গ্লাসে পায়েস। কোথায় কী খেয়ে বেড়াচ্ছিলাম, প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে গেল।

এমন নিষ্ঠাভরে এমন সমবেত আনন্দে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুজো বহুকাল আমার দেখা হয়নি। সেইসঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কোনওদিন ওড়িশি নৃত্য, কোনওদিন কত্থক, সঙ্গে প্রতিদিন কাকলী সেনগুপ্তের গান। প্যারিসের বাঙালিদের এই পুজোয় শুধু বাঙালি নয়, অনেক বিদেশিও আসেন। ফরাসিদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সকলেই শ্রদ্ধা ও আগ্রহ নিয়ে একইসঙ্গে আমাদের শাস্ত্র ও সংস্কৃতি আস্বাদ করেন। এই ভারতোৎসবে যেন সারা বিশ্বেরই অবারিত দ্বার। যে কেউ এখানে প্রসাদ পাবেন, যে-কোনও অঙ্কের চাঁদা দিতে পারেন, চাঁদা নিয়েই রসিদ কেটে দিচ্ছেন সৌম্যদর্শন গবেষক শিবজ্যোতি গুহ— বাঙালির গৌরব সস্মিত সেনগুপ্ত দিলেন পাঁচ হাজার ফ্রাঁ। চোদ্দ বছর পর প্রবাসে পুজোর আড্ডায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ হল। গল্প হল বাঘাযতীনের নাতি পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সেই যে এক ফরাসি মেয়ে 'গাছ' নামে ফিল্ম করেছিলেন, তাঁকে দেখলাম যজ্ঞের নিয়মকানুন আচার-অনুষ্ঠান দেখে দেখে ডায়েরিতে নোট করছেন। ছোট্ট একটি ফরাসি মেয়ে গাঁথছে মালা। মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ-এর ডিরেক্টর বিকাশ সান্যাল ও তাঁর লেখিকা স্ত্রী প্রীতি বহু বিশিষ্ট জনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, সব নাম এখন আর মনে নেই। কিন্তু খুব বেশি মনে আছে ১৮-২০ বছরের একটি ছেলেকে, তার নাম আলেকজান্ডার রাম চ্যাটার্জি। বাবা বারীন চ্যাটার্জি, তাঁর বাড়ি প্যারিসে, শ্বশুরবাড়ি স্লোভেনিয়ায়। ছেলেটি মায়ের রং ও চেহারা পেয়েছে, এদিকে পৈতেও হয়েছে, পরিচয় করানো মাত্র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার জন্য তার সে কী ঝুলোঝুলি! প্রায় কুস্তি করে তাকে ঠেকাতে হল। সে ইংরেজি অনুবাদে আমার শাদা ঘোড়ার গল্প পড়ে নাকি মুগ্ধ, সামনের গ্রীষ্মে আমাকে তার মায়ের দেশে নিয়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরাবে।

এযাত্রায় দেশ ছাড়বার দিনকয়েক আগে ব্যাঙ্গালোরে যেতে হয়েছিল ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটির একটি সিমপোজিয়ামে। সেখান থেকে কেরল।

কেরলের ব্যাকওয়াটারে রাইসবোটে লেখক

মধ্যযুগের বাজার বলতে পশুপাখি টুপি-দস্তানা হাতা খুন্তি ছুরি তলোয়ার পাথর বা ধাতুর বাহারি পানপাত্র— প্রাগ-আধুনিক যুগের যাবতীয় জিনিসের পশরা। পশুপাখির মধ্যে ঘোড়া কুকুর বিচিত্র পাখি ইত্যাদি বিধাতার হরেক সৃষ্টি। মধ্যযুগউৎসবে মধ্যযুগের এই বাজারে আধবেলা ঘুরে ফ্রান্সের সে-যুগের ঘর-সংসারের খানিকটা যেন আঁচ পেলাম।

কোলাম (কুইলন) থেকে কুমারকোম গেলাম কেরলের চিরাচরিত রাইসবোটে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টার জলযাত্রা, তীরের ঘরসংসার লোকজন বিশ্বপ্রকৃতি দেখতে দেখতে যাওয়া। কুমারকোমে কোকোনাট লাগুনে দু'দিন ছিলাম, সেই আনন্দ আমার বহুদিন মনে থাকবে। এই ব্যয়বহুল বিলাসবহুল ব্যবস্থার পাশাপাশি আর-একটু কম খরচে আর-একটু কম আরামে যদি আরও কয়েকটি থাকার ব্যবস্থা হয়, তাহলে আরও আনন্দিত হব।

প্রথম প্রকাশ: ভ্রমণ, ডিসেম্বর ২০০০

ছবি: লেখক

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক

বিমল মুখার্জির

দুচাকায় দুনিয়া

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

‘দেশ দেখতে কার না সাধ হয়। তবে হাতে একটা পয়সা না নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণের শখ মেটানো সময়সাপেক্ষ ও রীতিমতো কষ্টসাধ্য। আমার একযুগের ওপর সময় লেগেছিল। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৭। টাকা রোজগার করেছি পথে— কখনও ফটোগ্রাফার, কখনও নাবিক, কখনও পাইলট, নানা বিষয়ে স্কুল-কলেজে বক্তৃতা দিয়ে— কখনও বা মাছ ধরার ট্রলারে নানারকম কাজ করে, কখনও স্কুলে পড়িয়ে, ডেয়ারি ফার্মে গো-পালন করে। শারীরিক পরিশ্রম করে কতভাবে অর্থোপার্জন করেছি তার ইয়ত্তা নেই। মনে হয় এক জীবনেই অসংখ্যবার আমি জন্ম পরিগ্রহ করেছি। সব কাজের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতা বাড়াতে চেষ্টা করেছি। কত জাতের কত স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছি। তারা আমার মনের প্রসার বাড়িয়েছে এবং অনেক সংস্কারমুক্ত হতে সাহায্য করেছে। সার্থক হয়েছে আমার ভ্রমণ। মা বই লিখতে আমায় খুব উৎসাহিত করেছিলেন। বারো বছর ধরে সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিয়েছি। মা লিখেছিলেন ‘তোমার জীবনের সব ঘটনা আমার কাছে ধরা আছে। ভ্রমণ শেষ করে বই লিখতেই হবে’। তাই এই বই। ভ্রমণ শেষ করার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে লেখা।’

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

“স্মৃতির চোখে ভেসে আসে সেই দিন। বোধহয় সেটা আর্টস একরের দ্বিতীয় কী তৃতীয় মেলার উদ্বোধন। গোটা আর্টস একর সাজানো হয়েছে নানান রঙিন ফেস্টুনে। একটা শুকনো খেজুরগাছের গুঁড়ি মাঝামাঝি জায়গায় রেখে আফ্রিকার আদিবাসী শিল্পের অনুকরণে নানা মুখোশের ছবি এঁকেছি মইতে উঠে, ছাত্ররা সাহায্য করেছে। সেটাকে কেন্দ্রবিন্দু করে নানা ধরনের বিচিত্র ভাবনায় ভরিয়ে তুলেছি গোটা অঙ্গন। আলাদা আলাদা স্টল হয়েছে। কোথাও ছবির প্রদর্শনী, কোথাও পোড়ামাটির ভাস্কর্য পুতুল, ঘর সাজাবার জিনিস আসবাব, এমনকী গাছগাছালিও। অসংখ্য কৌতূহলী মানুষ। দশ টাকা থেকে শুরু করে দশ-পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে নানান শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করতে ছুটে আসতেন নানা মানুষ। বাইরে বড় বড় নতুন ধরনের তোরণ। সেই ভি আই পি-র মোড় থেকে প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার জুড়ে মাঝে মাঝে সাজানো সেই তোরণ দিকনির্দেশ করত আর্টস একরের সেই মেলার।”

১৬

আর্টস একর নানা ঈর্ষাজনিত অপপ্রচারে বিদ্ধ হলেও খুব জমে উঠেছিল। কলকাতায় যেসব বিখ্যাত মানুষ আসতেন তিনি রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, শিল্পপতি, বা পর্যটক হন না কেন— কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে এ শহরে থাকাকালীন যাতায়াতের পথে ‘আর্টস একর’ ঘুরে যাবেন না এরকম হত না। এ প্রতিষ্ঠান প্রচারের আলোয় এসেছিল নানাভাবে। ঈর্ষাকাতর আপনজনেরা যাই করতেন তাতে বিস্মিত হতাম, আমার আঘাত লাগত কিন্তু এজন্য আর্টস একর বর্ধমান হতে বাধা হয়নি। এছাড়াও প্রতি বছর মেলার আয়োজন করতাম। তাতে আর্টস একরের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা দিনরাত কাজ করত। আমি কর্মশালার মাধ্যমে ওদের উৎসাহিত করে ছবি আঁকা ছাড়াও নানান কারুকাজে প্রবৃত্ত করতাম। প্রতিটি ছাত্রকে পরামর্শ দিয়ে তাদের নিজস্ব কুশলীসত্তাকে উসকে দিতাম। কখনও কখনও হাতে হাত দিয়ে লেগে পড়তাম। আমারও উৎসাহ আর পাগলামোর অন্ত ছিল না। যারা কোনওদিন হয়তো মাটি

দিয়ে মূর্তি গড়েনি, যারা কোনওদিন হয়তো নানান বিচিত্র উপাদানে কারুকাজ করেনি বা যাদের মধ্যে রুচি, অলঙ্কারবোধ, সাজানোর ধারণা ছিল না, তারাও ক্রমশ অন্যরকম হতে লাগল। কেউ কেউ বিস্ময়কর কাজ করতে শুরু করল। নানান বিদেশি শিল্পী আসতে শুরু করলেন আর্টস একরে। সেখানে তাঁরা থেকে তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করলেন। মনে আছে, ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর হিসেবে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার কর্মসূচিতে যেমন ওখানকার বিখ্যাত মিউজিয়াম, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, খ্যাতনামা শিল্পীদের ভাস্কর্য, পটারি, এইসব স্টুডিও আর প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেভাবেই সেখানকার প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদলকে উৎসাহিত করি। ঠিক হয় একটি বিনিময় কর্মসূচি করব আমরা। সেইমতো ওখানকার বেশ কয়েকজন শিল্পী আর্টস একরে এসেছিলেন, এখানে থেকে তাঁরা কাজ করেছেন। সকলের সঙ্গে আমি তাঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম আর্টস একরের গ্যালারিতে আর শহরের একটি প্রদর্শশালায়। অনুরূপভাবে আমার ছাত্ররা আর্টস একরের পক্ষ থেকে গিয়েছিল আমেরিকায় প্রদর্শনী করতে। এভাবে জার্মানির সঙ্গে, ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের বিনিময় সম্পর্ক হয়েছিল। ক্রমশ আর্টস একর একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। কখনও কোনও বিদেশি শিল্পী আর্টস একরে নতুন ধরনের চুল্লি তৈরি করার কৌশল শেখাতে লাগলেন এখানকার সঙ্গে যুক্ত তরুণ শিল্পীদের, যা পোড়ামাটির কাজে অপরিহার্য হয়েছিল। এইভাবে আরও নানান বিভাগ যুক্ত হতে লাগল আর্টস একরে। সেরামিক কাজের জন্য, ছাপাই ছবির জন্য আলাদা আলাদা স্টুডিও তৈরি হল। তখন জমজমাট আর্টস একর। আমাদের নিজস্ব গ্যালারিতে সদস্য ছাত্রছাত্রীদের ছবি টাঙানো থাকত। প্রতিদিন দেশি-বিদেশি সংগ্রহকারীরা আসতেন। ছবি বিক্রি হতে লাগল নিয়মিত। এখানে ছবির দাম বেশি ছিল না। অথচ, একটা মান রাখার চেষ্টা করতাম। সুযোগ থাকলেও সাধারণত বিশেষ প্রদর্শনী ছাড়া আমার ছবি কখনও রাখতাম না। যাঁরা আমার সংগ্রহকারী তাঁদের উৎসাহিত করতাম আর্টস একর ঘুরে যেতে। নানা কারণে আমার মধ্যে একধরনের স্পর্শকাতরতা তৈরি হয়েছিল। মধ্যবিত্ত মানুষেরা আমাদের এই বাঙালি সমাজে বিশেষ করে শিল্পসংস্কৃতি তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এত নেতিবাচক ভাবনা, এত মানুষকে ছোট করার মজা, মনে হয় আর অন্য কোনও সমাজে নেই। তুলনায় ইউরোপ, আমেরিকার সমাজ অন্যরকম। তাদের মধ্যে সরলতা আছে, বিশ্বাস করার, সম্মানিত করার স্বাভাবিক সংস্কৃতি আছে, যা আমাদের এই পোড়া কপালের দেশে একেবারেই নেই। সমাজের ছবিটা যেন শিয়ালদা কোর্ট কিংবা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের চত্বর। আমি তো নানাবিধ ধাক্কা খেয়েছি। তা থেকে এক স্পর্শকাতরতা অতি সচেতন করে তুলেছে। কোনও মানুষ এর বাইরে বৃহত্তর ভাবনায় বা স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, তা এই মধ্যবিত্ত তথাকথিত সংস্কৃতিবান সমাজ ভাবতেই পারে না। এটাই আমায় প্রতিদিন সতর্ক করায়। কিন্তু তাতেও কি মুক্তি পেয়েছি?

স্মৃতির চোখে ভেসে আসে সেই দিন। বোধহয় সেটা আর্টস একরের দ্বিতীয় কী তৃতীয় মেলার উদ্বোধন। গোটা আর্টস একর সাজানো হয়েছে নানান রঙিন ফেস্টুনে। একটা শুকনো খেজুরগাছের গুঁড়ি মাঝামাঝি জায়গায় রেখে আফ্রিকার আদিবাসী শিল্পের অনুকরণে নানা মুখোশের ছবি এঁকেছি মইতে উঠে, ছাত্ররা সাহায্য করেছে। সেটাকে কেন্দ্রবিন্দু করে নানা ধরনের বিচিত্র ভাবনায় ভরিয়ে তুলেছি গোটা অঙ্গন। কী উৎসাহ নিয়ে দিনরাত খেটেখুটে রঙিন করে তুলেছে প্রায় চল্লিশজন তরুণ-তরুণী। আলাদা আলাদা স্টল হয়েছে। কোথাও ছবির প্রদর্শনী, কোথাও পোড়ামাটির ভাস্কর্য পুতুল, ঘর সাজাবার জিনিস আসবাব, এমনকী গাছগাছালিও। একদিকে হয়তো নানান প্রতিবাদী পোস্টারে আঁকা ছবি। অসংখ্য কৌতূহলী মানুষ। দশ টাকা থেকে শুরু করে দশ-পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে নানান শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করতে ছুটে আসতেন নানা মানুষ। বাইরে বড় বড় নতুন ধরনের তোরণ। সেই ভি আই পি-র মোড় থেকে প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার জুড়ে মাঝে মাঝে সাজানো সেই তোরণ দিকনির্দেশ করত আর্টস একরের সেই মেলার। সে-বার রুশি মোদি তখন টাটা স্টিলের চেয়ারম্যান আর ভূপেন হাজারিকা, তাঁদের অনুরোধ করেছি, সে বছরের মেলার সূচনা-অনুষ্ঠান পরিচালনা করার। উপস্থিত ছিলেন সম্মানীয় অতিথিরা, মেজর জেনারেল ব্রার, আই সি এস অশোক মিত্র আরও অনেকে। প্রায় গোটা কলকাতার এলিট সমাজের প্রতিনিধিরা, বিদেশি রাষ্ট্রদূতেরা

আর্টস একরের মেলায় সঞ্চালক ভূপেন হাজারিকা

দর্শকাসন ভরিয়ে তুলেছিলেন। চারদিকে স্থানীয় মানুষজন, গ্রামবাসী। আর অগম্য শহরতলির গলিতে কাতারে কাতারে রয়েছে বি এম ডব্লু, মার্সিডিজ আরও কত তকমাওয়ালা বিদেশি গাড়ি। তখনও কিন্তু কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় বিদেশি গাড়ির বিপণন শুরু হয়নি। সেই চিত্রিত লম্বা খেজুরগাছটির মাথায় একটি বড় আকারের রঙিন ছাতা করেছিলাম। আর তলায় ইট-সুরকিতে সাজানো গোলাকার মঞ্চ। ভূপেন হাজারিকা আর্টস একরের মেলার কথা বলে চলেন আর মাঝে মাঝে তাঁর অনবদ্য কণ্ঠে নানা ধরনের গানের কলি গেয়ে ওঠেন। তারই মাঝে পর্বে-পর্বে ডেকে নেন সম্মানিত বক্তাদের। এ-এক অভিনব উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়েছিল, বরাবরই মনে হত, দিলদরিয়া এক বাউল মানুষ। সেই রং, সেই আনন্দ, সেই মাতোয়ারা হওয়ার পরিবেশ যেখানে রুশি মোদি থেকে জেনারেল, স্থানীয় গ্রামের মানুষেরা একাকার হয়ে মেলায় মিলিত হয়েছিলেন। মেলায় সাজানো অর্ধেক সামগ্রী বিক্রি হয়ে গিয়েছিল কয়েক ঘণ্টাতেই। এসব কি আমার ছবিজীবনের মানসপট থেকে মোছা যায়? এ পৃথিবীর অজস্র ঘটনায়, অসংখ্য রঙিন, সাদা-কালো ছবির ফ্রেম সৃষ্টি হয়, মিলিয়ে যায়। হয়তো, প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের শপথ কিংবা ইংল্যান্ডের মহারানির অভিষেক পর্ব

ইতিহাসের ক্যামেরায় বন্দি আছে, থাকবে, কিংবা কারও কারও মনে। কিন্তু আমার একান্ত আবেগে, আমার তরুণ ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা, বিশ্বাস-উচ্ছ্বাস আর আমার একান্ত প্রিয় সহচরী শিপ্রার উদ্যোগে যে খণ্ডটিকে তিলে তিলে স্বর্গ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম, যার নানা ঘটনার একটি ঝলক বর্ণিত করলাম— তা তো আর কোনও ইতিহাসের গবেষক অন্তর্ভুক্ত করবেন না! আমার এই দু'-দণ্ড সুযোগে— সেখানে শব্দের বিমূর্ততায় সেদিনের দৃশ্যপট আঁকলাম তাই।

অল্প বয়স থেকে আমার কৌতূহল ছিল নানা ধরনের কাজে। আমি কখনও চুপচাপ থাকিনি। কিছুটা ঘর-খেদানো বলে হয়তো গায়েগতরে খুঁটে খাওয়ার উদ্যমটা ছিল। ছোটখাটো সব কাজই নিজের হাতে করতে ভালোবাসতাম। সেই দম আজও শরীরে আছে। আসলে চিত্রকর তো একজন কারিগর। কবিকে বা লেখককে কারিগর না হলে হতে পারে। কিন্তু আমাদের নানান যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে হয়। হাতুড়ি, ছেনি, করাত এসব আমাদের সাহায্যকারী অস্ত্র। বাড়িতে যখন বাবার কাছে ছিলাম তখনও বাড়িতে কোনও রাজমিস্ত্রি এলে বাড়ির ছোটখাটো মেরামতি-কাজ হলে আমি তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতাম। হাতেনাতে কাজ করা আর কাজ দেখার নেশা আমার আশৈশব আছে। ছবি আঁকার কৌশলও যে কিছুটা শিখতে পেরেছিলাম, তা হ্যারিসন রোডে কমলা স্টুডিওয় পোর্ট্রেট আঁকা দেখে। আর তো কুমোরটুলি। আর তো এদিক-ওদিক ভবঘুরে চোখে। পরে আমাদের বাড়ির পাশে বাবার তৈরি করা অথচ দখল হয়ে যাওয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত বাড়িটি যখন উদ্ধার করতে

আর্টস একরের মেলায় ছবির প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন ভূপেন হাজারিকা, ডঃ শিশির বসু, জেনারেল প্রার ও রুসি মোদি

পেরেছিলাম সেটাকেও নিজের মতো করে কখনও মজুর, কখনও মিস্ত্রি হয়ে গড়ে তুলেছিলাম রাজমিস্ত্রিদের নিয়ে। তাই মূর্তি গড়া, ম্যুরাল করা, কী বাড়ি করা আমার কাছে সমান কৌতূহলের, সমান বিস্ময়ের, সমান উত্তেজনার বিষয় আজও। পরে যখন আর্টস একর গড়েছি তখন উদ্যম ছিল, উদ্যোগ ছিল, অনেক ছাত্রছাত্রী ছিল, আর ছিল গোড়া থেকে শিপ্রা। কিন্তু সকলে তো সমান তৎপর হতে পারে না! যেমন, ভরসার অনেক ছিল তেমন ফাঁকিবাজও ছিল অনেক। তাই খুঁটিনাটি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হত। আমার তখন নিজস্ব পুঁজি কম। বহু মানুষ আমায় চিনতেন। কিন্তু দরজায় অনেকবার টোকা মারতে হত। তবেই দ্বার মুক্ত হত কিছুটা। একদিকে টাকা জোগাড় করা, অন্যদিকে সেই সুদূর গোপালপুরের অজানা শহরতলিতে অপরিকল্পিত গজিয়ে ওঠা মুক্তাঞ্চলে স্বর্গোদ্যান গড়ার যে কী দুঃসহ পরিশ্রম আর কত ধরনের বাধা, ঈর্ষার রক্তচক্ষু কাটিয়ে যে ভূখণ্ডে কখনও ইটগাঁথা যেত না, রাতারাতি পাঁচিল ভেঙে সাফ হয়ে যেত নির্মাণ। সেই পরিবেশকে খানিকটা আয়ও এনে বৃক্ষচ্ছায়াহীন ধুধু প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নির্মাণের তদারকি করা, মিস্ত্রি-মজুরের পাওনা সময়মতো দিতে না পারায়, নিত্যনৈমিত্তিক তাদের ভর্ৎসনা শোনা, হাজার প্রতি পনেরো টাকা সস্তা করার জন্য ইটভাটায় ধরনা দেওয়া এসবই আমায় অভিজ্ঞ করেছিল। ছবিজীবনের কাহিনি লিখতে বসে এখন মনে হয়, সমস্ত যন্ত্রণা তা মানসিক হোক, শারীরিক হোক এসবই যেন কিছুটা আমায় ধনী করেছে। আর্টস একর গড়ে তোলার ইতিবৃত্ত এতই উথালপাথালের, যার বর্ণনা জানি না কীভাবে প্রকাশ করি। বছরের পর বছর আমি বুঁদ হয়ে শুধু আমার ছাত্রছাত্রী নিয়ে এক অন্য জগৎ করে ফেলেছিলাম। সেখানে আমি তার কেন্দ্রবিন্দু হয়েও আমার নিজস্ব বলে কিছু ছিল না। পুরোদমে নিজের ছবি আঁকা সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে যোগ দেওয়া আর নিয়মিত একক প্রদর্শনী করে গেলেও আমার পরিচয় মানুষের কাছে হয়ে দাঁড়াল আমি একজন সংগঠক। আমি নাকি ছবি আঁকা থেকে দূরে সরে গিয়েছি। ক্রমশ এমন কথাও নিন্দুকরা চাউর করল, আর্টস একর শুভাপ্রসন্নর নিজস্ব

আর্টস একরের মেলায় দর্শকদের একাংশ

আমি গ্রাসকে জানালাম, আমি তোমার দেশে এসেছি, উপলক্ষ আমার প্রদর্শনী। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি যদি সামনের মাসের ১০ তারিখে আমার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে মিউনিখ আসো, তাহলে ভীষণ ভালো হবে।

রুজিরোজগারের জায়গা। এখানে যে ছবি বিকিকিনি হয় তার কিছু অংশ চলে যায় শুভাপ্রসন্নর নিজের পকেটে। এ সমাজ কখনও ইতিবাচক বা মতলববাজ ছাড়া কোনও মানুষের দেখা পায় না। মৃণাল সেন একদিন আর্টস একরের আলোচনাচক্রে বাঙালিকে কাঁকড়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ক্রমশ এধরনের নানা অপপ্রচারে যুক্ত হল কিছু বিত্তশালী মানুষও। নানাভাবে তাঁরাও বেশকিছু ছাত্রছাত্রীদের মাথায় ঢোকাতে লাগল, তোমরাই তো সব পারো। তোমরা এখানে থামো, তোমাদের ছবি এখানে বিক্রি করো, তাহলে শুভাপ্রসন্নকে তোমাদের কী দরকার! এমনকী কিছু কিছু তথাকথিত দায়িত্বশীল মানুষ ছাত্রদের মন্ত্রণা দিল, শুভাপ্রসন্ন বিদেশে আমন্ত্রণ পায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর প্রদর্শনী হয়। তোমাদের তিনি বঞ্চিত করেন কেন? এসব কথা অপরিণত মনে নিজেদের যাচাই করতে আর সত্যকার অভিভাবক-বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা হারানোর যথেষ্ট কারণ হয়ে দাঁড়াল, ক্রমশ বেশকিছু উচ্চাশী ছাত্র যেমন বিভ্রান্ত হল তেমনই আর্টস একর দখল করার একটা প্রচেষ্টা শুরু করে দিল গোপনে। যা আমার সম্পর্কের ধারণার অতীত ছিল।

তখনও কলকাতায় গ্যালারির রমরমা হয়নি। তখনও ভারতবর্ষে ছবির বাজার জমে ওঠেনি। তবে ছবির বিকিকিনি আগেকার দশকের চেয়ে অনেক বেশি। রসিক বড়লোক ছাড়াও আস্তে আস্তে বড় চাকুরিজীবী অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ ক্লাস উৎসাহিত হয়েছেন অল্প দামে ছবি কেনার। মাঝে মাঝে কিছু গ্যালারি কিংবা বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী তারা বিভিন্ন শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে কোনও এক সুন্দর জায়গায় জড়ো করে কর্মশালার আয়োজন করছেন। কিছু সম্মানদক্ষিণা, খাতিরযত্ন, আপ্যায়ন, এসব থাকে তার সঙ্গে। আমি মাঝেমধ্যে আমন্ত্রণ পাই। ম্যাক্সমুলার ভবন সুচারুভাবে নানান চিত্রকর্মশালার আয়োজন করেন। সেখান থেকেও ডাক পাই। সেসময়টা জার্মানির খুব রমরমা। তখনও বার্লিনের প্রাচীর অক্ষত। হেলমুট কোল খুব জবরদস্ত জার্মান চ্যান্সেলর। আমার কিছুটা খাতির জার্মানমহলে বেড়েছে গুন্টার গ্রাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার কারণে। অসম্ভব বিতর্কিত মানুষ তিনি। যেকথা, যেকাজ ওঁর বিবেকে আসে উনি তা সরাসরি বলে দেন। আমি আমন্ত্রণ পেলাম মিউনিখ থেকে। খুব প্রতিষ্ঠিত মূলস্রোতের গ্যালারি আমার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চায়। এসবই আমার যোগাযোগ থেকে পরপর ঘটতে থাকে, অবশ্যই আমার একান্ত ইচ্ছামতো। কাজ জড়ো করে আমি প্রস্তুতি নিই। বেশিরভাগ কাগজের ছবি সাদা-কালো চারকোলে আঁকা। সঙ্গে ইন্টাগ্লিও প্রিন্ট আর তেলরঙের কিছু ছবি। সব মিলেমিশে প্রায় পঁয়তাল্লিশটা। ভরসার মানুষ আমার বন্ধু ডাঃ জোসেফ জিয়েষ্ব বাওয়ার। এর আগেও ওর কাজে থেকেছি মিউনিখে। অনেকসময় ওর বাড়িতে জিনিসপত্র রেখে জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী করে বেড়িয়েছি। বিয়ের পরপর শিপ্রাকে নিয়েও জার্মানিতে গিয়েছি, থেকেছি ওর আস্তানা খুঁটি করে। বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়েছে। তখনও গুন্টার গ্রাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। তখন ছোট দেশ জার্মানি। কিন্তু সেদেশের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের ভাষা উচ্চারণ আর কিছু সংস্কৃতি প্রকাশে যে তফাত সেগুলি বুঝতে পেরেছি। বহুবার জার্মানিতে প্রদর্শনী হওয়ার জন্য ওই দেশটাকে আমার আপন বলে মনে হত। অনেক বন্ধু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। কেউ আনন্দে ছবি কিনেছেন, কেউ এমনি এমনি আতিথেয়তায় কৃতজ্ঞ করেছেন। কত স্মরণীয় ঘটনা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। চিত্রকর হিসেবে অহংকার দিয়েছে। আমি স্পর্ধিত হয়েছি, অভিজ্ঞ হয়েছি। সেইসব মানুষদের সাহচর্যে, আতিথ্যে, পৃষ্ঠপোষকতায় এক-এক বারের জার্মানি ভ্রমণ, প্রদর্শনী, আর সেসময়ের অভিজ্ঞতা উজাড় করতে পারলে কত কাহিনিই না জড়ো করতে পারি! এবারে অন্যরকম। পৌঁছেছি মিউনিখে। আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছে মেলানিয়া। জোসেফ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে আমার ছবির বান্ডিল, রোলকরা ক্যানভাস। সোজা এয়ারপোর্ট থেকে চলে যাই হো-হেন-ক্লিনজং ট্রাসে, জোসেফের বাড়ি। পরদিন গ্যালারিতে যাই— ই ডি এম গ্যালারি। এটি মিউনিখের বিখ্যাত গ্যালারিপাড়া। আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল, বহুকাল থেকে এই এলাকায় শিল্পীরা বাস করতেন। তাই এটা বিখ্যাত এলাকা শিল্প আর শিল্পীদের। বেশ বড় গ্যালারি। বাইরে স্বচ্ছ কাচের বড় দরজা। রাস্তা থেকে গ্যালারির অন্দরমহল, ছবি, আসবাব সব দেখতে পাওয়া যায়। মেলানিয়া আমার কাছ থেকে সব ছবি নিয়ে তালিকা তৈরি করতে শুরু করে। সঙ্গে গ্যালারির বেশ কয়েকজন যুক্ত মানুষ আর মেলানির মা— আসল মালিক। মেলানির বাবা মারা গিয়েছেন। তাঁর অনেক ধনসম্পত্তি ছিল। একসময় হয়তো এই বৃদ্ধার যৌবন-জৌলুস বহু শিল্পীকে আকর্ষিত করত। বেশকিছু সুপ্রতিষ্ঠিত নামী শিল্পীর সঙ্গে ভদ্রমহিলার একান্ত সম্পর্ক ছিল। আর এই গ্যালারি ছিল সেইসব শিল্পীর কেন্দ্র। আমাদের প্রাথমিক আলোচনা সব ঠিকঠাক হল। আগে প্রদর্শনীর উদ্বোধনের তারিখ ঠিক ছিল। সেইমতো কীভাবে ছবির ফ্রেম, কীভাবে সাজানো হবে, উদ্বোধনের সময় আর কার্ড, ক্যাটালগ নিয়েও সব ঠিকঠাক হল। এরপর ওঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন আর-এক বিশাল সেন্টারে। এটাই মেলানিয়ার মা-র বাড়ি। এরা চট করে মা-র বাড়িকে আমার বাড়ি বলে না। আমার তো মনে হয়েছিল, কর্মঠ সুঠাম চেহারার মেলানিয়া অবিবাহিত, মা-র কাছেই থাকে। ও বাড়ি গিয়ে দেখলাম, কিছুটা ঠিক। অ্যান্ড্রুর সঙ্গে পরিচয় হল, মেলানিয়ার ভাই। সেখানে কয়েকশো ছবি, চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। অত্যন্ত বিখ্যাত কিছু শিল্পীর কাজ ওঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে। একপাশে ওয়ার্কশপ। অজস্র ফ্রেম। ফ্রেমের কাঠ জড়ো করা হয়েছে। মেলানিয়া নিজেই দক্ষ কারিগর। কাজের চাপ থাকলে অন্য কেউ আসে কাজ করতে। আমাকে শিখিয়ে দিল, কী করে কোণা কাটতে হয়, কী করে জুড়তে হয়। আমি প্রাথমিক সব কাজই জানতাম। এসব কাজ ছেলেবয়স থেকে করতে হয়েছে। ক্যানভাস, কোটিং করা থেকে শুরু করে স্ট্রেচ করা। চাঁদনিচক ঘুরে ফ্রেমের কাঠ সংগ্রহ করে নিজের বাড়িতে বাঁধানো, এসবই করতাম। কিন্তু এখানে অন্যরকম। সবকিছুই মেশিনে ঝটপট হয়ে যাচ্ছে। ইঞ্চি নয়, সেন্টিমিটার। মাউন্ট কাটা থেকে শুরু করে সবই হচ্ছে মেশিনের সাহায্যে। ঠিকঠাক মেশিন চালাতে পারলে নিখুঁত কাজ হবে।

গুন্টার গ্রাসকে নিয়ে আঁকা ছবি 'র‍্যাট, ফিশ, পোটাটো অ্যান্ড গুন্টার গ্রাস'

নতুবা সব ভন্ডুল হয়ে যাবে। আমি শিখে নিই। সেইমতো ফ্রেম করতে থাকি। কিন্তু ৪৫টা ছবির ফ্রেম করা কি কম কাজ! মেলানিয়া হাত লাগালে ঝটপট হয়ে যায়। ওর দক্ষতা, পেশাদারি ফ্রেমারের মতো। আসলে ওদের সবই মাপাজোকা। আমার ধৈর্য থাকে না, ক্লান্ত লাগে। মেলানিয়ার মাকে মাঝে মাঝে দেখি, তদারকি করেন। মাঝে মাঝে কিছু খাবার নিয়ে চলে আসেন। মেলানিয়াকে বকাবকি করেন। তুমি শুভাকে

মেলানিয়ার সঙ্গে মিউনিখের আই ডি এম গ্যালারিতে

অত খাটাচ্ছ কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। দু'-একদিনেই আমি যেন তাঁদের একজন হয়ে গিয়েছি। ওঁদের ওখানে রান্নাঘর ব্যবহার করা, ফ্রিজ থেকে খাবার নেওয়া— এসবে কোনও দ্বিধা থাকে না। মাঝে মাঝে অ্যান্ড্রুর ঘরে চলে যাই। অ্যান্ড্রুর ঘর মানে এক বিশাল মিউজিক স্টোর। ও গানবাজনার চর্চা করে। নানাধরনের ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র ঘরভরতি। ছবির জগতের সঙ্গে ওর প্রায় কোনও সম্পর্ক নেই। ইতিমধ্যে অনেক ছবি ফ্রেম হয়ে গিয়েছে। প্রদর্শনীর দিন এগিয়ে আসছে। একদিন এক দম্পতি গ্যালারিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ওই এলাকায় ওঁরা খুব প্রতিষ্ঠিত মানুষ। ভরাট জার্মান স্বরে ইংরেজিতে আত্মপরিচয় দিয়ে উনি জানালেন, আমার প্রদর্শনী হচ্ছে জেনে তাঁরা খুব খুশি। সম্প্রতি প্রকাশিত গুন্টার গ্রাসের ডায়েরি থেকে ওঁরা জানতে পেরেছেন আমার কথা। ওঁদের প্রস্তাব, গুন্টার গ্রাস যদি মিউনিখের এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন, তাহলে ওঁরা অনেক বন্ধুদের ডাকবেন, প্রদর্শনী অন্য মাত্রা পাবে। এতে মেলানিয়ারা উৎসাহী, ওরা এর গুরুত্ব বুঝলেন। আমাকে নিয়ে গেলেন ওঁদের অফিসে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে উকিল, এবং খুবই প্রতিষ্ঠিত। কেন ওঁরা আমাকে এত চাপ দিচ্ছে গ্রাসকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, ঠিক বুঝিনি। তবে হ্যাঁ, তখনও উনি নোবেলজয়ী না হলেও জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমি মনে মনে ভাবলাম, গ্যালারির তরফ থেকে তাঁরাই তো গ্রাসকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। কিন্তু গ্রাস যে ওদের কাছে এতটা দুর্লভ, অধরা, আমায় পীড়াপীড়িতে আমি বুঝলাম। আমার দ্বিধা ছিল, গ্রাসের সঙ্গে এত সহজ সম্পর্ক হলেও সেই সুদূর উত্তর জার্মানি থেকে দক্ষিণ জার্মানিতে আসবেন আমার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে, যদি উনি কিছু মনে করেন, এইসব থেকে এই দ্বিধা কাজ করেছিল। শেষপর্যন্ত ওরাই আমায় টেলিফোনে ধরিয়ে দিল। আমি গ্রাসকে জানালাম, আমি তোমার দেশে এসেছি, উপলক্ষ আমার প্রদর্শনী। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি যদি সামনের মাসের ১০ তারিখে আমার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে মিউনিখ আসো, তাহলে ভীষণ ভালো হবে। এখানে আমার বন্ধুরা সবাই তোমাকে চাইছে। আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে এটাই-বা কম কী! গুন্টার গ্রাস দিনক্ষণ জেনে নেন। উনি রাজি হয়েও যান। ঠিক হয়, কখন কীভাবে, কোন প্লেনে পৌঁছবেন ইত্যাদি...

ইত্যাদি। তখনও মিউনিখে নতুন এয়ারপোর্ট তৈরি হয়নি। পরিবেশ রক্ষার জন্য স্থানীয় মানুষদের ঘোরতর আপত্তিতে থমকে আছে নতুন এয়ারপোর্ট তৈরির পরিকল্পনা। পুরনো এয়ারপোর্ট ছোট, মিউনিখ শহরের তুলনায় প্রয়োজন অনুযায়ী প্লেন ওঠা-নামার যথেষ্ট জায়গা ছিল না সেই এয়ারপোর্টে। উদ্বোধনের দিন গ্রাসের প্লেন নামার কথা ৫টায়। গ্যালারিতে লোকে লোকারণ্য। নানান ধরনের সাংবাদিক জড়ো হয়েছেন, বড় বড় ক্যামেরা। বিশাল রডে গাঁথা মাইক্রোফোন। এক বিশাল ব্যাপার। সেসময় খবর পাওয়া যায় ঝোড়ো হাওয়ার দরুন হ্যামবুর্গ থেকে মিউনিখের ফ্লাইট কিন্তু বাতিল হয়েছে। গ্রাস পৌঁছবেন রাত ১০টায়। এদিকে সাংবাদিকরা ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলেছে। অনন্ত কৌতূহল তাদের। আমি কী এমন প্রভাবশালী, বিশাল নামী শিল্পী যে গ্রাস পর্যন্ত চলে আসছে মিউনিখে, আমার ছবি দেখতে। কেউ কলকাতা শহরের কথা, আমার ছবি আঁকার বিষয়, এদেশ আমার কাছে কীরকম? আমার পাশে বসেছেন উদ্যোক্তারা, সেই উকিল-দম্পতি— যাঁরা সহযোগী এ আয়োজনের, তাঁরা জার্মান ভাষায় অবিরত বলে যাচ্ছেন। কখনও দোভাষীর কাজ করছেন। একপাশে মেলানিয়া আর অন্যপাশে জোসেফ। ক্রমশ ভিড় বাড়তে লাগল।...

কিছুটা অবশ্য আমার বিষয়ে উৎসাহী স্থানীয় মানুষদের আগ্রহ, কৌতূহল গ্রাসের সাম্প্রতিক প্রকাশিত কলকাতা বিষয়ক বইটি ঘিরে। সেটি তখনও আমি চোখে দেখিনি। কিন্তু গ্রাসের জনপ্রিয়তা আর বই বিক্রি এত সংখ্যক যেন প্রায় জার্মানির সবার কাছে পৌঁছে গিয়েছে সে-বইটি, যাতে কলকাতায় থাকাকালীন আমার বিষয়ে পাতার পর পাতা বর্ণনা আছে। প্রায় দু' থেকে আড়াই ঘণ্টা সাংবাদিকদের সামনে। তখন আমিই মধ্যমণি, গ্রাসের প্লেন না আসা পর্যন্ত। এরই ফাঁকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এয়ারপোর্ট শহর থেকে খুব দূরে ছিল না। উনি নামতেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা গ্যালারিতে— শেষপর্যন্ত পৌঁছলাম। তখন রাত ১০টা বেজে গিয়েছে। বাইরের কাচের দরজা হাট করে খোলা। রাস্তার এপার-ওপার লোকে লোকারণ্য আর অসংখ্য মিডিয়ার দল। গ্রাসকে ওঁরা বসালেন নির্ধারিত আসনে নয়, গ্যালারির সিঁড়ির ধাপে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। উচ্ছ্বসিত সেই উকিল-দম্পতি স্বাগত ভাষণ দিলেন মেলানিয়াকে পাশে নিয়ে। তারপরই গ্রাসের হাতে মাইক্রোফোন। একঘণ্টার বেশি সময় চলল তাঁর ভাষণ— সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। অসংখ্য মানুষের মাঝে ছবি দেখার উপায় ছিল না। তবে সুশৃঙ্খল মিউনিখবাসী অন্তত সেই চিত্রশালায় অমর্যাদার কিছু কারণ ঘটাতে দেননি। সেই প্রাক-সন্ধে থেকে দর্শক এসেছে। ছবি সংগ্রহ করেছে। আমি এসবের খবর সঠিক রাখতে পারিনি। দু'-একটি ছবির একাধিক ক্রেতা। সেগুলো সামলেছে মেলানিয়া। একটি ছবি, যেটিতে আমি গ্রাসের অবয়ব নিয়ে চারকোল আর অ্যাক্রেলিকে একটা কম্পোজিশন করেছিলাম— নাম ছিল গুন্টার গ্রাস পোট্যাটো অ্যান্ড র‍্যাট। সেটির ক্রেতা আবদার করলেন আমার স্বাক্ষরের সঙ্গে যেন গুন্টার গ্রাস স্বাক্ষর যুক্ত করেন। গ্রাসকে অনুরোধ করায় ফ্রেম থেকে খুলে গ্রাস তাঁর স্বাক্ষর করে দেন। ভিড় কমতে চায় না।

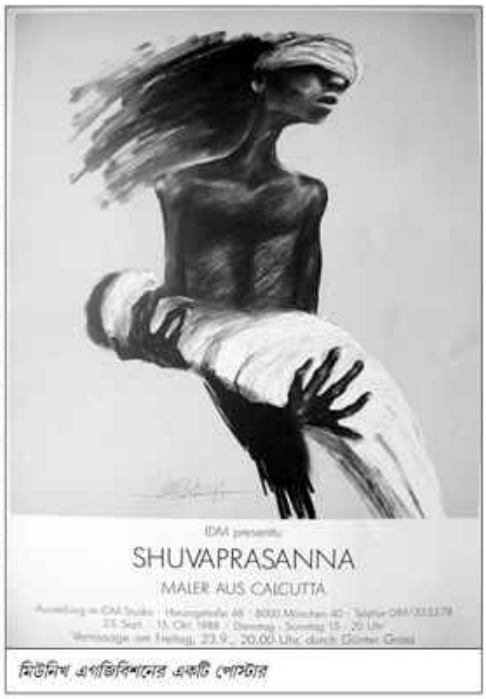

মিউনিখ এগজিবিশনের একটি পোস্টার

ব্যবস্থামতো গ্রাসকে ওঁরা নিয়ে যান পাশাপাশি বাড়ির একটি বড় সেলারে। সেখানে তাঁকে ঘিরে এক বিশাল ডিনারের আয়োজন। জানতে পারি, এঁরা মিউনিখের এস পি ডি পার্টির কর্মকর্তা, সমর্থক। গ্রাস এই পার্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। গ্রাস চ্যান্সেলর ভিলি ব্রান্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর এস পি ডি পার্টির অন্যতম মুখ্য প্রবক্তা। কিন্তু তৎকালীন ব্যাভেরিয়ার মুখ্য প্রশাসক ফ্র্যাঞ্জ জোসেফ স্ট্রাউটস, যিনি প্রবল প্রতাপশালী এস পি ডি-বিরোধী ধনকুবের বি এম ডব্লু-এর মালিক। তাঁর আচরণে, মেজাজে তিনি হিটলারি। গ্রাস সেজন্য এ-ভূখণ্ডে কখনও আসেননি, আসতে চাননি। স্থানীয় এস পি ডি-র নেতারা আমাকে উপলক্ষ করে গ্রাসকে মিউনিকের মাটিতে টেনে আনতে পেরেছেন। আমি একজন তুচ্ছ বোড়ে, আমাকে ব্যবহার করে দাবা সাজানো হয়েছে। আমি এতই তুচ্ছ যে, এসবের কোনওকিছুই আমাকে স্পর্শ করেনি। কলকাতায় দেখা সম্মানিত সে লেখক, যিনি আমার স্বপ্নের আহ্বান বাস্তবায়িত করেছিলেন, যিনি দুর্লভ কিন্তু সহজ সম্পর্কে আমায় তাঁর দর বুঝতে দেননি, যিনি আমার জীবনের এক ভয়ংকর সময়ের বন্ধু, পরামর্শদাতা আর আদর্শ হয়ে দিন কাটিয়েছেন এই শহরে আমার চৌহদ্দিতে। তাঁর বিশ্ব দার্শনিক পরিচয়, ইতিহাসের পাতায় তাঁর উজ্জ্বল অবস্থান। পৃথিবীর ভয়ংকর অধ্যায়ে তিনিও যে শান্তির এক অন্যতম যোদ্ধা আমি আর কীভাবে চিনব? আমার বৃত্তি, আমার মেধা, আমার ক্ষুদ্র পরিধিতে অত কিছু ভরাতে পারিনি। তবে আমার উপলব্ধি আছে, কিছুটা বোধও। সে-রাত্রি উনি আমার অনুরোধে বন্ধু জোসেফের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে রাত কাটালেন। কাকভোরে উঠে আমরা ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসলাম। জোসেফের বান্ধবী সুন্দরী মৃদুভাষী ক্রিস্তিনা গরম গরম জলখাবারের ব্যবস্থা করল। সঙ্গে আলাপচারিতা চলল। উনি মিউনিখ ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে একটি অনুষ্ঠানে যাবেন। সেখান থেকে পাড়ি দেবেন স্বগৃহে, উত্তর জার্মানির ল্যুবেক শহর ছাড়িয়ে। জোসেফের ভোকস ওয়াগানে উঠলাম। যাত্রাপথে গুন্টার আমাদের আন্তরিক আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, আগামী ষোলো তারিখ খুব কাছের ক'জন বন্ধুকে আমন্ত্রণ করেছি। আমি একান্তেই জন্মদিন পালন করতে স্বাচ্ছন্দ্য। তোমরা যদি ওইদিন আমার বাড়িতে আসো তো খুব খুশি হব। শুভাকে তো রোজ রোজ জার্মানিতে পাব না। জোসেফ এই আমন্ত্রণে মুগ্ধ। আমরা স্বস্থানে তাঁকে পৌঁছে দিই। বেশ কয়েকজন মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে। গ্রাস মিলিয়ে যান তাঁদের সঙ্গে কোনও এক সাহিত্য-শিবিরের উদ্বোধনে অন্য এক শহরে।

ক্রমশ

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রাজ্যপাট

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি

আলিপুর সদর মহকুমার এস ডি ও বিমল। সামনে নির্বাচন থাকায় মহকুমায় আইনশৃঙ্খলাজনিত নানা সমস্যা নিয়ে সে জেরবার। দুপুরে বিশ্রামের মধ্যেই জেলাশাসকের জরুরি ফোন পেয়ে তাকে ছুটতে হয় বিষ্ণুপুর-১ ব্লকে। সেখানে অকাল কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এদিকে কিছুটা আলস্য আর কিছুটা সময়াভাবে আয়কর রিটার্ন জমা না করায় তাঁর নামে ভিজিল্যান্স দপ্তরের চিঠি এসেছে। এমনিতে যদিও তাঁর সম্পত্তি বলতে সীমার সঙ্গে জয়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, যাতে হাজার তিনেক টাকা পড়ে আছে। এমন সময় একটি ফোন তাকে বিচলিত করে তুলল। ফোনের অন্য পারে এক মহিলার কণ্ঠস্বর। বিমলের মহকুমার একজন পুলিশ অফিসার তাকে ক্রমাগত বিরক্ত করছে বলে তার অভিযোগ। কিন্তু মহিলার কণ্ঠস্বর শেষের দিকে গায়ে পড়া মনে হয় বিমলের। ফোন ছেড়ে সে ও সি-র কাছে সংশ্লিষ্ট অফিসারের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। তারপর রেকর্ড প্লেয়ারে কুমার গন্ধর্বের কণ্ঠে রাগ দুর্গা চালিয়ে সবে রোজকার সান্ধ্যপানীয় গ্লাসে ঢেলে বসতে যাবে, এমন সময় এ ডি এম প্রবীর মিত্রের ফোন। যাদবপুরে শাসকদলের বিপক্ষ পার্টির প্রার্থী নাকি ডি এম-এর কাছে অভিযোগ করেছেন, বিমল যাদবপুর এ সি-র কয়েক হাজার জেনুইন ভোটারের নাম তালিকা থেকে ডিলিট করে দিয়েছেন।

৫

যাদবপুর থানার আই সি, মানে ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জ, প্রমথেশ বড়ুয়া মানুষটি এ থানায় বছর চারেক আছেন বলে এলাকা নখের ডগায়। তা বাদে কথায় কথায় পুরনো সিনেমার প্রসঙ্গে চলে যান। তাঁর বয়স বড়ুয়ার যুগে না হলেও সম্ভবত নামের কারণেই তাঁর ওইখানটিতে দুর্বলতা। তাঁর বাবা নাকি বড়ুয়া সাহেবের গাড়ি চালাতেন। সেই স্মৃতি তাঁর কথাবার্তার ফাঁকে-ফোকরে প্রায়ই উঠে আসে। যদিও তিনি প্রমথেশকে দেখেননি, তাঁর বয়স অনুযায়ী দেখার কথাও নয়, তবু কথার সূত্রে তিনি প্রায়ই তাঁর কথায় চলে যান। প্রমথেশের অপরিমিত মদ্যপান আর স্বল্পায়ু নিয়ে কথাবার্তা বলেন। তাঁকে ঘিরে সেই কবে প্রয়াত মানুষটির ছায়া যেন মিলিয়ে থাকে।

বিকেলের একটু পরেই প্রমথেশ আই সি এসে উপস্থিত হলেন। সহবত মেনে প্রথমে ঘরে না ঢুকে যথারীতি স্লিপ পাঠালেন। বিমল ডাকতে ভিতরে এসে লম্বা স্যালুট, তারপর বিমল বসতে বললে তিনি সবিনয়ে বসেন কোণের চেয়ারে। বিমল হেসে বলে, আরে, সামনে এগিয়ে এসে বসুন না। আই সি আরও বিনয়ে সামনের সারিতে এসে বসেন। বিমল বেল বাজিয়ে দুটো চা দিতে বলে।

আই সি বলেন, স্যার, আর পাঁচজনের মতো আপনি আমায় অফিসিয়ালি অ্যাড্রেস না করে শুধু প্রমথেশ বললেই আমার ভালো লাগবে।

বিমল এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসে।

প্রমথেশ বলেন, স্যার, যে-বিষয়ে ডেকেছেন সেটা আগে হোক।

— হ্যাঁ স্যার, ওই গৌতম দে— মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর। বনগাঁর ছেলে। এটা ওর সেকেন্ড পোস্টিং।

— হুঁ, আপনি আরও বলেছিলেন অফিসারটির বিয়ে-থা হয়নি। ভালো ছেলে স্যার, ভালো ছেলে।

— তাহলে মেয়েটি তার নামে কমপ্লেন করল কেন?

আই সি সামান্য থমকান। কী যেন ভাবেন। তারপর বলে ওঠেন, আসলে স্যার, ও যেদিন একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলে সেইদিনই এই সব উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে।

পিওন মহাদেব চা দিয়ে যায়। সামান্য সময় নীরবতা পড়ে কথায়।

বিমল এবার বলে, আপনি তো জানেন— ডিউটি করা অবস্থায় মদ্যপান—

— জানি স্যার, বিলক্ষণ জানি।

— এখন ব্যাপারটা যদি আপনার এস পি অব্দি যায় তাহলে তো ওর চাকরিতে টান পড়বে।

— তাই তো স্যার। আমারও তো খাতায় টান পড়বে।

— হ্যাঁ, যেহেতু আপনি ওর কন্ট্রোলিং অফিসার।

আই সি প্রমথেশ এবার খানিক চিন্তায় পড়েন। সেই অবস্থায় তিনি মাথা নেড়ে চলেন এদিক ওদিক।

বিমল বলে, তবে সেই মেয়েটি— মানে বিজিতা সেন— তার কথাবার্তা শুনেও আমার খুব একটা ভালো লাগেনি। একটু যেন বেশি এক্সট্রোভার্ট।

— ঠিক স্যার, ঠিক। আপনি লাখ কথার এক কথা বলেছেন।

— আমি অবিশ্যি তাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন করে সব জানাতে বলেছি। সে কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। আমি আমল দিইনি।

— ভালো করেছেন স্যার। এরা সব এক-একটি ফাঁদ।

বিমল এবার গম্ভীর হয়ে যায়। — ফাঁদে পা দেওয়ার বয়েস আর রুচি দুটোই আমার নেই আই সি সাহেব।

প্রমথেশ লম্বা করে জিভ কাটেন। তারপর বলে ওঠেন, আমি কি স্যার গৌতমকে আপনার কাছে একবার পাঠিয়ে দেব?

বিমল গম্ভীর মুখে বলে, এই ইলেকশনের ঝামেলায় আমার অত সময় নেই বড়বাবু। আপনি যা করার করুন।

প্রমথেশ কতক অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা স্যালুট হাঁকান। তারপর বলে ওঠেন, নিশ্চয়ই স্যার, দেখছি স্যার। দরকার পড়লে বড়সাহেবকে বলে ওর একটা গ্যারেজ পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করে দেব। বাইরের ল অ্যান্ড অর্ডার দেখব না ঘরের।

বহুদিন পর— আজ হালিশহরের বন্ধু সুবল ফোন করল। দুপুরবেলা। অফিস খানিক জুড়নো। টিফিন টাইমে যে যার উঠে গেছে। শুধু ইলেকশানের ঘরটা জম জম করছে। ওখানে বিরাম হয় না।

বিমল ফোন ধরে বলে, বল রে সুবল— কী খবর?

— খবর আবার কী! তোদের বাড়িটার ব্যাপারে কিছু ভাবলি?

— কী ভাবব?

— অত বড় বাড়িটা শেষকালে পোড়ো হয়ে যাবে। পূর্ণ ঠাকুর আর তার পাগল ছেলে তো ভুলেও বাড়িটা পরিষ্কার করে না। সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ি বলে কথা।

— কী করব বল। এমন একটা চাকরি করি। আর বিষয়-সম্পত্তি আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি তো মোহনপুরে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনেছি লোন নিয়ে।

— বাঃ, তোর দেখছি আপনি আর কোপনি। নিজেদের বাস্তু— সেটা ভুলে গেলি!

বিমল একটু চুপ করে যায়। তার মনে হয় গলার কাছে কিছু একটা চেপে ধরেছে। ওই বাড়ি শুধু নিছক বাস্তু নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। সেটা যে বস্তুত কি তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। দাদুর কেনা বাড়ি। ওখানে দাদুর মা— মানে বড়মা-দাদু-বাবা সবাই গত হয়েছেন। বাইরের ঘরে— তাঁরা যেখানটিতে মারা যান সেই সব জায়গায় পেরেক পোঁতা আছে। বিমল ওখানে গেলে বাবার ফেলে যাওয়া তক্তপোশেই শোয়।

সুবল বলে কি রে, লাইনটা কেটে গেল নাকি!

— না না, বল। আমি শুনছি।

সুবল কেমন বক্র হাসে। তারপর বলে, বুঝতে পেরেছি, সেন্টুতে ঘা দিয়েছি তো।

— না না, তা কেন হবে। ওই বাড়িটা আমার কাছে যে কী তা কি তোকেও বোঝাতে হবে!

সুবল হাসে, না না, এই বলছিলাম আর কী। তাহলে কবে আসবি বল। আর একটা খবর দিই। শুনছি তো ছোট ভগ্নিপতি বাড়িটা বিক্রি করার তাল করছে।

— তার মানে!

— হ্যাঁ, পাকা খবর। ও কেমন লোক সে তো তুই ভালোই জানিস। ঘরে বসে ব্যবসা করে আর ওবাড়ির বাগানের ফলপাকড় সব বিক্রি করে। পুকুরে ছিপ ফেলে বসে মাছ ধরে।

— কী করব বল তো। আমি কি বোনের সঙ্গে ঝগড়া করব!

— ঝগড়া কেন করবি। তোর ভাগ তুই নিবি না?

— ভাগ আবার কী। তাছাড়া, আমার আর এক বোন আছে শিলিগুড়িতে। ভাই দিল্লিতে চাকরি করে। ভাগ বললে সবারই তো আছে।

— তা সেটাই কর। তুই তো বড়, সবাইকে ডেকে নিয়ে বোঝা। তারপর তোর মা তো এখন তোর কাছে। মাকেও সব বল।

— মা কী করবে বল তো। বয়েস হয়েছে। সেই সঙ্গে হার্টের রুগি। পায়ে বাত—

— এ বললে তো হবে না। এটা সম্পত্তি। তোর মা-রও তো ভাগ আছে।

— এ পর্যন্ত কথা হওয়া মাত্র পাশের ইলেকশন ঘর থেকে প্রীতিবাবু আর পার্থবাবু এসে ঘরে ঢোকেন। তাঁদের হাতে ফাইল।

বিমল এবার সুবলকে বলে, এখন রাখছি। তোকে আমি রাতে ফোন করব।

প্রীতিবাবু লোকটির মাথা বোঝাই কোঁকড়াচুলে, খানিক হৃষ্টপুষ্ট। আর পার্থবাবু লম্বা, ফর্সা, দীর্ঘ নাসা— একেবারে আর্য পুরুষের গড়ন। বিমল হাত দেখিয়ে সামনে বসতে বলেই বলে, আপনারা টিফিন করেছেন?

প্রীতিবাবু সদা হাস্যমুখে বলে ওঠেন, হবে স্যার, হবে। আগে এটা দেখাই।

প্রীতিবাবু ফাইলটি খুলে সামনে এগিয়ে দেন। তারপর বলেন, স্যার, আজই তো বিরোধীপক্ষের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হবে। তবে আমরা যে নামটা শুনছি তাতে একটু চিন্তার বিষয় আছে।

বিমল ভ্রু কোঁচকায় এবং ফাইলে চোখ রাখে। পরপর নোটশীটের সঙ্গে কতগুলো অর্ডার পিন আপ করা। প্রথমটা হল ইলেক্টোরাল রোল বা ভোটার তালিকার বিষয়ে যে কোম্পানি কম্পিউটারে কাজ করছে তাদের কিছু নতুন লোক নেওয়ার অনুমতিপত্র আর পেমেন্টের বিষয়েও কিছু বিধি-নিয়ম। বিমল যখন কাগজপত্র দেখে আর সই করে তখন মনের নেপথ্য থেকে একটি বহু প্রাচীন গীত খেলা করে। গান বলে যায়—

ও চাঁদ, ফাঁকি দিয়ে ভোট নেবে ভেবেছ আবার?
চিনেছে তোমায় সব রেস্ট পেয়ার?
যেমন করেছি বোকামি, দেছ, আঙ্কেল সেলামি,
বেলতলাতে নেড়া যায় হে কবার?
দেশের ভালো হবে বলে, মিলিয়া সকলে,
আদর করে কল্পেন কমিশনার,
তার রাখলে খুব ধর্ম, কল্লে উচিত কর্ম,
এখন ফিকির আঁটছ গলায় ছুরি দিবার,
রইলে মনের মতো হয়ে, থাকতেম সব সয়ে,
রাখতে পাল্লে কই তেমন পসার?
কীসের অহংকারে মত্ত? ক'দিন এ ইন্দ্রত্ব?
তিন বছর তো বই রবে না আর পাওয়ার!
তোমার নয় হে পিতৃশ্রাদ্ধ, যে করবে যা বরাদ্দ,
কথা কবার কারো নাই অধিকার,
যখন সাধারণের টাকা, সকলকে চাই ডাকা
একলা হরির খুড়ো কে তুমি তায়?
তখন কাছা দিয়ে গলে, 'আমায় ভোট দাও' বলে
দ্বারস্থ হয়েছ দ্বারে সবার,
এখন বিচি গেছে উলে, সকল গেছ ভুলে,
দেখলে যেন চিনতে পার না আর।
করে গরিবকে পেষণ, শুদ্ধকে পোষণ,
সেই রক্ত উঠা ধনের এই কি ব্যাভার!
ওতে তিলকাঞ্চন হলে, অনায়াসে যা চলে,
করো বৃষোৎসর্গ! পেয়ে পরের ভাঁড়ার।

বিমল মনে মনে মুখ টিপে হাসে। আর পাঁচজনের মতো এই মন তার কাছেও রহস্যের বিষয়। হঠাৎ করে কোথা থেকে এই গানখানা মনে মনে ঘটে গেল হিসেবে কষবে কে?

পার্থবাবু বলে ওঠেন, স্যার বিল-এ কোনও গন্ডগোল আছে কি?

বিমল ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বলে, না তো।

— না, আমি ভাবলাম— আপনি হাসছেন তো।

বিমল এবার সত্যিই হেসে ফেলে, না না, আসলে অন্য একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তো— তাই।

প্রীতি ও পার্থ দু'জনেই একবার মুখ তাকাতাকি করে নেন। মুখের ভাবার্থ হল— আশ্চর্য মানুষ এই এস ডি ওটি। কখন কী করেন, ভাবেন, বোঝা মুশকিল।

রাত আটটার পর বিমল অফিস থেকে উঠবে এমন সময় তার মোবাইলে একটা ফোন এল। অপরিচিত নাম্বার।

— নমস্কার এস ডি ও সাহেব। আমি চন্দন সেন বলছি।

— হ্যাঁ বলুন।

— আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। তবে শুনেছি আপনি ভালো লোক। তবে কিনা আমিও ভালো লোক।

— কী বলতে চান বলুন।

— হুঁ, একটু দাপট না থাকলে কি এস ডি ও মানায়। আমি আসলে যাদবপুর কনস্টিটিউয়েন্সিতে আপনার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়াচ্ছি প্রধান বিরোধী দলের হয়ে।

— বেশ।

— আপনি বোধহয় জানেন আমি একজন রিটায়ার্ড আই এ এস অফিসার।

— হুঁ।

— তাহলেই বুঝবেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যাপারটা আমার কাছে জলভাত।

— হুঁ।

— তা আমি একদিন আপনার সঙ্গে একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই।

— বেশ তো, আসুন।

— না, অফিসে নয়, আপনার রেসিডেন্সে।

ক্রমশ

গল্প লেখার গল্প

বিরাট বিশ্ব। কাল অনন্ত। তার মাঝে মানুষজন দেখি। দেখি গাছপালা। নদী-মেঘ-পাহাড়-আলো। দেখতে দেখতে কোনও ব্যাপারকে মনে হয় বুঝি বা গতজন্মের। কী এক অজানা ইশারায় আমাকে সব মনে করিয়ে দিতে গিয়ে পারছে না। আবার কোনও জিনিস বা মনে হয়— খুবই আগামীর। তার জন্য আমি এখনও তৈরি হয়ে উঠতে পারিনি।

পুরনো আসবাবের খাঁজে ধুলো ঝাড়তে গিয়ে সোনার গুঁড়ো পাই। পাই রুপোর গুঁড়ো। রূপের গুঁড়ো। মানুষের যে কত রূপ। কী বিস্ময়কর এই মানুষ। অবিরাম অনুসন্ধানেও এ মানুষ ফুরোবার নয়। এ এক অনন্ত খনি।

ভালোবাসারও নানা চেহারা। একটা বয়সে যে মন নিয়ে কাউকে ভালোবেসেছি— বেশি বয়সে পৌঁছে দেখি সে মন আর নেই। হাঁটুর পুরনো ব্যথার মতো ভালোবাসার স্মৃতিটুকু শুধু পড়ে আছে। ভালোবাসা আর নেই।

তখন অনুসন্ধানে নামি। এমন কেন হল?

এক ডাক্তারবন্ধু বলল, তুমি যখন ভালোবাসায় পড়েছিলে— তখন যেসব কোষ দিয়ে তোমার শরীরটা তৈরি ছিল— সে সব কোষের বহুকাল হল মৃত্যু ঘটে গিয়েছে। সেখানে নতুন নতুন কোষ এসে তোমার দেহকে নিরন্তর নতুন রাখার চেষ্টা করে চলেছে।

তাই বলো! সেই তখনকার দেহটাই আর নেই। তার মানে শুধু মনে হয় না। আধার চাই। সেই দেহের ভালোবাসা এ দেহে থাকবে কোত্থেকে!

আধার বদলায়। কেননা, কোষ বদলায়। মনও তো বদলায়। বোধি এবং মেধা অবিরাম স্নায়বিক সংঘর্ষে নতুন নতুন দৃষ্টি পায়। মনের দেখবার প্রকৃতিই তাতে পাল্টে যায়। এই নব নব দেখার ভঙ্গি মনকে পুরনো ব্যথা থেকে আনন্দে এনে তোলে। আনন্দ থেকে ব্যথায়।

এইসব কথাই গল্পে লিখতে চেয়েছি। কতটা পেরেছি জানি না। কেননা, আমার কোনও লেখার পাণ্ডুলিপি ছাপতে দেওয়ার পর কোনওদিন ফিরে পড়ে দেখিনি। নতুন লেখায় চলে গিয়েছি।

তাই কেউ যখন আমার লেখার প্রশংসা করেন— বুঝতে পারি না।

কেউ যখন সমালোচনা করেন— বুঝতে পারি না।

কারণ, লেখাটা তো আর মনে নেই। আর কোন লেখার কথা বলছেন— বুঝতেই পারি না।

জীবন থেকে— আশপাশের মানুষের ভিতর থেকেই লেখার বীজ পাই। সে বীজ নানান অভিজ্ঞতা— কল্পনা— স্বপ্নের আলোয় অঙ্কুরিত হয়। গল্পের পা থাকে তাই জীবনের

> কত কথাই যে লেখা হয়নি। লিখতে পারিনি। চোখ খুলে যতটা দেখা যায়— তার চেয়ে বেশি দেখা যায় চোখ বুজে। আর যেটুকু দেখা যায়— দেখার জিনিস তার চেয়ে অনেক বড়। যা দেখি— তারই-বা কতটুকু তুলে ধরতে পারি। কোথাও দেখা— পথ হারায়। কোথাও ভাষা— পৌঁছতে পারে না।

মাটিতেই। অভিজ্ঞতা, কল্পনা, স্বপ্ন— এই ত্রি-শিরার কিশলয়ে ভাষালক্ষ্মীর বারিধারা নিয়ে আমি কোনওদিন ভাবিনি। মাথাই ঘামাইনি।

কারণ ভাষা আমার কাছে মনের ভিতরকার অস্ফুট, অসম্পূর্ণ স্বগতোক্তির মতোই। যা কিনা মনে মনে আপনা আপনি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তাই আমি একটা একটা করে তুলে এনে কাগজে বসিয়ে দিই। আশ্চর্যবোধের পাশে সম্পূর্ণ বাক্য।

বছর পঁয়ত্রিশ আগে একদিন জ্বর গায়ে জীবনের প্রথম গল্পটি লিখে ফেলেছিলাম। অবাক হয়েছিলাম তখন— যখন দেখেছিলাম— চরিত্ররা নিজেরাই নিজেদের পথ ঠিক করে নিয়ে হাঁটাচলা করছে— কথা বলছে— কথা বলছে না।

এরপর তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ — নানারকম বয়স পেরিয়ে দেখছি— সামনেই ষাট। কিছুই যে করা হয়নি।

কিছুই তো থাকবে না। কিছুই তো করা হল না।

যে গল্প সতেরোবার কেটেছি— কপি করেছি— ভেবেছি— না জানি কী লিখলাম— সে গল্প ছাপা হতেই সবাই একযোগে মন্দ বলেছেন। আবার যে-গল্প খবরের কাগজের নিউজ ডিপার্টমেন্টে টেলিপ্রিন্টারের অবিরাম ক্ষুরধ্বনির মধ্যে— হাজারো লোকের জিজ্ঞাসার ভিতর— খবরের চাপের মাঝখানে পড়ে মরিয়া হয়ে লিখেছি— পাছে ভুলে যাই বলে— সে গল্প পাঠক ধন্য ধন্য করেছেন। সমালোচক তাতে খুঁজে পেয়েছেন মনীষা।

ছোটগল্প বাঙালির প্রায় কুটিরশিল্প। সবাই কিছু না কিছু ভালো গল্প লিখে গেছেন এই ভাষায়। আমি কী করেছি আমি জানি না।

পাঠক জানেন।

আমি জানি শুধু আমায় কী করতে হবে। ছিপ ফেলে পুকুরে ঠায় বসে আছি। মাথায় গামছা। আকাশে সূর্য। ছায়া নেই কোথাও। ফাৎনা ঠোকরালেই কাত করে ছিপে টান দেব। জলের নীচে বড়শি।

এইভাবে বসে বসে দিন যায়। মাস যায়। কদাচ বড় মাছ পাই। পেলেও স্বস্তি নেই। তাকে ঠিকমতো পরিবেশন করতে হবে। নিজেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রেখে। যদি-বা আমি গল্পে সামান্য উঁকি দিই— তবে তা হবে অতি নিচু পর্দায়। দীনহীনভাবে। গল্পের প্রয়োজনটুকুই সেখানে রাজকীয়। বাদবাকি সবকিছুই ম্যান অন দ্যা স্ট্রিট।

গল্প আবার অনেক সময় আমার কাছে

নিজের পায়ে হেঁটে চলে আসে। আমার শুধু তুলে নেওয়া। আমি তখন অনেকদূর দেখতে পাই। এক প্রৌঢ় গীতাচণ্ডী বেদ বেদান্ত পুরাণ উপনিষদ পড়ে ঈশ্বরে পাড়ি দিয়েছেন। আর এক অতি প্রৌঢ় ফুলের পরাগ, গাছের পাতার হিন্দোল চিনতে শিখেছেন সারা জীবন ধরে। তিনিও এই মহাপ্রকৃতির মূলে যাওয়ার যাত্রী। সেখানে যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন, তো ভালো। সেই ঈশ্বরই অজান্তে তার কাম্য। এই দুই প্রৌঢ়কে কাছাকাছি এনে একটি গল্প লিখেছিলাম। প্রথাসিদ্ধ পথে ঈশ্বর। অপ্রথানুগ পথে ঈশ্বর। দুই মানুষকে কাছাকাছি আনায় এক নতুন গল্প হয়ে গেল। সে গল্প এই গ্রন্থে রয়েছে। শুনতাম— বুড়ো হলে ছেলে দেখে। ছেলে না থাকলে টাকা দেখে। একজনের ছেলে ছিল। টাকা ছিল। বাড়ি ছিল। কেউ তাকে দেখল না। মেয়ে সব সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বোধ হারানো বৃদ্ধ বাবাকে অজানা মেল ট্রেনে তুলে দিল। ট্রেনটা বাঁশি দিয়ে ভারতবর্ষের ভিতর হারিয়ে গেল। এই তো জীবন। সব কিছুর সাক্ষী হয়ে থাকল একটি নির্বাক ডুমুর গাছ।

এরকম নানান গল্প নানান সময়ে কলমে এসেছে। সে-সব গল্প জীবনকে দেখার এক-একটা সময়কে ধরে রেখেছে। পরবর্তী মানুষ যদি কখনও পড়েন তো মনে করবেন— ওর সময়ে পৃথিবীটাকেও এইভাবে দেখতে পেয়েছে। এর বেশি আর কী আশা করতে পারি।

পৃথিবীতে এক এক সময় মনে হয়— কোনও ঘড়ি নেই, দিন নেই, নাম নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই। এ কোথায় এসে পড়লাম। আর কতদিন এখানে থাকতে হবে। যাওয়ার সময়টা কেমন হবে। কে জানে। আবার নিশুতি রাতে ঝমঝম বৃষ্টির ভিতর মশারিতে আর কেউ নেই। সন্তানরা বড় হয়ে চলে গিয়েছে। বৃষ্টির ধারায় পাশের পুকুরটাও মুছে গিয়েছে। পুরনো ক্যালেন্ডারে বাদুলে পোকা বসল থপ করে। বর্ষীয়সী স্ত্রী আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ফেরেননি। তখন বিছানায় শুকনো কাঁথা জড়িয়ে টের পাওয়ার চেষ্টা করি— বিশ-পঁচিশ বছর আগে সন্তানদের এ্যা করা ভিজে গন্ধ কাঁথায় আছে কিনা। ভাবতে ভাবতে সেই কাঁথা জড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। ভাবি আর যেন বেঁচে না উঠি। একদম মরে যাই।— এসব কথা তো লিখতে পারিনি।

আবার ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, ছেলে-মেয়েতে ভরা বারান্দা আনন্দে টল টল করছে। এক-একটা কথায় হৃদয়ের ভিতরকার মানুষকে ছুঁয়ে থাকার মানুষী সুখ তির তির করে বহে যায়। সবাই সবার ওমের ভিতর রয়েছি। পরদিন দুপুরে সেই বারান্দাই একটি ডেয়ো পিঁপড়ে আড়াআড়ি একা পার হচ্ছে। কী শূন্য। — একথা তো লিখতে পারিনি।

কত কথাই যে লেখা হয়নি। লিখতে পারিনি। চোখ খুলে যতটা দেখা যায়— তার চেয়ে বেশি দেখা যায় চোখ বুজে। আর যেটুকু দেখা যায়— দেখার জিনিস তার চেয়ে অনেক বড়। যা দেখি— তারই-বা কতটুকু তুলে ধরতে পারি। একজন লেখক সামাজিক রিপোর্টার হলেও শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরার একটা সীমা আছে। কোথাও দেখা— পথ হারায়। কোথাও ভাষা— পৌঁছতে পারে না।

এত অপটু, অশিক্ষিত লাগে নিজেকে। তারপর আছে গল্প হারিয়ে ফেলা। মানে গল্পের বীজ হারিয়ে ফেলা। একদিন একটা ডবল ডেকারে এসপ্ল্যানেড যাচ্ছি। ফাঁকা বাস। একটা মিনিবাস এসে কম্পিটিশন বাঁধাল। রেগে গিয়ে ডবল ডেকারের ড্রাইভার মিনিবাসটাকে ধাক্কা দিল। মিনিবাসটা চার চাকা শূন্যে তুলে বিড়লা তারা মণ্ডলের কাছে উল্টে গেল। ডবল ডেকার বেআইনিভাবে চলতে চলতে নিষিদ্ধ পার্ক স্ট্রিটে ঢুকল। রাস্তার লোক চেঁচাচ্ছে— ড্রাইভার পাগল হয়ে গিয়েছে। একটু স্পিড কমতেই আমি প্রাণ নিয়ে বাসটা থেকে টুক করে নেমে গেলাম। এ ঘটনা যতদূর জানি— একদিন মে-জুন মাসে বেলা বারোটা নাগাদ আমার জীবনে ঘটেছিল। বছরদশেক আগে। কাউকে বললে বিশ্বাস করে না। সবাই বলে— আপনি হয়তো স্বপ্নে দেখেছেন। আমি বলতে চাই— না, স্বপ্নে নয়— স্বচক্ষে বেলা বারোটার সময় দেখেছি। এখন মনে হয়— স্বপ্নে? হবেও-বা! পার্ক স্ট্রিটে ঢুকে পড়ে টালমাটাল ডবল ডেকারটা আরশোলা থ্যাঁতলানোর মতোই প্রায় ফট মতো শব্দ করে এক-একটা অ্যামবাসাডর ফিয়াট গাড়িকে থেঁতলে ছিবড়ে করে দিচ্ছিল। হয়তো স্বপ্নেই দেখেছি। ওল্টানো মিনিবাসের যাত্রীরা আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। এই স্বপ্ন ও জাগরণের দেখা— এ আমার প্রায়ই ঘটে। দুই দেখা গুলিয়ে গিয়ে এক আলো আঁধারির সত্য তৈরি হয়। নানান গল্পে এ জিনিসটি এসে গিয়েছে। আবার কোথাও-বা হারিয়ে ফেলেছি। স্মৃতি গলে বেরিয়ে গিয়েছে।

এইসব নিয়েই আমি এবং আমার লেখা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

একটি অগ্রন্থিত গল্প

ওয়াসিল ঘাট

উঠেছি চাঁদপাল ঘাটে। ভোর পাঁচটায়। ভাদ্রের ফিকে ভোররাত। লম্বায় পঁচিশ ফুট। চওড়ায় পাক্কা তেরো ফুট। আগাগোড়া লোহায় তৈরি ট্রলার। সামনে হোল্ড বলতে জনা ছয়েক লোক শুতে পারি ভিতরে। সেখানেই রান্না। সেখানেই সামান্য আড়ালে জল সরার জায়গা। তারপরই আগাগোড়া কাঠের পাটাতন। তার নীচে মাছ ধরা পড়লে রাখার জায়গা। বরফ। পিছন দিকে চল্লিশ ঘোড়ার আট সিলিন্ডার জনস্টন ইঞ্জিন। ডিজেল পুড়িয়ে ইঞ্জিন টানা একটা চাপা কু ধ্বনি দিয়ে ট্রলারকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ঢেউ থ্যাঁতলাতে থ্যাঁতলাতে। চলেছি গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে। ডানদিকে কলকাতাকে দেখছি। বাঁদিকে হাওড়া। এভাবে ভোরের আলোয় এই যমজ শহরকে কখনও দেখিনি। যাব মোহানা ছাড়িয়ে। বাহির সাগরে। সেখানকার মাছ ধরতে। সেখানে নাকি নানান মাছ। ট্রলারের লেজে নাইলনের জালের থলে মতন বিশ-তিরিশ হাত লম্বা তিন-চারটি ফাঁদ বেঁধে জলে ডুবিয়ে রাখা আছে। ভোরের আলোয় ছুটন্ত

ট্রলারের লেজে ডুবন্ত সেই সব ফাঁদ অনর্গল বুড়বুড়ি কেটে ফেনা তুলছে।

কাল রাতে এসে অশোকের ট্রলারে উঠেছি। অশোক— যাকে বলে টল, ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। আর-পাঁচজন বাঙালির চেয়ে লম্বা। কিছু অন্যরকম। সব কিছু খায়। সব ব্যাপারে অনন্ত আগ্রহ। বছর পাঁচেক আগেও গলফ বল বানিয়ে জাপানে রপ্তানি করত। তারও আগে সাইকেল ভ্যানে সবজি চাপিয়ে বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দিত সকালবেলা। সেজন্য ধাপায় একটা বড় প্লটে নটে শাক থেকে ঝিঙে— সবই চাষ করত।

অশোক বলতেই এক কথায় রাজি হয়ে গেছি। বলেছে— একবার গঙ্গাসাগর ছাড়িয়ে বড় সমুদ্রে পড়ি— দেখবি তোকে কত রকমের মাছ খাওয়াই।

সমুদ্র বলতে পুরী, কোনারক আর দীঘায় দেখেছি। আর দেখেছি সানফ্রানসিসকোয়। মহাসমুদ্র। ওপারে নাকি জাপান। জাপানে থাকতে দিনের বেলায় প্লেন টেক-অফ করেই মেঘ ফুঁড়ে ওপরে ওঠার আগে ফুলস্কেপ কাগজের মতো পেতে-রাখা সমুদ্র দেখেছি— প্লেনের জানলা দিয়ে। ভোরবেলায় আকাশে ভাদ্র শেষের ভারী গভীর মেঘ। জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে লঞ্চ। স্টিমারের দু'পাশে দু'টি গাধাবোট। তাদের পাটাতনে লোকজন ঘুরছে এমন ভঙ্গিতে যেন ওরা ডাঙাতেই আছে। বাঁ-হাতে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং যেন-বা পিকচার পোস্টকার্ডে ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে। ডানদিকে হাওড়ার তেলকল ঘাট। ওখান থেকে কতবার হাওড়ায় এক বন্ধুর বাড়ি গেছি। একটা বড় গুদাম মতো টিনের শেডের গায়ে লেখা ইউনিয়ন জুট মিল। তারপরই বুলগানিন জেটি।

ট্রলার-সারেং বলল, দু'পারে এক সময় চটকল, কাপড় কল, লোহা কল, সব চালু ছিল সাহেব। যতদূর এগোতেন, দেখতেন— সব সময় লোকজন এপার-ওপার করছে। কত রকমের ব্যাপারি হাওড়া-কলকাতা করছে নৌকোয়— লঞ্চে। কত কিসমের সওদা নিয়ে। কত কলকারখানা। বাঁ-হাতে হুগলি চটকল তো ডানহাতে ডেলটা চটকল। বাঁয়ে কেশোরাম কটন মিল তো ডাইনে হনুমান কটন মিল।

অশোক রোদ চড়তেই হোল্ড থেকে বেরিয়ে এসে ট্রলারের দুই মেট খালাসি নিয়ে ওলন জলে ফেলে দিয়ে তুলছে আর জল হাতে নিয়ে দেখছে। জল মোটা? না, পাতলা? মাছ ধরার দুই মেট খালাসি ট্রলারের মাঝখানটায় বসানো ডেরেকের কাঁটার দিকে তাকিয়ে। ফাঁদে মাছ পড়লে কাঁটা ঝাঁকুনি খেয়ে নেমে যাবে। শূন্যের ঘরে। ওখানে নামলে ফাঁদ ওপরে তুলতে হবে চাকা ঘুরিয়ে।

সারেংকে বললাম, বেলালভাই, এ-রাস্তায়

> জাহাজের ফেলে-যাওয়া ভাঙা ঢেউ ট্রলারকে বড় দোলায়। কেমন যেন অপমান লাগে। এখন পিছনের লরেন্স মিল, উলুবেড়িয়া বাজার, নুরপুর ছাড়িয়ে পোর্ট টাওয়ার— সব কিছুই মনে হল— যেন-বা গতজন্মের। এখন আর ওদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক, রিস্তেদারি বা তাল্লুক নেই।

তুমি কতদিন যাতায়াত করছ?

বেলালভাই তার সাদা দাড়ি বাঁ-হাতে আদর করতে করতে বলল, তজাঘাট, ভূতঘাটে লঞ্চের নোঙর তুলে যখন কাছি খুলতাম— তখন আমার বিশও হয়নি। তারপর এই চল্লিশ সন— কখনও লঞ্চ, কখনও ট্রলার— আবার কখনও গাধাবোটেও আছি। অশোকবাবু আমায় এবার লঞ্চ থেকে তুলে আনলেন। আমাদের ট্রলারের ডুবন্ত জালের ফাঁদের ওপরেই জলের ফেনা। তার হাতখানেক ওপর দিয়ে মেছো বক সব সময় ভাসছে। ডানা মেলে। দম ফুরোলে ট্রলারের হোল্ডের ছাদে গিয়ে বসছে। নুনের জাহাজ একটার পর একটা মাঝদরিয়ায় নোঙর করে দাঁড়িয়ে। খানিক দূর অন্তর অন্তর।

গঙ্গার বুকটি গেরুয়া-পানা। কোথায় পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। সেখানকার পাহাড়-গলানো পলি নিয়ে আসায় জলের এই রঙ। দু'ধারের চটকল, কাপড়কল, জাহাজ তৈরির কারখানা দেখতে দেখতে বুঝতেই পারি— কোম্পানির শাসন উঠে গিয়ে মহারাণির শাসন যেই না পাকা হয়ে উঠতে লাগল— রেল এল, বিদ্যুৎ এল— আর অমনি এইসব কলকারখানা বসতে লাগল। সেও তা প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। এখন অনেক কলকারখানাই বন্ধ— পরিত্যক্ত— সিমেন্ট-বাঁধানো চাতালে বটগাছ গজিয়ে বেলা ন'টাতেই চার দিকে ছায়া ফেলেছে। বাটা, কালাদুনিয়া মিল, বারুদগড়ের চরে চায়ের চটি দেখতে দেখতে আমরা নুরপুরে এসে গেলাম।

নদী এখানে মোহানায় এসে পড়ায় রীতিমতো চওড়া। তীর-ঘেঁষা ডিঙি। একটা বিদেশি জাহাজ— কাদের পতাকা উড়ছে পতপত করে— বুঝলাম না— তাকে পথ দেখিয়ে কলকাতার দিকে নিয়ে চলেছে বন্দরের পাইলট লঞ্চ। ইলিশমারি নৌকোগুলো— তা সাত-আটখানা হবে— বেশ লম্বা জাল গোটাতে গোটাতে প্রায় এক জায়গায় ভাসছে। আমাদের ট্রলার দেখে একদম কাছের নৌকোর মাছ-মারারা রীতিমতো ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

বেলালভাই বলল, দামোদর এসে পড়ল। দেখুন দেখুন, জল এখানে কালো মতো। দু'ধারের গাছপালা চিরে কখন ডানহাতে দামোদর এসে পড়েছে গঙ্গায়। নদী কত নিঃশব্দে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এসে পড়ে। এটা তো একটা ইতিহাস। কতকাল আগে এসে পড়েছে। কেউ জানে না। পিছনে ফেলে এসেছি লরেন্স মিল, গগলবাই মিল। ডান হাতে। বাঁ-হাতে ফেলে এসেছি— আছিপুর ফলতার চর।

এখন মোহানায় নদীর জল চলকে উঠে ট্রলারের পাটাতন ভিজিয়ে দিল। হঠাৎ অশোক বলল, বড় দরিয়ায় পড়তে এখন বেগ পেতে হবে।

কেন? কেন?

এ-কথায় অশোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। সমুদ্র কি চাট্টিখানি কথা! ঢেউ-খেলানো ডাঙা দাবড়াতে দেখেছিস ঘোড়াকে?

সিনেমায় দেখেছি। কখনও ঘোড়াটা পুরো দেখা যায়। আবার ডাঙার দুই ঢেউয়ের মাঝে পড়লে আমাদের চোখ থেকে ঘোড়াটা হারিয়ে যায়। বেন হুর— কুয়ো ভেডিসে— এই তো! ঠিক বুঝেছিস। আমাদের ট্রলারকেও অমনি ঘোড়া হয়ে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙতে হবে।

হঠাৎ দেখি ডান দিকের দিগন্তের কপাট কে যেন খুলে দিয়েছে। অশোক বলল, রূপনারান—

কোনও শব্দ নেই। গম্ভীর হয়ে রূপনারানের জল অনেকটা জুড়ে গঙ্গায় মিশে যাচ্ছে।

শুধু আট-দশখানি মাছ-মারা নৌকো দূরে সরে সরে রূপনারানের গঙ্গায় পড়ার মুখটায় কাঠি-লাঠি ভাসানো বড় ঘেরের জাল গোটাচ্ছে— দল বেঁধে। বেলালভাই বলল, জলের তোড়ের উল্টোমুখো যায় তো ইলিশ— তাতে সোয়াদ বাড়ে— চকচকে গা হয়— সেই মাছ তুলতে জেটি বেঁধে জাল ফেলা। অশোক বলল, নদীরা নিজেদের ভিতর জল চালাচালি করে। গঙ্গা রূপনারানে পাঠায়। আর রূপনারান তো গঙ্গায় নেমে আসেই। আসছেই। বেলা দশটার আগেই ডানহাতে গেঁওখালি বাজার- তার ভিড়- লোকজন ছবি হয়ে ভেসে উঠতে উঠতেই কখন যে বাঁ-হাতে

ডায়মন্ডহারবারের বাড়িঘর, গাছপালার মাথা উঁকি দিয়েই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে তা খেয়াল করিনি। ট্রলার যেন গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে জল ভাঙতে শুরু করেছে। দু'দু'বার আমার জুতো, হাঁটু ভিজিয়ে দিয়ে ডানহাতের ঢেউ পাটাতন ভাসিয়ে বাঁয়ে ফের জলে গিয়েই পড়ল।

এত বড় জলের সামনে বাতাস ঠান্ডা হওয়ার কথা। কিন্তু তেমন তো ঠান্ডা নয়। অথচ সামনেই সমুদ্র। দূরে আরও দু'তিনখানা ট্রলার। সেগুলোও এগিয়ে চলেছে। আমরাও যাচ্ছি। এক সময় ডায়মন্ডহারবার আমাদের পিছনে ফিকে হয়ে ফুরিয়ে গেল। আবার একখানা জাহাজ আসছে। বেলালভাই ট্রলারকে কান্নিক খাইয়ে বাঁ-হাতে সরিয়ে নিতে লাগল। জাহাজের ফেলে-যাওয়া ভাঙা ঢেউ ট্রলারকে বড় দোলায়। কেমন যেন অপমান লাগে। এখন পিছনের লরেন্স মিল, উলুবেড়িয়া বাজার, নুরপুর ছাড়িয়ে পোর্ট টাওয়ার— সব কিছুই মনে হল— যেন-বা গতজন্মের। এখন আর ওদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক, রিস্তেদারি বা তাল্লুক নেই।

চার দিক কেমন নির্জন হয়ে যাচ্ছে। দু'ধারের ডাঙা বেশ দূরে। এখন এখানে শুধু জল আর আকাশ। তাদের মাঝখানে মোটে আমরা ক'জন। আর আমাদের এই ট্রলার। দুই পারে গাছ অনেক। মাঝে মাঝে ছনে ছাওয়া মাটির ঘরবাড়ি, টিনের ঘর। গাছ-গাছালির স্তূপ। সবুজ পরিষ্কার রোদে ঝকঝক করছে। কিন্তু কোনও গাছকে আলাদা করে চেনা যায় না। আমরা যে অনেক দূরে ভাসছি।

এবার বড় ফোঁটায় এক পশলা বৃষ্টি ছুটে এল। এখানে দৃষ্টি কোনও বাধা পায় না। পরিষ্কার দেখি— সামান্য কিছুটা জায়গা নিয়ে এক চৌকো বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমেই আমাদের দিকে ছুটে এসে বাঁ-হাতে নুরপুরের দিকে চলে গেল। আমাদের একদম ভিজিয়ে দিয়ে। রক্ষে এই যে চড়া রোদ আর খ্যাপা বাতাস দিব্যি ভিজে জামা-প্যান্ট শুকিয়ে দেয়— আধঘণ্টা, চল্লিশ মিনিটে। আজই খানিক আগে একটা ভালো বৃষ্টির চেহারা আগাগোড়া দেখতে পেলাম। বৃষ্টি লম্বায় আকাশ-সমান। চওড়ায় একটি মোহানার প্রায় সিকিভাগ জুড়ে থাকে। তার শরীরটা ফোঁটায় ফোঁটায় ভরা থাকে। ওই দশায় সে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে যায়। এবার ডাইনে কুকরাহাটি পড়ল। দূরে কুকরাহাটি বাজার জুড়ে গো-গাড়ির উঁচু-করা লেজ, মানুষের মাথা— মানুষের হাতে হাতে লম্বাটে লাউ ঝুলছে— তাও দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ নয়ন জুড়ে একদম সামনে গাছপালা— লতাপাতা, ছনে ছাওয়া মেটে ঘরবাড়ি। চাঁদমালার মতো দড়িতে মাছ গেঁথে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বাতাসে তার গন্ধ। বেলালভাই বলল, রাঙ্গাফুলা চর। চোখের সামনে সমুদ্র আড়াল করে দাঁড়ানো।

বৃষ্টি লম্বায় আকাশ-সমান। চওড়ায় একটি মোহানার প্রায় সিকিভাগ জুড়ে থাকে। তার শরীরটা ফোঁটায় ফোঁটায় ভরা থাকে। ওই দশায় সে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে যায়।

ভালো করে তাকালাম। হয়তো মোটে তিন-চার হাজার বছর হল চর জেগেছে। মাটি জল ঘেঁষে এখনও শক্ত হয়নি। জল সব সময় থাবা মেরে রাঙাফুলার গা কেটে কেটে খাচ্ছে। তীরের তৃণ, গেঁয়ো গাছ শেকড় নামিয়ে পায়ের মাটি মুঠো করে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অশোক হেসে বলল, আরে! এর ভিতর ওয়াসিল ঘাট এসে গেল।

ওয়াসিল? কথাটা যেন হিসেবের ব্যাপারে শুনেছি। জমা ওয়াসিল। ডাইনে এই ওয়াসিল ঘাট। তেলের বড় পিপে ভাসিয়ে তাতে গজাল মেরে বসানো সারি সারি তক্তা। কয়েকটা গাছ। একটি গাছের ছায়ায় টিনের ঘর। পান-বিড়ির দোকান। টিনের দেওয়ালে সাইকেল হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। ওয়াসিল?

কথাটা কেমন জ্বরের মতোই আস্তে আস্তে আমার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এত বড় মোহানার কাছে ওই একরত্তি একটা ঘাট কিসের অ্যাতো হিসেব নেয়? কোটি কোটি ঢেউ যে ভাঙছে— তাদের কি এই বলে বারণ করছে — ঢেউ তুমি ভেঙো না।

আমার হিসেবের গোলমাল হয়ে যাবে। বৃষ্টি তুমি পোড়ো না। এই পৃথিবী অ্যাতো বিরাট। সব হিসেব রাখা যায় না। তার ভিতর তোমার কোটি কোটি ফোঁটার হিসেব কোথায় রাখব? আমার এতটুকু ঘাট।

'গল্প লেখার গল্প' শীর্ষক রচনাটি প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রকাশিত 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' গ্রন্থে লেখকের নিজের লেখা ভূমিকা। গ্রন্থটির প্রকাশকাল বইমেলা জানুয়ারি ১৯৮৯। বহু বছর বইটি আর বইবাজারে নেই।

'ওয়াসিল ঘাট' গল্পটির প্রকাশ আজকাল পত্রিকার 'রবিবাসর'-এ, ৭ নভেম্বর ১৯৯৩ তারিখে।

সৌজন্য: সমীর চট্টোপাধ্যায়

স্বর্ণাক্ষরে পত্রিকা
নারীযুগ
ভারতীয় ভাষায় প্রথম মহিলাদের দৈনিক সংবাদপত্র
কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ভ্রমণ
বাঙালির ঘরের পত্রিকা, বাইরে যাবার
কালের কষ্টিপাথর
মাসিক সাহিত্য পত্রিকা
ছেলেবেলা
ছোটদের পরমাশ্চর্য মাসিক পত্রিকা
****
কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০
****
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
গল্প ও কবিতা সংকলন
নিমফুলের মধু ₹৬০
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০
আমাদের সব বই ও পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যায়:
www.swarnakshar.in
স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

বই-ঠক

বাংলা সাহিত্যের এক শাহজাদার মোগোলোপাখ্যান

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৩ সালের ২৫ মার্চ। ফ্যান্টাসি আর হিউমারের সমন্বয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা উপন্যাসে তিনি ছিলেন এক সম্পূর্ণ মৌলিক ধারার স্রষ্টা। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাটি, মানুষ, ইতিহাস। কিন্তু বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্করের বাস্তববাদী ধারা থেকে তিনি সরে গেছিলেন ওই ফ্যান্টাসি, হিউমার, ভাষা এবং আঙ্গিকের মৌলিকতার গুণেই। তাঁর এই পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'ঈশ্বরীতলার রূপকথা' (১৯৭৬), 'স্বর্গের আগের স্টেশন' (১৯৮০), 'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০)। শহর-জীবন নিয়ে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কীর্তি, 'হাওয়াগাড়ি' (১৯৮০), 'হিম পড়ে গেল' (১৯৮২), 'হননের আয়োজন' (১৯৯৪)। জীবনের শেষ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রচনা, 'শাহজাদা দারাশুকো' (১৯৯১) এবং 'আলো নেই' (২০০২)। শঙ্করলাল ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'আমরা যারা চিরদিন শ্যামলদাকে দেখেছি নিজেকে ভেঙে ভেঙে উপন্যাস গড়ছেন তারা ভাবলাম উনি দারাশুকোর মধ্যে কোথায় নিজেকে দেখলেন? শ্যামল মহম্মদ বিন তুঘলককে নিয়ে লিখলেন না কেন? আসলে সেটা ছিল শ্যামলদাকে নিয়ে আমাদের মজা করা। বহুকাল ধরেই আমরা জানি যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে এক অসাধারণ দার্শনিক

ফিরে পড়া বই

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

শাহজাদা দারাশুকো

সেঁধিয়ে আছেন। সেই দার্শনিক যে দারাশুকো, সেটা অবিশ্যি জানা ছিল না।'

অমর মিত্র লিখেছেন, 'শ্যামলবাবুর সমস্ত জীবন ধরে যত গল্প, যত উপন্যাস, খবরের রিপোর্ট পড়েছি, সমস্ত কিছুর ভিতরে বালকের বিস্ময় চোখে পড়েছে আমার।...প্রাচীন বিস্ময় যেন জমা ছিল তখনো, আমার তো মনে হয় জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত জীবনের বিস্ময়কে তিনি ফুরোতে দেননি। শ্যামলবাবুর গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা সময় থেকে সময়ান্তরে প্রবেশ করে অনায়াসে। তাদের ভৌগোলিক অবস্থানও যেন বদলে যেতে থাকে। তাঁর সাহিত্যের বাস্তবতাকে সরাসরি চিনে নিতে গেলে আমাদের পাঠের অভ্যাস বদল হয়ে যায়।...পূর্বনির্ধারিত কাহিনি বয়নে তাঁর বিশ্বাস তো ছিলই না, বরং কাহিনি তাঁকে কোন অথৈ জলে নিয়ে যেতে পারে, তা নিয়েও তাঁর কোনও ভাবনা ছিল না। বিস্ময়, কল্পনা, আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর এই মানবজীবনের প্রতি গভীর মায়া তাঁর রচনাকে করে তুলেছিল তাঁর সমকালের থেকে একেবারে আলাদা। জীবনের প্রতি যেমন মায়া ছিল তাঁর তেমনই ছিল তির্যক দৃষ্টিও।...কল্পনার এই সীমাহীনতা তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পাঠে বারবার প্রলুব্ধ করে। ...শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প, উপন্যাসে বাস্তবতা, বিভ্রম, কল্পনা পাশাপাশি থেকে মিলেমিশে গেছে। কোনটা বাস্তব কোনটা মায়া তা যেন ধরাই যায় না। আবার কল্পনা, মায়া, বিভ্রমই মূল বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। এক নিরুপায় প্রাণকে নানাভাবে দেখে নেওয়ার প্রবণতা তাঁর সব লেখায়।' তিনি সমসাময়িক অসভ্যতার প্রতিস্পর্ধী বয়ান হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন আবহমান সভ্যতার শর্তগুলিকে। সমসময়ের গোঁজামিলগুলোকে তাই বারবার আক্রমণ করেছেন, তাদের বেসামাল করে দিতে চেয়েছেন, আর তাকে অতিক্রম করে কীভাবে আবহমান সভ্যতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে তাকেই দেখাতে চেয়েছেন।

আর সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'এ জন্যেই পঞ্চাশ দশকের লেখক সমাবেশে আমার তাঁকে সবচেয়ে হিন্দু মনে হয়। তাঁর লেখায় কোনো ট্র্যাজেডি নেই। কোনো কমেডি নেই।...দেশবিভাগের বিপর্যয় তাঁকে স্পর্শ করে। উদ্বাস্তু, বেকার, বেশ্যা, মাতাল ও নাস্তিমান কাউকেই তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু বিস্ময় যেহেতু তাঁকে পরিত্যাগ করে যায়

না, তিনি ক্রোধে, শোকে, বিক্ষোভে চৌচিড় হয়ে যান না। যেহেতু হিন্দুদের মতোই তিনি ঘটনা থেকে বিমুক্ত ও বিশ্বাসী।...অসম্ভব বেদনার থেকে অমোঘ আমোদ সেখানে বড় হয়ে দেখা দেয়।' আসলে সমস্ত সফিসটিকেশন, স্ট্যাটাস, ঠাটবাট, শ্যামলের নিজেরই ভাষায়, এই 'ফক্কিকারির দুনিয়া'কে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে তিনি চেয়েছিলেন জীবনে ও রচনায় 'ডিক্লাসড' হতে। ডিক্লাসড হওয়াই ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা। কুবের থেকে দারাশুকো, সেই ধারাবাহিকতারই এক-একটি খুঁটি। এরা সবাই শ্যামলবাবুর মতোই 'ডিক্লাসড' হতে চেয়েছে, প্রবল স্পর্ধায় অস্বীকার করতে চেয়েছে নিজেদের অনুকূল পারিপার্শ্বিকতাকে, আর বেছে নিতে চেয়েছে আবিষ্কারকের ঝুঁকিপূর্ণ জীবন। নাগরিক জীবনের মেকি মোহ ও জটিলতা ত্যাগ করে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন জীবনের মৌল উপাদানগুলির দিকে। জীবন তাঁর রচনায় উৎসবের চেহারা নেয়। হাস্যকর ও রম্য যেসব ঘটনা ঘটে, তার মধ্য দিয়েই এই মুক্তি আসে। জীবনের কয়েকটি মৌল উপাদান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জীবনটাকেই তিনি অ্যাডভেঞ্চারের স্তরে নিয়ে গেছিলেন। ফলে শোক পর্যবসিত হয় কৌতুকে। অ্যাডভেঞ্চারটি যুগপৎ রম্য ও দুঃসাহসিক, কৌতুকপূর্ণ ও বিপজ্জনক হলেও, তার মধ্যে থেকে যায় বাস্তবতাকে না মেনে নেওয়ার এবং বিকল্প বাস্তবতা তৈরি করে নেওয়ার স্পর্ধা। আর এই স্পর্ধার যৌক্তিকতা এখানেই যে তা অকপটভাবে সভ্যতার মেকি, বিভ্রান্ত মুখোশটিকে টেনে ছিঁড়ে মানুষকে জীবনের মৌল শর্তগুলির সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিছক কাহিনিকার ছিলেন না, গল্প বলার চেয়েও তার মূল ঔৎসুক্য ছিল গল্পের মধ্য দিয়ে জীবন-সম্পর্কিত একটি বয়ান গড়ে তোলায়।

জাহাঙ্গীর

শ্যামলের নিজেরই ভাষায়, এই 'ফক্কিকারির দুনিয়া'কে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে তিনি চেয়েছিলেন জীবনে ও রচনায় 'ডিক্লাসড' হতে। ডিক্লাসড হওয়াই ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা। কুবের থেকে দারাশুকো, সেই ধারাবাহিকতারই এক-একটি খুঁটি।

তাই বারবার জীবনের নিষিদ্ধ ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্তগুলিকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন তিনি, আর পৌঁছতে চেয়েছেন এক অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে। আবিষ্কারের আনন্দে, কৌতুকে ও স্পর্ধায় মেতে থাকতে চেয়েছেন সারা জীবন। প্রথমদিকে যে অ্যাডভেঞ্চারগুলি সীমিত ছিল ব্যক্তিগত পরিসরে, পরে তাকেই তিনি সংশ্লিষ্ট করতে চেয়েছেন জনজীবনের বৃহত্তর পরিসরে। কুবের বা অনাথের অনুসন্ধানগুলি যেখানে ছিল ব্যক্তিগত জীবনকে তাৎপর্যময় করে তোলার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত, 'শাহজাদা দারাশুকো'য় সেখানে তিনি সমষ্টিগত জীবনের দার্শনিক তাৎপর্যের অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। কুবের বা অনাথের ব্যক্তিগত গোলকধাঁধা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তিনি নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেশ ও মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে জীবনের গোড়ায় পৌঁছনোর নিজের ধারাবাহিক, অকপট ও বিপজ্জনক অনুসন্ধানকে চূড়ান্ত সার্থকতা ও সিদ্ধিতে পৌঁছে দিতে পেরেছেন এই গ্রন্থে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাহজাদা দারাশুকো' শেষ হয়নি। গ্রন্থটি অসমাপ্ত রেখেই তিনি প্রয়াত হন। তাঁর জন্মদিন ছিল, ২৫ মার্চ। এ যেন তাঁর জীবনের 'দি ব্রাদার্স কারামাজভ', যেখানে সংকলিত হয়েছে তাঁর জীবনদর্শনের সারাৎসার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ বই এক দুর্লভ উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফসল। ভারতবর্ষকে আদ্যোপান্ত বোঝার এক অতিমানবিক প্রয়াস। ভিকতর উগোর 'লে মিজারেবল' পাঠ করে বোদল্যেরের যেমন মনে হয়েছিল, এ এক স্তম্ভিতকারী ডাক, এ বই পড়েও ঠিক তেমনই মনে হতে পারে। এর অতুলনীয় ব্যাপ্তি আর অতল গভীরতার যেন কোনও শেষ নেই। এই বই হাতে নিলে এক মহাসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি হয়। কিন্তু তবুও যেন মনে হয়, এত কিছুর পরও শ্যামল ঠিক শেষরক্ষা করতে পারেননি। সবকিছু গুছিয়ে উঠতে পারেননি। অগোছালোভাবেই একে রেখে আসতে হয়েছে তাঁকে। শাহজাদা দারাশুকোকে শেষপর্যন্ত তিনি কোথাও পৌঁছে দিতে পারেননি। তিনি নিজেও খেই হারিয়ে ফেলেছেন। দারাশুকোও টালমাটাল হয়ে গেছেন।

ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার খেসারত তাঁকে আগাগোড়া দিয়ে যেতে হয়েছে। একটু একটু করে তিনি খাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন আর নিজের অন্যমনস্কতায় নিজেই চমকে উঠে দেখেছেন, ফিরে আসার কোনও পথ নেই। আলোর দিকে যেতে গিয়ে তিনি ক্রমে আরও বেশি করে অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে গেছেন। আর সেই অন্ধকারই যেন শেষপর্যন্ত গ্রাস করে নিতে চেয়েছে তাঁকে। বহু মানুষের মধ্য থেকেও উপন্যাসের শেষে তিনি একদম একা হয়ে গিয়েছেন। আর সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যে হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নেই, কোনও মহত্ত্ব বা উচ্চতা নেই, জীবনের প্রতি এক বেপরোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই নিঃসঙ্গতাকে তাই কোনওভাবেই সম্মান করা যায় না। দারাশুকো এক অসম্মানজনক পরিস্থিতির মধ্যেই আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে শ্যামল আত্মসৃজনের এক আলোকিত পথ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আত্মধ্বংসের গোলা-বারুদ ছাড়া সেই পথে আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন পড়ে থাকেনি। এ যেন এক ভয়াবহ অপচয় আর সেই অপচয়ের সামনে দাঁড়িয়ে লেখক নিজেও যেন দিশা হারিয়ে ফেলেছেন!

অথচ ভারতবর্ষকে এমন সমগ্রতায়, এত যত্নে, এত নিবিড়ভাবে বাংলা উপন্যাসে আর কে-ই বা আঁকতে পেরেছেন! গোটা দেশ যেন হয়ে উঠেছে এক কার্নিভালের জগৎ আর বহুস্বরের সাংলাপিক কল্পনায় তা সরগরম হয়ে উঠেছে। আর জনারণ্যের এই বিপুল গোলকধাঁধায় দারাশুকো হয়ে উঠেছেন বার্তাবহনকারী মূল স্বর। দারাশুকোর মধ্য দিয়ে শ্যামল যেন এক আত্মপ্রতিকৃতি আঁকতে চেয়েছেন। তাঁর মধ্যে ঢেলে দিতে চেয়েছেন নিজের সমস্ত স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা আর ব্যর্থতাকে। যদিও ইতিহাসের দারাশুকোর সঙ্গে তাঁকে সবসময় খাপ খাওয়াতে পারেননি। তাই এক নিঃসঙ্গ সাধকের একাগ্রতা ও উদারতার মাঝে মাঝে অনেক সময়েই উঁকি দিয়ে গেছেন এক

নিষ্ঠুর, মেরুদণ্ডহীন, অবিবেচক, নির্বিবেক শাসক। এদের দু'জনের মধ্যে অসঙ্গতি থেকেই গেছে। তখন মনে হয়েছে, শ্যামল আসলে যেন দু'টি মানুষের কথা বলছেন। আর তাদের মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক কী, তা যেন নিজেও বুঝে উঠতে পারছেন না।

ক্ষমতা ও নারী, মূলত এই দু'টি বিষয়কেই শ্যামল ধরতে চেয়েছেন। তিনি যেন দেখাতে চেয়েছেন, ক্ষমতা ও নারী পরিবর্তনশীল, কিন্তু জীবন আবহমান ও অবিনশ্বর। তিনি যেমন সেই পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন, তেমনই এঁকেছেন আবহমানতারও ছবি। এমনকী যা কিছু পরিবর্তনশীল সেই ক্ষমতার ভিতরও চলে আবহমানতার অন্তর্ঘাত। ক্ষমতার বিপুল আবরণ সরিয়ে তিনি আসল মানুষগুলোকে বের করে আনতে চেয়েছেন। এমন সব মানুষকে, ক্ষমতার শক্ত খোলসের ভিতরে থেকেও যারা তাঁদের নিজস্ব জীবনকে বহন করে চলেন। সেই জীবনে তাঁরা পুরোপুরি মানবিক, সম্পর্ক ও অনুভূতির ব্যাপারে খাঁটি। শাহজাহানের তাই মনে হয়, 'সাধারণ মানুষের তুলনায় শাহীর তাগদ কত বেশি। অথচ সাধারণ মানুষ আর বাদশার বুকের কষ্ট, বা আনন্দ, সবই সমান।' এইভাবে বারবার ক্ষমতাকে 'ডিক্লাসড' করে দেখাতে চেয়েছেন শ্যামল। ধর্ম ও রাষ্ট্র, ক্ষমতার এই মূল দু'টি স্তম্ভকে ধরে তিনি এগোতে চেয়েছেন। আজীবন ক্ষমতার প্রশ্রয়ে থেকেও দারাশুকোও শাসক হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একদিকে ক্ষমতার শর্ত পালনে যেমন তিনি অক্ষম, তেমনই কখনও কখনও তিনি তার অপচয়ও করে থাকেন। কিন্তু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি এক স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ। তিনি চান, সর্বধর্মের সমন্বয়। একটা সময়, 'সমন্বয়'ই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষের বীজমন্ত্র হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন শ্যামল।

'শাহজাদা দারাশুকো'র প্রথম খণ্ডে ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছে পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব। কাহিনির শুরু ১৬১৫ সালের ফেব্রুয়ারি। ৪৬-৪৭ বছরের জাহাঙ্গীর তাঁর তৃতীয় পুত্র শাহজাদা খুর্রমকে মনে মনে গভীর স্নেহ করেন। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষকে আসলে চালান তাঁর বেগম, নুরজাহান। আফিমের নেশায় মশগুল জাহাঙ্গীর যেন তাঁর হাতের পুতুল। ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে নুরজাহান ও খুর্রম, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। আর এই কারণেই পিতা-পুত্র একে অপরের বিপক্ষে চলে যায়। ক্ষমতার অলিন্দে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক কি আদৌ কোনও অর্থ বহন করে, এই প্রশ্নও ওঠে, অন্ধ শাহজাদা খসরু যখন জাহাঙ্গীরের কাছে জানতে চান, 'আপনি বাদশা, না বাবা?' আর দারশুকোর মনে হয়, 'একজন ইনসান কেন তার আব্বা হুজুরের কাছে যেতে পারবে না। বাধা কোথায়?' শাহজাদা সুজা ভাবেন, 'তাগদের সঙ্গে যেখানে ধনদৌলতের মেলবন্ধন হয়, সেখানে কি ইনসানের স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো আগাগোড়া মুছে যায়?' কাহিনির শুরুতেই খুর্রম আগ্রার শাহি চাঘতাই পতাকার নীচে মেবারের শিশোদিয়া রাণা অমর সিংহকে মাথা ঝোঁকাতে বাধ্য করেন। অথচ এই খুর্রম নুরজাহানের ষড়যন্ত্রে কিছুদিনের মধ্যে ইমান হারিয়ে বাগী হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তার আগেই পথের কাঁটা সরাতে বড় ভাই খসরুকে নিজের হাতে হত্যা করে সে। তাঁর মনে হয়, 'খোয়াব যত বড় হয়, সে তার দাম ততোখানি আদায় করে নেয়। দুশ্চিন্তা, কষ্ট, বিপদ মেনে নিয়ে সে দাম শুধে যেতে হয়।'

> দারা অপদার্থ, তিনি ক্ষমতার চূড়ায় উঠেছেন ফাঁকি দিয়ে, তিনি কোনও লড়াই করেননি, তিনি একজন গরহাজির সুবেদার, কাফেরদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা, অথচ তাঁকেই ভবিষ্যৎ বাদশা হিসেবে গড়ে তুলতে চান আব্বা হুজুর।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডেও মুখ্য হয়ে উঠেছে পিতা ও সন্তানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ। দারাশুকোর প্রতি শাহজাহানের একপেশে মনোভাব ক্রমেই তাঁর কাছ থেকে অন্য সন্তানদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। কোনও লড়াইয়ে না গিয়েও দারার ভাগ্যে একের পর এক উন্নতি ঘটেছে। আওরঙ্গজেবের তাই মনে হয়, 'আমাকে আব্বা হুজুর ঠেলে ওপরে তুলে দেননি। তাগদ দেখিয়ে সব আদায় করতে হয়েছে। আমি যেটুকু পেয়েছি, সবটুকুই লড়াই করে পাওয়া।' আবার যে সন্তানের প্রতি বাদশার এত প্রশ্রয়, ধর্মের প্রশ্নে সেই দারশুকো তাঁর পিতার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। মোল্লারা বাদশাকে তাতিয়ে তাঁকে ইসলামের ইমাম মেহদী বা ইসলামের ত্রাতা ও ইসলামের পাহারাদার বানিয়ে দিয়েছেন। বাদশারও ফরমান জারি হয়েছে, নতুন কোনও মন্দির বানানো চলবে না। শুধু বারাণসীতেই ছিয়াত্তরটি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। গোটা দেশে হুহু করে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। নতুন নতুন মসজিদ গড়ে উঠেছে।

নিষ্ঠাবান ধার্মিক আওরঙ্গজেব হয়ে ওঠেন এই নতুন সময়ের নায়ক, 'জিন্দাপীর।' তাঁকে ক্রমাগত উসকানি দিয়ে যান রৌশনআরা, 'এখন খাঁটি মুসলমানদের তলোয়ার ধরতে হবে ছোটে ভাই। এখন থেকে দোস্তের পর দোস্ত খুঁজে বের করতে হবে। নসিব যখন সরল-সিধে নয়, তখন দম হারালে চলবে না।' দারা অপদার্থ, তিনি ক্ষমতার চূড়ায় উঠেছেন ফাঁকি দিয়ে, তিনি কোনও লড়াই করেননি, তিনি একজন গরহাজির সুবেদার, কাফেরদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা, অথচ তাঁকেই ভবিষ্যৎ বাদশা হিসেবে গড়ে তুলতে চান আব্বা হুজুর। এই ভাবনাই একত্র করে আওরঙ্গজেব, সুজা, মুরাদ ও রৌশনআরাকে। শাহজাহান, দারা ও জাহানারার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে নতুন এক জোট। আওরঙ্গজেবও বুঝতে পারেন, 'আমাকে এখন শুধু লেগে থাকতে হবে। মাথা ঠান্ডা করে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। আমাকে সেই বিপদের ভিতর থেকেই নসিব গড়ে নিতে হবে।' অন্যদিকে দারাকেও সতর্ক করেন, কবীন্দ্রাচার্য, 'ইসলামের আঙিনায় মুক্ত হাওয়া বইলে মোল্লাদের আসনপাট উড়ে যাবে। তারা কিন্তু আপনাকে রেয়াত করবে না। ভবিষ্যতে এ জন্য আপনাকে খেসারত দিতে হবে।'

কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ

হয়ে উঠেছে এই আখ্যানে। বাগি শাহজাদা খুর্রমকে না দেখলে জাহাঙ্গীরের যেমন কষ্ট হয়, তেমনই শাহজাহানের কষ্ট হয় দারাশুকোকে না দেখলে। নিজের প্রথম সন্তানকে হারিয়ে দারাশুকো ভেঙে পড়েন, তাঁর মনে হয়, 'এখানে আমার ছোট্ট মেয়েটা শুয়ে আছে, একা।' অথবা, 'অত ছোট্ট শরীর আমার মেয়েটার, একা একা কোন অজানা মাঠে শুয়ে আছে। আমি দেখবো, শুনবো, খাবো, বেড়াবো, আর আমার অতটুকু মেয়েটা অজানা মাঠের ভেতর, একা শুয়ে থাকবে?' আখ্যানকারের ভাষায়, 'অতটুকু এক ইনসানকে এমন বিশাল প্রান্তরে ফেলে যেতে তাঁর মন চাইছিল না। একবার মনে হলো, মাটি সরিয়ে ফের ওকে বুকে করে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যাবেন।'

'নারী'কে বাদ দিয়ে বোধহয় এই বিপুল উপন্যাসকে বোঝাই যাবে না। একেবারে শুরুতেই জাহাঙ্গীর তাই প্রশ্ন তোলেন, 'আওরত মানে কী জানেন? ইশক কাকে বলে বলুন তো?' তাঁর মনে হয়, 'আমি খোদার দোয়ায় আওরত জানি। জানি ভালোবাসা। তার পাশে বাদশাহী কী এমন? তোমরা বাদশাও নও, আশিকও নও। তোমরা তাহলে কী?' নারীর মধ্য দিয়েই এই উপন্যাসে একের পর এক চরিত্র ইশক খোঁজে। জাহাঙ্গীর একদিকে ভুলতে পারেন না আনারকলিকে, অন্যদিকে কুতুবউদ্দিন ও শের আফগানকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে ছিনিয়ে নিতে চান নুরজাহানকে। যখন দু'জনকে পাশাপাশি কবর দেওয়া হচ্ছে, সুখদোলায় চেপে নুরজাহান ততক্ষণে রওনা হয়ে গিয়েছেন আগ্রার দিকে, সেলিমের সঙ্গে মিলিত হবেন বলে। শাহজাদা খসরুর প্রশ্নের উত্তরে জাহাঙ্গীরের মনে হয়, 'খসরু, আমি তোমার বাবাও নই, বাদশাও নই, আমি আসলে সামান্য একজন আশিক।' ক্ষমতা-বদলের পর কিন্তু নুরজাহানের ভয়াবহ পরিণতি হয়। প্রথমে কয়েদ হন, তারপর আগ্রা থেকে নিয়ে এসে লাহোর দুর্গে নির্বাসন দেওয়া হয় তাঁকে। তারপর তাঁকে পাঠানো হয় কাশ্মীরের নিশাতবাগে। অসহ্য শীত এখানে হাড়ে গিয়ে পৌঁছয়। সেই প্রচণ্ড শীতে গোলাপের পরিচর্যায় কেটে যায় তাঁর বাকি জীবন। শাহজাহান সেখানে গেলে শীতের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিতান্ত বাঁদির মতো নুরজাহান তাঁর কাছে যান আরও লকড়ি পাঠানোর আর্জি নিয়ে।

জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নুরজাহানের সম্পর্কে যেমন প্রেম আছে, তেমনই রয়েছে ক্ষমতা ও রাজনীতি। কিন্তু খুর্রমের সঙ্গে আরজুমন্দ বানুর সম্পর্কে রয়েছে শুধুই প্রেম। তাই গোপন ভালোবাসায় খুর্রমের বুকে আরজুমন্দের মুখখানি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। বাগি খুর্রমের স্ত্রী

'তুমি মরদ, রাজহাঁসের মতো সাঁতরে চলেছো। আমার হৃদয়ই সেই দীঘি।' ছত্রশালের হাসির ভিতর একটি শিশুকে দেখতে পায় সে। লেখকের ভাষায়, 'সে-ও তো চায় ফলভারে নুয়ে পড়তে। না পড়তে পেরে নির্জনে সে শুকিয়ে যায়। মরদের তাতে কি বা যায় আসে! মরদ এই শুকিয়ে যাওয়ার নাম দিয়েছে, খাঁটি থাকা।'

আরজুমানের বর্ণনা পাওয়া যায় এইরকম, 'আওরতদের ভেতর তিনি স্ত্রীরত্ন। এই যে পথের কষ্ট, রোদ-বৃষ্টি-শীত, তাঁবুতে শোওয়া-বসা, সব মেনে নিয়েছেন বেগম। মুখের হাসিটি মোছেনি।' খুর্রমেরও মনে হয়, 'এই দুটি শান্ত চোখের নিচে তিনি প্রতি রাতে আশ্রয় চেয়েছেন।' আরজুমন্দের মৃত্যুর পর এই আখ্যানে প্রধান হয়ে ওঠে দুই নারী, জাহানারা

জাহানারা

ও রৌশনারা। জাহানারা মনে মনে ভালোবাসে, লড়াকু ও গাইয়ে রাজপুত সামন্ত বুন্দীরাজ ছত্রশালকে। কিন্তু মুঘল শাহজাদিদের বিয়ের নিয়ম নেই, তাদের চিরকুমারী হয়ে থাকার কথা। জাহানারা বোঝে, 'ভালোবাসায় একজন সরে গেলে অন্যজনের জীবনে বরবাদি এসে পড়ে। একজন মানুষের জন্য আর একজন উতলা হলে সেখানে ভালোবাসা আসে। ভালোবাসার জন্য যে কাঙাল হতে পারে, সে-ই তো সেরা।'

ছত্রশাল এই আখ্যানে কখনও সশরীরে উপস্থিত হন না। কিন্তু তাঁর জন্য জাহানারার অবিরাম প্রতীক্ষা প্রেমের রহস্যময়তাকেই যেন আরও নিবিড় করে তোলে। জাহানারার তখন মনে হয়, 'তুমি মরদ, রাজহাঁসের মতো সাঁতরে চলেছো। আমার হৃদয়ই সেই দীঘি।' ছত্রশালের হাসির ভিতর একটি শিশুকে দেখতে পায় সে। লেখকের ভাষায়, 'সে-ও তো চায় ফলভারে নুয়ে পড়তে। না পড়তে পেরে নির্জনে সে শুকিয়ে যায়। মরদের তাতে কি বা যায় আসে! মরদ এই শুকিয়ে যাওয়ার নাম দিয়েছে, খাঁটি থাকা।' আর ভিতরে পুড়তে পুড়তে সতিই একদিন জাহানারার গায়ে আগুন লাগে, তার হাত ও পিঠ পুড়ে যায়, ছত্রশাল কিন্তু একবারও তাকে দেখতে আসে না।

জাহানারার মধ্যে যদি থাকে প্রেমের নির্জন নিবিড়তা, রৌশনআরার মধ্যে তবে আছে শরীরের হিংস্র ক্ষুধা। কাউকেই ভালোবাসতে পারে না সে, তার চোখে, 'কোনও শান্তি নেই, নেই কোনও আহ্লাদ, কখনও সে সরল করে তাকায় না, দু'চোখ স্থির করে তাকায়', যৌনতাকে চরিতার্থ করতে গোলাম বিষ্ণুর ওপর অমানবিক অত্যাচার চালায় সে, নিজের নগ্নতা দিয়ে তাকে উত্তেজিত করে, তারপর তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকে রক্তাক্ত করে তোলে। বিষ্ণু কিন্তু মনে মনে ভালোবেসে ফেলে শাহজাদিকে, 'যতবারই কোড়া মারার জন্য রেগে ওঠা শাহজাদির হাত ওঠে, ততোবারই কোড়া ভুলে গিয়ে বিষণ শুধুই দেখতে পায় রৌশনআরার সুন্দর মুখ।' সবেরার স্বামী মুবারককে নির্লিপ্তভাবে হত্যা করে এসে অনায়াসে সেই নারীর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে শাহজাদা সুজা।

পাইক-বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে আহেদি মির সফি কৃষক-নেতা সনাতনের যুবতী স্ত্রী মীনাক্ষীর প্রেমে পড়ে। নিজের জীবন বিপন্ন করেও তাকে বাঁচায়। এর জন্য চড়া দাম দিতে হয় মির সফিকে। নিজের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আগ্রায় ফুল বিক্রি করে কোনওমতে সংসার নির্বাহ করতে থাকে দু'জনে। অন্যদিকে সনাতনও ভুলতে পারে না মীনাক্ষীকে। দুই

পুরুষের মধ্যে মীনাক্ষী শেষপর্যন্ত মির সফিকেই বেছে নেয়, তারপর অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাত্রা করে দু'জনে। এইভাবে এক হিন্দু নারী শেষপর্যন্ত এক মুসলিম পুরুষকে বেছে নেয়, এক হিন্দু পুরুষের পরিবর্তে। প্রেমের ক্ষেত্রে ধর্ম যে কোনও বিষয় নয়, তাই যেন বলতে চেয়েছেন লেখক। হেকিম সিরাজি পাগল হয়ে যান হায়দরাবাদ থেকে নিকা করে আনা কচি বেগম সুরাইয়ার জন্য। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ লাবঙ্গী নামে এক নারীর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খান। আর আরশি নামে এক কাঞ্চনবালাকে পাওয়ার জন্য আগ্রা থেকে সুদূর সুবে বাংলায় যাত্রা করেন ইংরেজ হেকিম গেব্রিয়েল ব্রাউটন।

এ এমন এক ভারতবর্ষ, যার একদিকে রয়েছে ক্ষমতা ও তাগদের দম্ভ, অন্যদিকে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ বিপন্ন, অসহায় ও রিক্ত। গোটা দেশে ক্ষমতাবাদের আমোদ-আহ্লাদের খরচ জোগাতে হয় চাষিকে। চরম অভাবে নিরন্ন চাষি পাইকেরা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। মির সফির মনে হয়, 'এই কাঁটাওয়ালা জঙ্গলে খালি পেটে মশাল জ্বেলে হাতি খেদানো? একটা হাতি পালালে এক হাজার রুপেয়া জুরমানা। যারা কিনা একটা দামড়িও দেখেনি। না দিতে পারলে কোড়া। লাথি, চাবুক, ফাঁসি। একটা সরকার মানে কি শুধু কয়েদ করা, গোলাম-বাঁদী বেচে মাগুি থেকে আসরফি তোলা? ইনসানের সঙ্গে গোরু-ছাগলের ব্যবহার। সেই আশরফি দিয়ে আমিরি। এই কি আল্লার দুনিয়া?' মির সফি আরও বুঝতে পারে, 'সারা মোগল সরকারই চলছে ঘাটতিতে। অথচ বাইরে রীতিমতো কেতাদুরস্ত। ভিতরটা ফাঁপা। শাহির খরচা ওঠে তো চাষির পসিনা থেকে। মজুরদের তাগদদার মেহনত থেকে। তা তারাই চাবুক খাচ্ছে, কয়েদ হচ্ছে, বেগার খাটছে, তো ফসল ফলবে কোত্থেকে?' নির্মমভাবে পাইক-বিদ্রোহ দমন করা হয়। মানুচ্চির চোখের সামনে বাগী চাষিদের কাটামুণ্ড দিয়ে মিনার গাঁথা হয়। একইরকম দৃশ্য দেখেন গেব্রিয়েল ব্রাউটন। শাহি ফৌজ যেসব রাস্তা দিয়ে যায়, তার দু'পাশের গ্রামগুলো পুরোপুরি লোপ পায়।

এইভাবে এক অন্তঃসারশূন্য শাসন-ব্যবস্থাকে যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক, যেখানে 'কয়েকজন লোক আয়েস করে বসে আছে গাড়িতে, আর সারা হিন্দুস্থান জোয়ালে কাঁধ দিয়ে সে গাড়ি টেনে ঠেলে খাড়াই রাস্তা ভাঙছে। কোথাও যেন সুন্দর কিছুর বেড়ে ওঠার জায়গা এটা নয়। ফুটে ওঠার কোনও পথ নেই।' এখানে কারাগারে পাশাপাশি গারদে সিংহ আর মানুষকে কয়েদ করে রাখা হয়। আর উভয় প্রাণীকেই স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য খাওয়ানো হয় বিষাক্ত পপির শরবত। বিনা

গত দেড়শো বছরে হিন্দুস্থানে এখনকার মতো হতদশা কখনও হয়নি। গাঁ কে গাঁ ফৌজদারের সেপাইরা লুঠ করছে। মগ বা হারমাদরা এসে আমাদের গরু-ছাগলের মতো তুলে নিয়ে যাবে, তা আটকাবার কেউ নেই। সারা সুবে বাংলার ভাগ্যে মগদোষ ঘটেছে। সেইসঙ্গে মুঘল দোষ ও ফিরিঙ্গি দোষ।

অপরাধে ও বিচারে বাদশার যাওয়ার রাস্তা থেকে সাধারণ মানুষকে তুলে নিয়ে যায় কোতোয়াল। ফাঁসি দেবার পর তাজা লাশ দিয়ে সুরুয়া তৈরি করে হাতিকে খাওয়ানো হয়। জানোয়ারের অভাবে ফৌজি ইনসান কাঁধে দড়ি বেঁধে খাড়াই ধরে ভারী গজনল ঠেলে তোলে। কোনও গরিব মুঘল হারেমের কোনও বাগে ধরা পড়লে তার দু'খানা পা কেটে নেওয়া হয়, তারপর তাকে নেকড়ের খাঁচায় খাবার হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়।

মানুষ নিয়ে চলে নানারকম হিংস্র ব্যবসা। শুধুমাত্র পেটের দায়ে বহু মানুষ ফৌজে এসে ভর্তি হয়। কাউকে বা শাহি সড়ক থেকে আচমকা পাকড়াও করে আনা হয়, বাড়িতে খবরটা পর্যন্ত দিয়ে আসার সুযোগ পায় না সে। বাদশা ফৌজের জন্য ঘোড়া আনেন, তার বদলে হিন্দুস্থানের মানুষ চালান যায়, গোলাম হতে। হীরার জন্য নদীখাতে প্রায় ন্যাংটো মেয়ে-পুরুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত অব্দি চার হাত পায়ে কাজ করে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মেয়েদের। খেতে-পরতে না দিতে পেরে বাবা-মা তাদের বেচে দেন। সম্পত্তির লোভে সতীদাহ প্রথার নামে চিতায় তুলে তাদের পুড়িয়ে মারা হয়। সুবে বঙ্গালে রয়েছে পর্তুগিজ দস্যুদের উপদ্রব। কুমারী মেয়ে পেলেই তারা তুলে নিয়ে যায়। জওয়ান দেবদাসীরা প্রায় নাঙ্গা হয়ে পুরোহিত-সেবা করে হিন্দু মন্দিরে। তুলসিদাস তাই বলেন, 'আওরতের কোনো জায়গাই নেই। কি হিন্দু, কি মুসলমান, দুই সমাজেই জেনানা যেন ফাটকে। যতদিন এ দশা না ঘুচবে, ততদিন দেশের মঙ্গল নেই।'

পাইক-বিদ্রোহ সনাতনের সংসারকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। স্ত্রী মীনাক্ষী, ছেলে বিষ্ণু আর মেয়ে লক্ষ্মী, যে যেদিকে পারে ছিটকে পড়ে। বিষ্ণু আর লক্ষ্মী— দু'জনকেই বেচে দেওয়া হয়, একজন হয় গোলাম, অন্যজন বাঁদি। বিষ্ণুকে দেখে জনৈক পাথরকাটাই-ওয়ালার মনে হয়, 'যমুনার দিককার এই ঠাণ্ডা বাতাসে, ছেঁড়া পিরান গায়ে ওই কচি গোলাম কেমন করে পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে দেবে, ওই কচি হাতে?' লক্ষ্মী হয়ে যায় লছমী, হেকিম সিরাজির কচি বেগম সুরাইয়ার লম্পট ভাই ওয়াসিমের পাল্লায় পড়ে সে গর্ভবতী হয়ে যায়। এক মুসলিম যুবকের সঙ্গে একটি হিন্দু মেয়ের এই অবৈধ সংসর্গেরই ফসল রানাদিল। শ্যামল একটি বাঙালি পরিবারকে যেমন কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন, তেমনই আগ্রা-দিল্লি-লাহোরের পাশাপাশি বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন বাংলাদেশে। তিনি লিখেছেন, 'এতো বড় হিন্দুস্থানের বেশিরভাগ জায়গাই খুব উর্বর। তার ভেতর সবচেয়ে উর্বর বাংলাদেশ। এমন উর্বর জায়গা দুনিয়ায় খুব অল্পই দেখা যায়।' অথচ সেই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে রামচন্দ্র ও রাঘবের সংলাপে, 'গত দেড়শো বছরে হিন্দুস্থানে এখনকার মতো হতদশা কখনও হয়নি। গাঁ কে গাঁ ফৌজদারের সেপাইরা লুঠ করছে। মগ বা হারমাদরা এসে আমাদের গরু-ছাগলের মতো তুলে নিয়ে যাবে, তা আটকাবার কেউ নেই। সারা সুবে বাংলার ভাগ্যে মগদোষ ঘটেছে। সেইসঙ্গে মুঘল দোষ ও ফিরিঙ্গি দোষ।'

তৎকালীন ভারতের সাংস্কৃতিক জগতের ছবিটিও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্যামল। নানা ধরনের উৎসব হয় গোটা দেশে। বিজয়া দশমী, রাখীবন্ধন, দীপালি উৎসব যেমন হয়, তেমনই হয় শবেবরাত, মিলাদ শরিফ, নওরোজ। কাশীতে প্লেগ হয়, আর সন্তকবি তুলসীদাস ভাবেন, 'হিন্দুস্থান এক আজব দেশ। এ দেশে কে সুলতান, কে বাদশা, সে মানুষ, না বাঁদর, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।' কবি আবদুর রহিম খানখানানের সঙ্গে তাঁর আলাপ জমে ওঠে। রহিমের মনে হয়, 'হিন্দুস্থানে গঙ্গার দুই তীরে যত কথকতা, যত গান, রামকথা, তার উৎস এই মানুষটি। এর দোহা, চৌপাঈ, মানুষের সুখদুঃখের জীবনে জড়িয়ে আছে। মহাকাব্যের মহামানুষ।' কথায় কথায় আসে আমির খসরুর কথা, হিন্দুস্থানের সাবেক মৃদঙ্গ ভেঙেই ডুগি তবলার জন্ম দেন তিনি। তানসেনের ছেলে বিলাসখান গান গান,

ঘুরেফিরে বেড়ান এই আখ্যানে। তাঁর ভাই সুরতসেনকেও কখনও দেখা যায়। বিলাসখানের ছেলে লাল খাঁও গেয়ে যান।

বাদশাহি শিল্পী দশনাথ ছবি আঁকেন, 'যে ছবির কোনও ধর্ম নেই।' তিনি প্রশ্ন করেন, 'খোদা কি হিন্দু? না মুসলমান? আশমান কি হিন্দু, না মুসলমান? ছবি ছবি। হিন্দুও না, মুসলমানও না।' 'দুনিয়ার সেরা তসবিরওয়ালা' আবুল হাসান ছবি আঁকেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ আবার বড় গাইয়েও! আছেন আকবরি দরবারের হিন্দি কবি নরহরি মহাপাত্রের নাতি কবি হরিনাথ। এছাড়া আছেন আরও দুই কবি, মুন্সি চন্দ্রভান ও কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী। দৌলত কাজি তাঁর শিষ্য সৈয়দ আলাওলকে বলেন,'সাধারণ মানুষের চোখে এই দুনিয়া তিনরকমের। যে জায়গায় অনেক গভীর গর্ত, সেখানে পানি ভরাট হয়ে দরিয়া হয়ে যায়। যে জায়গায় মানুষ ঘর বাঁধে, চাষ করে, বসতি বানায়, সে হল ডাঙা। আর যে জায়গা অনেক উঁচু হয়ে আসমানকে ছুঁতে চায়, তাই হল গিয়ে কবিতা।' তারপর প্রায় আর্তস্বরে যোগ করেন, 'মানুষ কি গোরু-ছাগল? তাহলে কার জন্য আমি গান বাঁধবো, কার জন্য লিখবো, কে শুনবে, কে পড়বে?'

বিচিত্র সব মানুষের সমাবেশ ঘটে এই উপন্যাসে। ব্যবসা-বাণিজ্য, কবিতা, কাপড়, ধর্ম, উপাসনা, গান, চিকিৎসা, যুদ্ধ, রাজনীতি, ফল, ফুল, খাদ্যদ্রব্য, ভাষা সূচিকর্ম, বাজার, (কারণ হিন্দুস্থানে বাজার মানেই আস্ত হিন্দুস্থান), হারেম-বিষয় হিসেবে কত কীই এসেছে! দারাশুকোর যার হাতে জন্ম হয়, তিনি হেকিম আবদুল হাজি সিরাজি। জ্যোতিষী রঘুনাথ কথায় কথায় খনার বচন আউড়ে থাকেন। সাদা পাগড়িওয়ালা নজুমীর সামনে মেলে দেন ইউনানি ছক। চৌধুরী গয়ানাথ শাহি ফৌজকে রসদ জোগান। আগ্রাওয়ালি রেহানার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বিলাসখানের। তাজমহল তৈরি হয় মির আবদুল করিমের নকশার ওপর ভিত্তি করে। স্থপতি তুর্কি ওস্তাদ ইশা খাঁ। সব কাজকেই তিনি মূল নকশার সঙ্গে মিলিয়ে দেন। এই আবদুল করিমের দফতরেই কর্মজীবন শুরু করেছিলেন মুনশি চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ। চন্দ্রভানের মতে, 'জ্ঞান সঞ্চয় করে রাখতে হয়। জীবনের দরকারে কাজে লাগাতে হয়। জ্ঞান অল্প হলেও তার ব্যবহার হলে সবচেয়ে ভালো। যদি অনেক

শাহাজাদা দারাশুকো কিন্তু বুঝতে পারেন না, জ্ঞান না প্রেম, কোনটা তাঁর সঠিক পথ। জ্ঞানের পথের শেষে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ঈশ্বর। আর প্রেমের পথে রয়েছে নারী, এই দুনিয়ার আর এক রহস্য।

জ্ঞান থাকে, অথচ তার ব্যবহার নেই, তাহলে তার কোনও দাম নেই। সেই জওয়ানরাই সাবাস, যারা তাদের জওয়ানি কাটায় ধীর স্থির হয়ে। যিনি বেশি নিস্পৃহ থাকবেন, তিনিই বেশি সুখী হবেন। সাদি পড়লেই একথা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।' পনেরো ক্রোশ রাস্তা এক রাতে হেঁটে আসেন বামন ভট্ট।

শাহাজাদা দারাশুকো

এই উপন্যাসে একের পর এক বিদেশি চরিত্র এসেছে। ঔপনিবেশিকতার প্রারম্ভিক সময়টিকেই যেন বুঝে নিতে চেয়েছেন লেখক। প্রথমেই দেখা যায়, ইংল্যান্ডের দূত টমাস রো'কে। জন কোম্পানির হয়ে বাদশাকে গাড়ি ভেট দিয়ে আগ্রার কাছাকাছি নীল চাষের সমস্ত অধিকার পেয়েছে সে। বসরার নসরত খাঁ'র সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে ওঠে টমাসের, যে নসরত আগ্রা দুর্গের সামানবুরুজ বানান। সিসিলি থেকে জাহাজে করে ভাগ্য ফেরাতে বেরিয়ে পড়ে মানুচ্চি হয়ে ওঠেন শাহি লশকরের তোপখানার মির আতশ। টমাস রো দেশে ফিরে গেলেও থেকে যান হেকিম গেব্রিয়েল ব্রাউটন। প্যারিস থেকে বাণিজ্য করতে আসেন ট্যাভারনিয়ার। ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। তাঁর মনে হয়, 'প্রাণ মানেই অভিযান। অভিযান ছাড়া মানুষ বাঁচে কী করে?' আবার কখনও তিনি ভাবেন, 'বিশাল মধ্য এশিয়া যেন কয়েকশো বছর ধরে একটু একটু করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে হিন্দুস্থানের শরীরের ভেতর মিশে গেছে।' সহমরণের দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর কলম থেমে যায়। ফাদার হাইনরিশ রথ মাঝে মাঝে দারাশুকোর ডাক পেয়ে আগ্রায় যান। বাদশাহি সিলমোহরের একদিকে একসময় লেখা থাকত, 'যে সোজা পথে চলে সে কখনও পথ হারায় না।' শাহাজাদা দারাশুকো কিন্তু বুঝতে পারেন না, জ্ঞান না প্রেম, কোনটা তাঁর সঠিক পথ। জ্ঞানের পথের শেষে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ঈশ্বর। আর প্রেমের পথে রয়েছে নারী, এই দুনিয়ার আর এক রহস্য। একসময় মির সফিকে মনসবদার মির্জা ইউসুফ বেগ বলেছিলেন, 'মুঘলশাহিতে প্রতিভা দেখাতে গিয়েছো তো বিপদে পড়বে। এখানে আগ বাড়িয়ে কাজ করতে যাওয়াও বিপদ। তাতে সবার চক্ষুশূল হয়ে পড়তে হয়।' দারাশুকোর জীবনে এই সতর্কবাণীই যেন সত্য হয়ে ওঠে। কারণ, 'তুমি কিছু হতে চাওয়া মানেই তো, আমি যা আছি, তা আর নাও থাকতে পারি। তাই! সবাইকে মুছে ফেলে শুধু একজনের জেগে ওঠা।' সব বিষয়েই অবিরাম জিজ্ঞাসা তাঁর। শৈশবেই দারা মিত্রণ মিরের সান্নিধ্যে আসে। সুলতানপুরীর কাছে সে পড়ে তৈমুরের জীবনী ও বিধান। তখন থেকেই জালালুদ্দিন রুমি তাঁর প্রিয় কবি। পাশাপাশি সে

পড়ে, ফেরদৌসি, সাদি, হাফিজ। ভগবদগীতা ও নল-দময়ন্তীর কাহিনি। দারার মনে হয়, 'আমরা যা দেখি, সেটাই দুনিয়া নয়। আমাদের মনের ভেতর যা ভেসে ওঠে, খোয়াবে যা দেখতে পাই, সেটাই আসল দুনিয়া। আসল পিপুল গাছ হলো দীঘির বুকে ছবি হয়ে ভেসে ওঠা গাছটা। আর দীঘির পাড়ে দাঁড়ানো গাছটা সেই ভেসে ওঠা গাছটার স্বপ্ন।'

দারার মা, শাহজাহানের বেগম আরজুমন্দ বানুর একসময় মনে হয়েছিল, 'যদি আম আতরাফ সাধারণ ইনসান হতে পারতাম, তো আমিও এই ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে মাড়ির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে পারতাম।' এই ভাবনাই যেন বীজ হয়ে ঢুকে যায় দারাশুকোর মধ্যে। তাঁর মনে হয়, 'তাগদের একটা রূপ আছে। কিন্তু আল্লাতালার দুনিয়া জোড়া রূপের পাশে তা যেন নিভু নিভু। মানুষের ইতিহাস তো মানুষের হৃদয়ের সৌরভ, ভালোবাসা, ঈশ্বরচিন্তার ইতিহাস।' তখন তিনি প্রশ্ন করেন, 'আমি কেন দেহাতের এক মামুলি ইনসান হয়ে পয়দা হলাম না খোদা?' দারার জীবনের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় কবিতা ও সাধুসঙ্গ। তিনি ভাবেন, 'বড় বড় শাহী মুছে যায় দুনিয়া থেকে। কিন্তু থেকে যায় একটি দিওয়ান। একটি রুবায়-ই। খসরু, রুমি, হাফেজ, আত্তার।...কবিতা সব বাস্তবের মূলে আছে। যেমন কিনা এই আগ্রা দুর্গের বিশাল কঠিন পাথরের বীজে রয়েছে স্বপ্নালু কল্পনার একটি কবিতা।' আর, 'যে কবিতা খোদাতালার দিকে নিয়ে যায় না, মোটেই ভাবায় না, তা আদপে কবিতাই নয়।'

মিঞা মির দারাশুকোকে শোনান, এক নির্জন, নিঃশব্দ দুনিয়ার নিজের আওয়াজ, যা শুনলে কারও ভিতরে জ্ঞানের আলো আসে। তিনি বোঝান, 'আল্লাতালার কাছে যাবার রাস্তা ভালোবাসার রাস্তা। করুণার রাস্তা।' দারাশুকোও শুনতে পান এক মধুর ঘণ্টার আওয়াজে তামাম দুনিয়া ভরে উঠেছে, তার মনে হয়, তারার ভারে এই বুঝি আসমান ভেঙে পড়ল। তাঁর মনে হয়, 'এই দেশের ইতিহাস তো এই আউলিয়াদেরই ইতিহাস। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে সারা হিন্দুস্থানে তিরিশ লক্ষের মতো ফকির-সাধু-দরবেশ সবসময় ঘুরে বেড়ায়।' ফরিদউদ্দিন আত্তারের লেখা আউলিয়াদের জীবনী তিনি পড়েন। তিনি ভাবেন, 'আসলে বোধি, মেধা, এসবই মানুষকে শেষ অব্দি কুরে কুরে খায়। এই দুনিয়ায় আমার চাই নির্জনে বসার সামান্য একটু জায়গা। মন রাখা চাই সাদা আসমানের মতোই। নইলে সেখানে সেই ভালোবাসার খোদাতালার ছায়া তো পড়বে না। সুখে যেন মোহ না হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে হৃদয়কে বানাতে হবে বাগান।' মুল্লা শা দারাকে বলেন, 'সত্যকে দেখার চেষ্টা করো। উচ্ছ্বাস থেকে সরে এসো। তোমার ভেতরকার আমি আমি ভাবটা যতই মুছে যাবে, ততোই তাঁর আলো তোমার ভেতরে ফুটে উঠবে দারা। যাদের ঈশ্বর কৃপা করেননি, ভালোভাবেই বুঝতে পারবে, তারা কাছাকাছি এলেও তোমায় জাগিয়ে তুলতে পারছে না। হৃদয়ের আসল মন্দিরকে অবহেলা করে মূর্খরাই বাইরের মন্দিরের গুণগান করে।' চারশো এগারোজন সুফি সাধক-সাধিকার জীবনী লেখা শেষ করেন দারা।

দারার জীবনের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় কবিতা ও সাধুসঙ্গ। তিনি ভাবেন, 'বড় বড় শাহী মুছে যায় দুনিয়া থেকে। কিন্তু থেকে যায় একটি দিওয়ান। একটি রুবায়-ই। খসরু, রুমি, হাফেজ, আত্তার। ...কবিতা সব বাস্তবের মূলে আছে। যেমন কিনা এই আগ্রা দুর্গের বিশাল কঠিন পাথরের বীজে রয়েছে স্বপ্নালু কল্পনার একটি কবিতা।

তাঁর মনে হয়, 'ডাঙা জায়গায় মনে হয় সেখানে সবকিছুর ভেতর মানুষই বুঝি সবচেয়ে বড়, তাগদদার। আর যতই দরিয়া, পাহাড়, আসমানের কাছাকাছি যাওয়া যায়, ততোই মনে হয়, মানুষই বুঝি ওসবের ভেতর সবচেয়ে নিরুপায়। আল্লাতালার এই বরফ, পাহাড়, নদী, রোদ, শীত, মানুষের চেয়ে কত কত বেশি তাগদ ধরে।' আর মুল্লা শা তাঁকে বোঝান, 'আসমানে উঠলে তার যেমন কোনও দিক নেই, সবটাই আসমান, তেমনই ঈশ্বরে যাবারও অসংখ্য পথ আছে, সব দিকেই পথ।' দারা একের পর এক গ্রন্থ পাঠ করেন। ভগবদগীতা ছাড়াও পড়েন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ ও প্রবোধচন্দ্রোদয়। মুনশি বনমালী দাসকে দিয়ে তিনি শ্রীমদ ভগবদগীতা ফারসিতে অনুবাদ করান। ফারসি অনুবাদে মহাভারত পড়েন। নানা ধর্মের একশো সাতজন সন্ন্যাসীর বাণী তিনি এক জায়গায় করতে চান। আর বুঝতে পারেন, যারা তাঁকে 'অবিশ্বাসী, অধার্মিক বলে অপবাদ দেয়, ঈশ্বর নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, ওদের লক্ষ্য, ঈশ্বরকে ঘিরে যে তাগদের ফোয়ারা, সেটি কবজা করা।' নিজের হাতের আঙটিতে দেবনাগরিতে দারা খোদাই করেন, 'পরভু।'

দারাশুকোর জীবনের দুই নারী, নাদিরা বেগম ও রানাদিল, সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের। দু'জনেরই অস্থির, অনিশ্চিত, অশান্ত শৈশব-কৈশোর কেটেছে। নাদিরার বন্ধনেই স্বস্তি, রানাদিলের স্বাধীনতায়, বন্ধন তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চায়। দারার মনে হয়, 'আমি দু'জনকেই ভালোবেসে বসে আছি। ভাগ করে কি ভালোবাসা যায়? আমি কি একইসঙ্গে সমানভাবে ভালোবাসতে পারি নাদিরাকে, রানাদিলকে? আমার যে দু'জনকেই আঁকড়ে থাকতে ইচ্ছা করে। দু'জনের কাউকে ছেড়েই আমি থাকতে পারি না।' এছাড়া রয়েছে শ্বেতলানা, দারার জীবনের তৃতীয় নারী, মুঘল হারেমে গিয়ে যার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন দারা। পরে এরই নাম হয় উদিপুরী। নাদিরা শান্ত স্বভাবের, সবসময়ই প্রিয় পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেই আছেন। লেখকের ভাষায়, 'কাছে আসার ডাক পেলেই বর্তে যাওয়া একজন মানুষ, যে কিনা কোনও কিছুই জোর দিয়ে বলে না।' আর দারার মনে হয়, 'আমাকে হারাবার ভয় ওর সবচেয়ে বড় ভয়। নাদিরা তো আমার কাছে কিছুই চায় না। চায় শুধু আমাকে। নিতান্ত দীনভাবে।' কোনও নারীকেই ব্যথা দিতে চান না দারাশুকো। তাঁর মনে হয়, 'ব্যথা দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি দিতে চাই আনন্দ। ভালোবাসার ভেতর মমতা লুকিয়ে থাকে। মমতা কি কাউকে যন্ত্রণা দেবার জিনিস?'

কিন্তু ভিড়ের মধ্য থেকে যাকে তিনি বেছে আনেন, সে-ই রানাদিল কথায় কথায় ব্যথা পায়। সে চায়, নাদিরার সমানাধিকার। দারাশুকো তার পায়ের পাতায় ঠোঁট রাখেন, চুমু দিয়ে ধুলোবালি মুছে দিতে চান। তাঁর মনে হয়, 'ওর যে হাসি বাতাসে মিশে গিয়ে ফুরিয়ে যায়, তাও যদি কুড়িয়ে তুলে রাখা যেতো।' রানাদিল বলে, 'আমার সঙ্গে রাস্তায় নেমে এসো। আমার মতো খারাপ হয়ে যাও। চলো, আমরা হাত ধরাধরি করে ভিড়ের ভেতর মিশে যাই। কারও জন্য যদি কষ্ট হয়, তবে তার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কিছু নেই শাহজাদা।' আর এখান থেকে শুরু হয় দূরত্ব, রানাদিল যেভাবে তাকে চায়, দারা দিতে পারেন না, অন্যদিকে দারা যেভাবে রানাদিলকে অধিকার করতে চান, তা যেন মেয়েটিকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চায়।

নাদিরা দারাকে হারানোর ভয় পান, আর দারা ভয় পান রানাদিলকে হারানোর। তিনি বলে ওঠেন, 'যদি হারিয়ে ফেলি তোমায়, তাই ভয়ে রানা, ভীষণ ভয়ে...।' ভালোবাসতে গিয়ে পুরোপুরি বেইজ্জতির শিকার হন দারাশুকো। তাঁর মনে হয়, 'ভালোবাসা মানে কিছু আহ্লাদ। আর অনেকখানি অপমান।' তবু তিনি বলেন, 'তুমি যদি শুদ্ধচিত্তের মানুষ হও তো ভালোবাসা সহজেই আসবে।' রানাদিলকে শেষপর্যন্ত বেগম হিসেবে স্বীকৃতি দেন দারা, তাকে নিয়ে আসেন লাহোর দুর্গে। কিন্তু রানাদিল পালিয়ে যায়, দারাকে সে বলে, 'ঘরে নাদিরা, রাস্তায় রানাদিল, আর হারেমে উদিপুরী, এর নাম শাদি? আমি শুধুই শরীর, আমার অন্য কোনও গুণ নেই?' তাঁকে কঠিন শাস্তি দিতে রুস্তম খাঁ জুজির সঙ্গে সম্পর্ক পাতায় সে। তখন তার মনে হয়, 'আমি কী তাহলে দু'জন রানাদিল? আমার মন নতুন নতুন জয় করার মানুষ খুঁজে ফেরে?' তারপর শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে বিপুল ভারতবর্ষের ভিতর সে হারিয়ে যায়।

যে দারার একসময় মনে হয়েছিল, 'আমার মনে হয় খোদার কোনও ফরমান আছে আমার ওপর। আমাকে যেন কী সব কাজ করতে হবে, দুনিয়ার আলাদা কী যেন একটা মানে আছে, আমাকে এই দুনিয়ার বীজে নিয়ে চলো', ক্রমেই যেন তিনি অন্ধকারের দিকে তলিয়ে যেতে থাকেন। যিনি জানতেন, 'দুঃখ মানুষকে শিক্ষিত করে, অপমান মানুষকে সাহসী করে', তিনি ক্রমেই যেন মূর্খের মতো আচরণ করেছেন, আরও বেশি বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছেন। দারাশুকো সম্পর্কে একসময় জাহানারার মনে হয়েছিল, 'আওরঙ্গজেবের দিকেই যে বেশিরভাগ লোক দোস্ত হয়ে ঢলে পড়ছে। শাহজাদা দারা ঘাড় উঁচু করে চলা মানুষ। সে জায়গামতো সিন্নি চড়াতে জানে না। তার মুখের কাটা কাটা শ্লেষ কাউকে রেয়াত করে না। অনেক মানী-দামি দরবারি তাই আজ দারার ওপর মহা খাপ্পা।'

এই ঘাড় উঁচু করে চলা মানুষটিকে কিন্তু আখ্যানের শেষদিকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। বরং আওরঙ্গজেবকেই ধূর্ত ও কৌশলী মনে হওয়ার পাশাপাশি নিজের লক্ষ্যে অনেক ঋজু ও অবিচল, পরিশ্রমী, সাহসী ও জেদি বলে মনে হয়। যে কোনও অবস্থাকে মনে মনে মেনে নিয়ে তিনি লেগে থাকতে পারেন। লড়াইয়ের ময়দানে সে কৃতিত্বও দেখায় অনেক বেশি। দারা কিছুতেই জ্ঞানের সঙ্গে কৌশলকে আয়ত্ত করতে পারেন না, ঠিক যেভাবে তাঁকে বুঝিয়েছিলেন মুনশি চন্দ্রভান। তাঁকে বিধর্মী, পৌত্তলিক ও ইসলামের ধ্বংসকারী বলে চিহ্নিত করে দিতে কোনও অসুবিধে হয় না

এই ঘাড় উঁচু করে চলা মানুষটিকে কিন্তু আখ্যানের শেষদিকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। বরং আওরঙ্গজেবকেই ধূর্ত ও কৌশলী মনে হওয়ার পাশাপাশি নিজের লক্ষ্যে অনেক ঋজু ও অবিচল, পরিশ্রমী, সাহসী ও জেদি বলে মনে হয়। যে কোনও অবস্থাকে মনে মনে মেনে নিয়ে তিনি লেগে থাকতে পারেন।

আওরঙ্গজেবের। দারাকে লড়াইয়ে পাঠালে গোটা হিন্দুস্থানে প্রশ্ন ওঠে, 'একজন কবি ও পণ্ডিতকে লড়াইয়ে পাঠানো হচ্ছে কেন?' অর্থাৎ যোদ্ধা হিসেবে দারার যে কোনও মর্যাদা নেই, পণ্ডিত হিসেবেই স্বীকৃতি, সেকথাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দারা একের পর এক ভণ্ড সাধুর পাল্লায় পড়েন। ফৌজকে সংগঠিত করার পরিবর্তে দিশেহারা হয়ে পড়েন। দেশি লোকেদের তুলনায় ফিরিঙ্গিদের ওপর নির্ভর করেন বেশি। তাঁর অপদার্থতায় সাহসী, লড়াকু কাজের মানুষেরা হতাশ হয়ে পড়েন। আর তিনি নির্ভর করেন একদল আহাম্মক, দাম্ভিক, আনাড়ি লোকের ওপর। বাদশার কাছে তারাই যুদ্ধ-সংক্রান্ত মিথ্যে খবর পৌঁছে দেয়। এই দারাশুকো তোষামোদের ভক্ত, কুসংস্কারে পূর্ণ, তাই অশুভ দিন দেখে হামলার হুকুম বাতিল করে দেন, মিছে বাহাদুরির ওপর বকশিস দেন, তুকতাক মন্ত্র-তন্ত্র জানা ওঝারা সঙ্গী হয় মুঘল ফৌজের। ১৬৫৩ সালে তৃতীয়বারের মতো কান্দাহার অভিযানে গিয়ে দারাশুকোর ভয়াবহ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই আখ্যান শেষ হয়।

আখ্যান-কৌশল নিয়েও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন শ্যামল। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুদৃশ্যটি একটি স্বপ্নদৃশ্যের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, যেখানে বাবরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং দু'জনের কথোপকথন চলাকালীনই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। কখনও বা দারাশুকো শুনে ফেলেন জাহাঙ্গীর ও আকবরের সংলাপ। কখনও তিনি নিজেই কথাবার্তা চালান আকবরের সঙ্গে। আকবর তখন বলেন, 'হাফিজ বলেছেন, নিয়তির চোখে ফকির বাদশা, দুই সমান। দুনিয়ার লড়াই, লালচ, ওঠাপড়ার ঘূর্ণির ভেতর তিনি খুঁজেছেন স্থির নাভিপদ্ম। তাঁর জানকারি ছিল, এই দুনিয়ার আসল মানে কী? কিমতটাই বা কী?' কখনও বা শাহজাহান জাহানারাকে উদ্দেশ করে নিজেই স্বগতালাপ করে চলেন। উপন্যাসের শেষের দিকের ঘটনা জানা যায় মহম্মদ বদি'র দিনপঞ্জী থেকে। একটি সাধারণ মানুষের দিনপঞ্জী ইতিহাসের অংশ নয়। কিন্তু সত্য জানার পক্ষে খুব দরকারি। কারণ, 'সঠিক, নিরপেক্ষ ইতিহাস বলতে যা বোঝায়, তা কদাচিৎ শাহী তুজুকে পাওয়া যায়। আমি সাধারণ ইনসান, মিথ্যে কথা লেখার আমার প্রয়োজন হয় না।' এভাবেই আখ্যান-কৌশলকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন শ্যামল।

উপন্যাসের শেষে আমাদের প্রশ্ন জাগে, দারাশুকোর এই ভয়াবহ পরিণতি হল কেন? 'শাহজাদা দারাশুকো' এক মহৎ স্বপ্নের নাম, যাকে বলা যায়, 'সর্বধর্মসমন্বয়'। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল মন্ত্রটিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন শ্যামল। কিন্তু এক মহাকাব্যিক অভিযাত্রার শেষে একজন হেরে যাওয়া ভাঙাচোরা মানুষ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না! ঈশ্বরকে হারিয়ে, প্রিয় নারীদের হারিয়ে, নিজের সমস্ত প্রজ্ঞা ও বোধকে বিসর্জন দিয়ে এই মানুষটি স্রেফ ঠাট্টা ও করুণার পাত্র হয়ে ওঠেন। তাহলে এটাই কি সেই মহৎ স্বপ্নের পরিণাম? আজকের ভারতবর্ষ? শ্যামল কি ঠিক এখানেই পৌঁছতে চেয়েছিলেন? নাকি নিজের জীবন ও দর্শন, সমকাল ও ইতিহাসকে মেলাতে গিয়ে আখ্যানের ভিতর যেমন অনেক অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে, শেষে পৌঁছেও তেমনই এক অসঙ্গতির কাছে তিনি থেমে গিয়েছেন?

রাহুল দাশগুপ্ত

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

নীলকণ্ঠ ঘোষাল

অধ্যায় ১

পর্ব ৩

রাধিকা ছুটে যায় কুঞ্জর দিকে ডাস্টবিনের কাছ থেকে।

(কুকুরের প্রতি) ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা! (কুকুরকে) দূর হারামজাদা, লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো। ছাই খা, ছাই খা। দূর-থু-থু (আক্রোশে থুতু ছিটোতে থাকে। নেপথ্যে কুকুরের গোঙানি শোনা যায়)

ও মা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ও মা আমার কী হবে গো। ইস্-স্—স্। (ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিড়ে একফালি ন্যাকড়া বার করে বেঁধে দেয় কুঞ্জের হাতে)

প্রধান।। (নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড় বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাচ্ছে) আর কত চেঁচাব বাবু, দুটো ভাতের জন্য! তোমরা কি সব বধির হয়ে গিয়েছ বাবু, কিছু কানে শোনো না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গিয়েছে বাবু। ও বাবারা— বাবু— কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটারে এক মুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু। বাবু— তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু... ও বাবাবা...(প্রস্থান)

রাধিকা।। (কুঞ্জের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে) খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, না! জল এনে দেব? জল? একটু জল খাবে?

কুঞ্জ।। না।

(... গভীর মমতায় রাধিকা শুধু কুঞ্জর কপালের ওপর বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দেয়। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে। তারপর বাঁ হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথায়। দুজনের চোখ অশ্রুভরা।)

তারপর শোনালাম নাটকের শেষ দৃশ্যের শেষটুকু।

তখন নতুন ফসল উঠেছে, এসেছে নবান্নের দিন।

(...গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি); প্রধানের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে দয়ালকে দেখে)

দয়াল।। আজ আমাদের নবান্নের উৎসব, প্রধান।

প্রধান।। নবান্নের উৎসব। ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো। সুদিন পড়েছে সব। দুঃখের দিন সব কেটে গিয়েছে। কেটে গিয়েছে সব দুঃখের দিন। আর আসবে না।

দয়াল।। যদি আসেই, তো ডর কীসের!

প্রধান।। ডর নেই! দুখেরে ডরাও না! হ্যাঁ, ডরাও না দুখেরে। বেশ, বেশ ভালো। ভালো। ভালো।

দয়াল।। ডর আছে, কিন্তু প্রধান মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো সব বেঁচেই আছি। এই যে তোমার কুঞ্জ, নিরঞ্জন, এই যে বরকত, সখীচরণ। চেনো তো সব এদের? কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।

প্রধান।। মরনি, মরনি মন্বন্তরে, ভালো। ভালো। ভালো। কিন্তু দয়াল, মন্বন্তর যদি আসে আবার! আবার যদি আসে সেই মন্বন্তর!

(গুরু গুরু মেঘের আওয়াজ)...

(মেঘের দিকে লক্ষ করে) এই দ্যাখো নীচে এই উৎসব, কত আহ্লাদ, কত আনন্দ, কিন্তু আবার ওই ওইখানে, ওই ওপরে, দ্যাখো কত বড় একটা গোলযোগ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। কত বড় একটা গোলযোগ। কত বড় একটা—

(বিকৃত মুখে মাথা নাড়তে লাগল)

দয়াল।। জানি প্রধান, মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধু-বান্ধব, (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন— ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।

প্রধান।। (জোরে চিৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে দয়ালকে) দয়াল! (যবনিকা)

নাটকটি সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন করল, নানারকম। যথারীতি অম্বরিষ ও স্বরাজ আমাকেই উত্তর দিতে বলল।

বললাম— এখনই সবকিছু নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। সময়ের পরিস্থিতিতে মানুষ নাটকটা কীভাবে নিয়েছিল, আজকের দিনে আমরা কীভাবে দেখছি— এসব কথা অন্যসময় সুযোগ বুঝে আলোচনা করা যাবে, কেমন? তারপর অবশ্য ওই তিনটি খণ্ডদৃশ্যের ব্যাপারে কিছু কথা বললাম, যাতে ওরা কিছুটা বুঝতে পারে নাটকের সার, 'নবান্ন'র অন্তর্বস্তুটাকে ছুঁতে পারে কিছুটা।

—: অধ্যায় ২:—

এটা হতে পারে আমার হামবড়া, হতে পারে পাকামি অথবা ভালো কথায় ধৃষ্টামি। দোষ হোক, গুণ হোক এটা আমার আছে— কোনও চালু কথা, তা যত পুরনো হোক বা যত বড় মনীষীর বাণীই হোক, সেটাকে নিজের মত হিসেবে ব্যবহার করার আগে তার খাঁটিত্ব যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করি। অনেকের

সেই খ্রিস্টপূর্ব বাহাত্তর-একাত্তর অব্দের ঘটনা ও চরিত্র? এখনকার শরীর মন বুদ্ধি দিয়ে তখনকার চরিত্রকে ফোটাতে হবে? দু'হাজার বছরেরও আগেকার মানুষের ছবি মঞ্চে আনতে হবে! মননের কথাটা শুনে আমি ওর দিকে চেয়ে থাকলাম।

কাছে আমার এই স্বভাবটি বিদ্রুপের হলেও কিছু করার নেই। স্বভাব যায় না ম'লে।

এই যে একটি কথা— বাঙালি ইতিহাস-সচেতন নয়, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নীরদ সি চৌধুরি পর্যন্ত অনেকেরই উচ্চারণে ঝনঝন করে বেজে উঠেছে বাঙালির এই আত্মনিন্দা। অনেক চিন্তাবিদ তো কথাটিকে মাথায় তুলে নিয়ে রীতিমতো আত্মপীড়ন ঘটিয়েছেন। এটা অবশ্য খারাপ নয়, নিন্দা শুনলে পীড়া অনুভব করা ভালো জিনিস। এটা যদি স্বভাব হয়ে ওঠে তো খুব ভালো। আমার তো মনে হয়, বাঙালি-মন স্বভাবে বড় রোম্যান্টিক। তাই কোথাও ইতিহাসের গন্ধ পেলে সে ছুঁক ছুঁক করে।

তবে মানতেই হয় ঐতিহাসিক জিনিসকে আদর করা, ঘরে তুলে আনা ও রক্ষণ করা ইত্যাদি কাজে বাঙালি-মন ছন্নছাড়া, উদাসীন। বাইরে থেকে কেউ পিঠে কিল মেরে মনে করিয়ে দিলে তবেই সে জাগে। সাহিত্য থেকেই একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। বাঙালি জাতির কতইবা বয়স, মাত্র হাজার বারোশো বছর। ভাষার জন্ম ধরেই তো জাতির জন্মকাল ঠিক হয়। যাঁকে বাংলার অন্যতম আদি কবি বলা হয়, সেই বড়ু চণ্ডীদাস তথা আদি চণ্ডীদাস একটি গ্রন্থ রচনা করলেন চোদ্দো শতকে। গ্রন্থটি কৃষ্ণলীলা সম্পর্কে গান বা পদের সমষ্টি। প্রাচীন ও অকৃত্রিম বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থ। পুঁথিটি আপনজনদের কাছে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন পৃথিবী থেকে। ছন্নছাড়া বাঙালির ঘরে তার দশা কী হল? রচনার কাল থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর পরে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে একজন পরম নিষ্ঠাবান অন্বেষী— বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় পুঁথিটি আবিষ্কার করলেন একটি গাঁয়ের ঘরে খড়ের মাচার ভিতর থেকে। পরম যত্নে ও চেষ্টায় গ্রন্থটিকে সম্পাদনা করলেন, নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। অন্তত চারশো বছর আগেই যদি গ্রন্থটিকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হত? বাঙালি কত আগে তার আত্মপরিচয়ের অন্যতম দলিলটি হাতে পেত! কী করুণ অবস্থা আমাদের। আজ মনন ছেলেটি এসেছিল আমার কাছে। এসেছিল কী এক আগ্রহ নিয়ে— ইতিহাস জানার আগ্রহ। সে একজন অভিনেতা, নাট্যকর্মী। তার মধ্যে একটি ধারণা বা চেতনা জন্মেছে যে, একজন নাট্যকর্মী যদি এখনকার সমাজজীবন, তার অতীত এবং ভাবী লক্ষ্য সম্বন্ধে ঠিকমতো বোধ সঞ্চয় করতে না পারে, সে সার্থক শিল্পী হয়ে উঠতে পারবে না। সে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল রোমের দাস-বিদ্রোহের কথা। গ্রুপে এখন আবার ক্রীতদাস নাটকের রিহার্সাল চলছে নতুন করে। আমি তাকে বললাম— তুমি এটা অম্বরিষের কাছে জানতে চাইলে না কেন? ও বলল— আমি রাজুদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। রাজুদা বললেন, অম্বুদাকে বলো। অম্বুদা বললেন— তুমি তো এই নাটকে কাজ করছ না। যখন করবে, তখন জানবে। ওসব নিয়ে এখন ভাবার দরকার নেই।

সেই পুরনো অম্বরিষ! অ্যাকাডেমিক বিদ্যেগুলোও কাউকে দেওয়ার কাজে বিরাগ অনীহা। আরে বাবা, এই একটা জিনিসই আছে মানুষের, যা অন্যকে দিলে নিজের সঞ্চয়ে তার ধার ও ভার দুই-ই বাড়ে। এই জ্ঞানটুকু আমাদের সভ্যতা অনেক প্রাচীনকালে মানুষকে দিয়েছে। যাইহোক, আমি যেটুকু জানি মননকে বললাম— বিদ্রোহের নেতা ছিলেন একজন থ্রেসীয় ক্রীতদাস। আগে রোমান সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতেন। পরে তাঁকে গ্ল্যাডিয়েটর বানানো হয়। এই সময় তিনি গ্ল্যাডিয়েটরদের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা বিস্তারের জন্য গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। একসময় ক্রীতদাস ও কৃষকদের নিয়ে গড়া তার বাহিনীতে বিদ্রোহী সেনার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় নব্বই হাজার। খ্রিস্টপূর্ব ৭৩ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী যুদ্ধে তিনি ছিলেন সেনাপতি। সিসিলি আক্রমণের সময় তাঁর বাহিনী পথ হারিয়ে ফেলে। তিনি রোমান সেনাপতির হাতে বন্দি হন। শেষে প্রায় ছ'হাজার যুদ্ধবন্দির সঙ্গে তাঁকেও ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এই কাহিনি নিয়ে লেখক হাওয়ার্ড ফাস্ট একটি উপন্যাস রচনা করেন। মননকে বললাম— যদি জোগাড় করতে পারি উপন্যাসটা তোমাকে পড়াব, মনু। তোমার জানার ইচ্ছে দেখে আমার ভালো লাগছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর মনন বলল— বাব্বা! সেই খ্রিস্টপূর্ব বাহাত্তর-

একাত্তর অব্দের ঘটনা ও চরিত্র? এখনকার শরীর মন বুদ্ধি দিয়ে তখনকার চরিত্রকে ফোটাতে হবে? ওরে বাবা! দু'হাজার বছরেরও আগেকার মানুষের ছবি মঞ্চে আনতে হবে! মননের কথাটা শুনে আমি ওর দিকে চেয়ে থাকলাম।

একটু পরে বললাম— ওরে বাব্বা বললে কেন মনন?

মনন অপ্রতিভ হয়ে গেল— না, মানে ভাবুন সঞ্জুদা—

— আমার ভাবতে বয়ে গিয়েছে। যার ভাবনা, সে ভেবেছে, সে করছে, করাচ্ছে। আমি তো দর্শক।

মনন মাথা নিচু করে ভাবছে।

ওকে দেখতে দেখতে বললাম— তুমি পারবে।

— কী? মনন মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে।

— রোল।

— কী রোল?

— ওই নাটকে যে-কোনও রোল।

— কী করে? আমি তো কিছুই করছি না। করব কিনা সেটা অম্বুদা জানেন।

— তা অবশ্য ঠিক। তোমাকে কোনও রোল দেওয়া হবে কিনা— তবে সে তোমার মতো করে ভাবতে পারে, সে পারবে, অবশ্যই পারবে।

কথাগুলো বলতে বলতে মননকে দেখছিলাম।

কী মনে হল, মননকে বললাম— চল মনু, আজ আমরা একসঙ্গে গ্রুপে যাব চল। আজ ওটার রিহার্সাল আছে। অম্বু আমাকে বেহালা এসরাজ দুটোই নিতে বলেছে। তুমি থাকলে সুবিধে হবে। দেরি আছে, সময় হয়নি। তোমার এখন কোনও কাজ আছে নাকি?

— না।

— তাহলে বসো গল্প করি, তারপর বেরিয়ে পড়ব।

মাথার মধ্যে একটা রঙ্গ-তামাশার বুদ্ধি খেলে গেল। আজ রিহার্সালের পরে অম্বরিষকে একটু ধরার ইচ্ছে হল। ওই দু'হাজার বছরের বেশি আগেকার মানুষের চেহারা ভাবমূর্তি তৈরির ব্যাপারটা নাটকে এসেছে কিনা— মননের কথাটাকে এভাবে গুছিয়ে নিয়ে খুঁচিয়ে তুলে দেব। বলব— সকলকে একটু বুঝিয়ে বলো।

মননকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকতে দেখে অম্বরিষের চোখে অন্য ভাষা। কিন্তু অন্যরকম হেসে বলল— আজ গুরুশিষ্যকে একসঙ্গে আসতে দেখছি। উদাসীন হয়ে বললাম— আমি কখনও গুরুগিরি করেছি বলে মনে পড়ে না।

— আর কি ছাত্র-মাস্টার?

— মাস্টারি? আমি? ওরে বাবা! তুই

এইরকম এলেবেলে ল্যাংফ্যাং চেহারায় ওই রোমান সেনেটরের রোল করা যায় না। এটা আমার— অম্বরিষ মেঝেয় হাত চাপড়ে বলল— অভিনয়, অভিনয়টাই আসল কথা, চেহারা নয়। তুমি ভেটার‍্যান শিল্পী হয়ে—

থাকতে! আচ্ছা মনু, তুমি বলো তো—

মনন বসতে বসতে বলল— সবার আমি ছাত্র।

— ব্যস। মিটে গেল। এবার বসা যাক নিশ্চিন্তে।

ঘরের মধ্যে হাসি।

হাসির মধ্যে নাটুকে ভঙ্গিতে প্রমিতা বলে— খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন, না জয়মাশাই?

— নিশ্চয়ই। একই ভঙ্গিতে প্রমিতাকে দেখে বললাম— অ্যাঁ? হ্যাঁ তো রে প্রেমী! প্রমিতা কাত। হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে করুণ চোখে মাফ চাইছে।

আমি তথাস্তু বলার ভঙ্গিতে হাত তুললাম।

আবার হাসির শব্দ।

স্বরাজ কোথায় বসেছিল, তার গলা শোনা গেল— নাটক, নাটক!

শব্দভেদী বাণের মতো স্বরাজের উদ্দেশে কথা ছুড়লাম— তবু তো তোদের নাটকে একটা পার্ট পাই না, বলে একটু মজার হাসি দিলাম।

— অ্যাঁ! এ কী অনাকাঙ্ক্ষিত বাক্য সঞ্জয় উবাচ। নির্দেশক-স্যার, আপনি কোনও কৈফিয়ত দেবেন কি? প্রমিতা একই নাটুকে ঢঙে বলল।

— কৈফিয়ত দেবে তো শালা সঞ্জুদা। কথাটা বলেই অম্বরিষ জিভ কাটে এবং বলে— মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, মাফ করো গুরু।

— করতাম গুরু না বললে। তদুপরি গুরুকে শালা বানানো ক্ষমাহীন অপরাধ। গম্ভীর গলায় বললাম অন্যদিকে মুখ রেখে। অম্বরিষ বলে যাচ্ছে— এই নাটকেই একটা সেনেটরের রোল করতে কতবার সাধাসাধি করেছি, তুই সঞ্জুদাকে জিজ্ঞাসা কর, মিতা।

প্রমিতা আমার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকাতেই বললাম— দুটো কারণ— এক, এই বয়েসে আর অভিনয় নয়, শুধু বাজনা। দুই, এইরকম এলেবেলে ল্যাংফ্যাং চেহারায় ওই রোমান সেনেটরের রোল করা যায় না। এটা আমার— অম্বরিষ মেঝেয় হাত চাপড়ে বলল— অভিনয়, অভিনয়টাই আসল কথা, চেহারা নয়। তুমি ভেটার‍্যান শিল্পী হয়ে—

— বলেছি ওটা ইতিহাস বলে। কল্পনা নয়, ইতিহাসের ছবি আঁকতে হবে ওই প্রোডাকশনে।

একটু চুপ করে গেল অম্বরিষ। তারপরেই বলল— তাহলে তো ভেতো বাঙালিদের এই নাটক করাই চলে না। কচি কচি কমনীয় চেহারা নিয়ে—

স্বরাজ বলে ওঠে— চলে। খুব চলে। এটা নিয়ে একটা আলোচনা হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে সমর্থন করলাম— হোক।

অম্বরিষ বলল— আগে রিহার্সালটা হোক। এই কল-শোটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

— ঠিক আছে। রিহার্সালের পরে।

খুব উৎসাহে আলোচনার একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। ভালো লাগছে। মননের দিকে চেয়ে দেখলাম— ওর চোখমুখ আলোকিত।

রিহার্সালের পর আলোচনাটা আমিই উসকে দিলাম। মননের প্রশ্নটাকে অন্যভাবে তুললাম। দেখা গেল সবার আগে প্রমিতা, পরে শেখর বোধনরা হইহই করে আগ্রহ দেখাল। শুনতে বসে পড়ল ঠাসাঠাসি করে।

স্বরাজ বসতে বসতে বলল— মনু এই কথাগুলো বলেছে, সঞ্জুদা?

— হ্যাঁ। দুপুরের পরেই ও গিয়ে হাজির। ভাতঘুম সেরে সবেমাত্র শরীরটাকে চাঙ্গা করতে করতে ভাবছিলাম বেহালাটা নিয়ে একটু ঘষাঘষি করব। প্রায় ভুলে-যাওয়া পুরনো সুর একটা ক'দিন ধরে মনে ঘাই দিচ্ছিল। বেহালা হাতে নিয়ে হারানো সুরটাকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম মনে মনে, বুঝলে। সেই সময় মনু এসে ঢুকল। এটা- সেটা গৌরচন্দ্রিকা করে হঠাৎ আমাকে টেনে নিয়ে গেল। খ্রিস্টপূর্ব সেই এক শতকে। বোঝো। হঠাৎ ও আমাকে— আচ্ছা, রাজু! তোর কাছে ও জানতে চেয়েছিল, তুই বলিসনি কেন?

স্বরাজ বলল— যে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে, তার কাছে জানতে বলেছি। স্বরাজ অম্বরিষের দিকে তাকাল। আমি তাকালাম না ইচ্ছা করেই। এটা নিয়ে অম্বরিষকে কিছু বলব না ভাবলাম। ঠিক করে নিলাম, মননের কথাগুলোকে প্রশ্নের মতো বানিয়ে নিয়ে আমাদের নাটকটা যেভাবে প্রোডিউস করা হয়েছে, তাতে চরিত্রগুলো ঠিক ঠিক ঐতিহাসিক ইমেজ পেয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা দিয়ে শুরু করব আমার কথা। আমাকে একটু অবাক করে দিয়ে

অম্বরিষ বলে— আমি তো মনুকে বলেছি, সময় পেলেই ওকে সব ব্যাপারটা বোঝাব, শোনাব।

অম্বরিষের উচ্চারণটি বেশ নরম। কিন্তু কথাটি সত্যি বলেনি। ওকে কোনও সুযোগ না দিয়ে বলে উঠলাম— দেখ, শিল্পীরা এখন মনোযোগী ছাত্র। ওই দেখ! কেমন বসেছে মাস্টারমশায়ের কথা শোনার জন্য।

— তবে পড়া ধরবেন না যেন স্যার, শুধুই পড়াবেন। শেখর বলে উঠল। সকলে হাসল।

— কী পড়াব সেটাই তো বুঝতে পারছি না। দাস-বিদ্রোহের কথা? নাকি আমাদের নাটকের কথা? এসব তো আমি মহড়ার সময় যখন যেমন দরকার বলেছি, বুঝিয়েছি। নাটকটা তো এমনি তৈরি হয়ে যায়নি। এতগুলো শো হয়ে গেল গোটা রাজ্যে। এই নাটকের মতো সুনাম আমরা কটা নাটকে পেয়েছি? আমি আমার কৃতিত্বের কথা বলব না, এই প্রোডাকশনের পিছনে আমাদের গোটা টিমের সকলের অবদান আছে, আছে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ। মানুষ প্রশংসা করেছে, অভিযোগ তো ওঠেনি। আমি বললাম— অভিযোগ কিনা জানি না। তবে প্রশ্ন করেছে, ব্যাখ্যা চেয়েছে অনেকে। নারী চরিত্রগুলি এবং সেনেটরদের পোশাক নিয়ে কথা উঠেছে। ওগুলি নাকি রোমান অবয়বের ছবি আনতে পারেনি। আবহ, মানে মিউজিক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্রীতদাসদের নিয়ে অবশ্য কথা ওঠেনি। কিছু শিল্পীর অভিনয়ের মধ্যে, আমি নাম বলব না, একেবারে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক পালার সাধারণ উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির কাঁচা নমুনা দেখা গিয়েছে। এগুলি অনুধাবন করে নিলে আমাদেরই ভালো হবে। এই নাটক আমাদের আগে অন্য গ্রুপ করেছে। তাদের ব্যাপারে নাকি এইসব কথা শোনা যায়নি।

— বাজে কথা। কথা উঠেছিল। বাজারে কিছু সো-কল্ড্ আঁতেল আছে, যারা ভাষার কায়দা আর কিছু ইতিহাসের বুকনি দিয়ে পাণ্ডিত্য দেখায়, আর্ট নিয়ে উঁচুগলায় তত্ত্ব আওড়ায়। ওরা চিরকাল আছে, থাকবে সব জায়গায়। ওদের কথা নিয়ে ভাবনায় মরে গেলে আমাদের চলবে না। মাথায় রাখতে হবে মূল কথাগুলি— আমাদের নাটক, আমাদের অভিনয় সাধারণ মানুষ, নীচের তলার খেটে খাওয়া মানুষের জন্য।

— শুধুই পরিবেশনের জন্য তো নয়। মানুষকে আনন্দের মধ্য দিয়ে চেতনার অমৃত পান করানো, যাতে তার মনের স্বাস্থ্য ভালো হয়। সাধারণ মানুষের চোখ ও মনকে তৈরি করাও একেবারে খাঁটি কথা। এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তোমার মতো সুন্দর করে বলতে পারি না সঞ্জুদা। এখানেই নিছক ব্যবসাওলা যাত্রা থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের তফাত,

বাজারে কিছু সো-কল্ড্ আঁতেল আছে, যারা ভাষার কায়দা আর কিছু ইতিহাসের বুকনি দিয়ে পাণ্ডিত্য দেখায়, আর্ট নিয়ে উঁচুগলায় তত্ত্ব আওড়ায়। ওরা চিরকাল আছে, থাকবে সব জায়গায়। ওদের কথা নিয়ে ভাবনায় মরে গেলে আমাদের চলবে না।

আমাদের লড়াই। শিক্ষা ও চেতনা— অম্বরিষের কথা থামিয়ে দিয়ে মাঝখানে বলে উঠলাম, কারণ ওই প্রিয় শব্দগুলি আওড়াবার সুযোগ পেলে ও থামবে না। বুলির হোজ-পাইপের মুখ খুলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে কাজের কথা বোঝা-বুঝির ব্যাপারটা হারিয়ে যাবে। হাওয়ায় ভেসে যাবে। শিক্ষা ও চেতনা শুধু বক্তৃতা আর কাগজে লেখার জিনিস নয়। বললাম— অম্বু, ড্রেস সাপ্লায়ারদের সঙ্গে একবার বসা দরকার। ভেবে নে কতটুকু কী করা যায়। আর ডায়লগ, উচ্চারণ, অভিনয়, মিউজিক নিয়ে কতটুকু রি-থিংক করা যায় দেখ। আমার এটুকুই—

অম্বরিষ আমার কথা কেড়ে নিয়ে বলল— যে-টুকুই হোক, এখন কিছু করা যাবে না। ছোট রোল হলেও নতুন দু'জনকে তুলতে হচ্ছে, সেটা তো দেখছ। আর ড্রেস- ট্রেস পাল্টানো? টাকা কই? এমনিতে ওরা রেওলার গজগজ করে। পাল্টানো দূরের কথা, প্রতিবারে ড্রেস রিপেয়ার আর ওয়াশ করার খরচ নিয়ে কচকচি করতে হয় ওদের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করো ক্যাশিয়ার আর সেক্রেটারিকে। আর মিউজিকের কথা তোমাকেই ভাবতে হবে। স্টাইল অব অ্যাক্টিংয়ের কথা বলছ?

— আমি কিছু বলছি না রে ভাই, অত জ্ঞান আমার আছে নাকি! চটপট বলে ফেললাম। অম্বরিষ থেমে গেল।

বললাম আবার— মানুষের কথা যা কানে আসে— বলতে বলতে থেমে যেতে হল, স্বরাজের কথা কানে এল।

স্বরাজ বলছে— যা নিয়ে কথা হওয়ার কথা ছিল, সেটার কী হল?

— কী কথা? অম্বরিষ জিজ্ঞেস করল।

অম্বরিষ এটা জিজ্ঞেস করল কেন? বোঝার জন্য ওর মুখের দিকে চাইলাম। ও কি এড়িয়ে যেতে চায়?

প্রমিতা বলে ওঠে— ওই যে মননদার কথাটা। দারুণ প্রশ্নটা। খুব জানতে ইচ্ছে করে, শোনার ইচ্ছে হয়। মনুদা, তুমি নাটকটাতে কিছু না করেই ভাবছ? আমরা এত বছর ধরে এত নাইট করার পরেও এমন করে ভাবতে পারি না। শেখর, বুধো দেখছিস! শেখ। শেখর তার হাত-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দেয়— শেখো তোমরাও।

— ওঃ! জ্বলে-পুড়ে গেলাম।

হঠাৎ ঘরে ভিড়ের মধ্যে থেকে কথাটা যেন ফেটে বেরিয়ে এল।

আমারও মুখ থেকে বেরোল— কে জ্বলে-পুড়ে মরল রে?

প্রমিতা বলল— কে আবার! যে ছাদের ওপর থেকে, গাছের ডাল থেকে দুপদাপ লাফ দিয়ে পড়ে। হাসিতে ঘর ভরে গেল।

— ও, বুঝেছি। হ্যাঁ রে বিমান, তোর কীসের কষ্ট?

বিমান মুখটা একটু তুলে বলল— অভিনয় করব হাত-পা-মুখ নেড়ে, গলার কায়দায়। আমি কি পরীক্ষার রচনা লিখব? নাকি রিসার্চের বই লিখব? কী দরকার অতশত হিস্ট্রি আর্কিয়োলজি পড়বার? কে কোথা থেকে এল, আঁতেল মার্কা বুকনি ছড়াল, অমনি সকলের মাথা ভারী হয়ে নুয়ে পড়ল। জ্বলে গেলাম!

বিমান উঠে দাঁড়ায়। তারপর চাপা গলায় বলে— যাই। মাথার গোড়ায় ধুঁয়ো দিয়ে আসি। ওঃ! আবার সকলের হাসি।

— দিয়ে যা একটা। ঘুট করে স্বরাজ বলল।

— এই! সিগারেট খেলে বাইরে যাও। ধারা বলে ওঠে।

অতঃপর কৌতুকের নানা কথা উঠতে থাকে। হাসিঠাট্টা বাড়ে। জমে উঠল আসর। তার মধ্যে সম্পাদক সুধাকর বলল— আ-রে! গম্ভীর একটা আলোচনার গভীর আঁচে এমন করে ঠান্ডা জল ঢালছিস তোরা! সব ভুস-ভাস উড়ে গেল। তখনই অম্বরিষ নিজস্ব হাসিটি হেসে বলল— হিঁ-হিঁ-হিঁক— থাক। এখন আর হয় না। হবে— সুযোগ এলেই কথাগুলি আলোচনা হবে। —হ্যাঁ, দরকার এ-সব জানার। করব— আলোচনা করব একসময়। কী বলো সঞ্জুদা, ঠিক আছে?

সকলে এখন চুপ করে গিয়েছে।

বললাম সকলকে দেখতে দেখতে— আমি আর কী বলি। হবে, করব, করা দরকার— এ কথা তুই যখন বলেছিস, তাই হোক। সবই সম্ভাবনার খুপরিতে জমা থাক।

—: অধ্যায় ৩:—

নতুন নাটকের মহড়া শুরু হয়েছে। মহড়ার প্রথম পর্ব: নাটক পড়া একদিন, কাস্টিং— কার কী পার্ট ঘোষণা একদিন, শিল্পীদের প্রত্যেককে স্ক্রিপ্টের কপি দেওয়া ও তা পড়ে নেওয়ার জন্য পাঁচদিন, তারপর বসে বসে রিহার্সালের জন্য কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছে। এখন পুরো মহড়া। এই মহড়ার প্রথম দিনেই নির্দেশক ঘোষণা করেছে— মাঝখানে দুটো কল-শো আছে অন্য নাটকের, তার জন্য দুই— দুই আর চারদিন বাদ দিয়ে সাকুল্যে তিরিশ দিন পরে স্টেজ রিহার্সাল, তার তারিখ জানানো হবে পরে। এখানে মুখে বলা হল। এ ব্যাপারে সম্পাদক যা করার করবেন।

যথারীতি নোটিস জারি করবে সম্পাদক। সম্পাদকের কর্মগুলি অতঃপর নিয়মরক্ষার বিধায় করণীয়— গ্রুপ কমিটির সভা, প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা, ব্যয়ের হিসাব, অন্যান্য কাজের আলোচনা ও দায়িত্বভাগ ইত্যাদি জড়িয়ে থাকা বিষয়ে সভায় কথাবার্তা। তবে শেষ কথা বলেন নাটককার তথা পরিচালক। সভা কেমন হয়? সভার শুরুতেই হয়তো পরিচালক বলে দিলেন তাঁর কথা— কী করতে হবে, কী খরচ হবে, কাকে কোন কাজের দায়িত্ব নিতে হবে ইত্যাদি। তখনই হয়তো দেখা যাবে স্বরাজ ডাক দিল— কুশো। কুশধ্বজ রক থেকে উঠে চলে এল। এসেই সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে মাথা নাড়তে থাকল। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করল— কী রে মাথা নাচাচ্ছিস কেন?

কুশধ্বজ বলবে— দাঁড়াও, ভুলে যাব।

গোনা শেষ করে প্রশ্নকারীর দিকে চেয়ে বলবে— চা। বলেই সে ফুড়ুৎ করে চলে যাবে বাইরে। কে কে আছে, তাদের কার কী চা— চিনি ছাড়া, দুধ ছাড়া, চিনি-দুধ দুই ছাড়া— এসব মনে রাখার ব্যাপার আছে। তাই সে বলে— দাঁড়াও, ভুলে যাব।

এর মধ্যে কেউ হয়তো বলল— এই এখুনি চা! মিটিং সবে শুরু। কুশো ঘষঘষে চাপা গলায় 'মিটিং শেষ, চাটিন শুরু, ইটিন চা-ই' বলতে বলতে চলে যাবে। তার এই ইংরেজি উচ্চারণ, যদি ধারা থাকে ও তার কানে যায়, হা-হা হাসি ফেটে পড়বে ঘরে। তখন অনিবার্যভাবে

মহড়া চলে যেন যুদ্ধের কায়দায় ফৌজি শৃঙ্খলায়। কারণ নাটক নিছক প্রমোদের জিনিস নয়, চেতনার বাহন। নাটকে লোকশিক্ষা হয়, নাটক জীবনবোধের জননী— এমন অনেক কথা অনেকভাবে তারা শোনে।

সম্পাদক সুধাকর গম্ভীর ও উঁচু গলায় বলবে— আঃ! মিটিং চলছে! এতেও চাপা হাসি।

আমি থাকাতে হয়তো অন্যরকম ঘটল। ওই হাসির মধ্যে গিটারে দু-চারবার ঝালা মেরে দিলাম।

ব্যস! অবধারিতভাবে অম্বরিষ বেজায় বেজার মুখে বলবে— এই মিটিং করে লাভ কী সম্পাদক?

আমারও কৈফিয়ত দেওয়ার কথা। আমি হয়তো বললাম— ওদের হাসি বন্ধ করার তরেই তো বাজালাম।

প্রমিতা ফিক করে হেসে উঠে বলল— এনকোর, সঞ্জুদা!

এই অবস্থায় নিশ্চয়ই অম্বরিষ উঠে দাঁড়াবে, এদিক-ওদিক চাইবে এবং শেষে বাথরুমে চলে যাবে।

অবশ্যই এখন বিমান ফিসফাস করল হয়তো— ঠিকই তো। রিহার্সালের মধ্যে ফার্স করা হলে সার্টেনলি ডিরেক্টর ধমকাতে পারে। কিন্তু মিটিংয়ের মধ্যে ফার্স চললে বাথরুমে চলে যাওয়া ছাড়া ডিরেক্টরের কী আর করার থাকে, এটা সভাপতি ও সম্পাদক একটু সিরিয়াসলি ভাবুন।

লম্বা হাসি চেপে রাখতে না পারার জন্য ঘরে-বাইরে ঘোঁত-ঘোঁত আওয়াজ উঠল। আমি বললাম— ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে সেক্রেটারি একটা কড়া নোটিস জারি করলেই বুঝবে ঠ্যালা।

আবার বেয়াড়া টাইপের হাসি উঠেছে, হয়তো তখনই কুশো 'চা-চা' বলে ঢুকল এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অম্বরিষ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। মিটিংয়ের ন্যাচারাল ডেথ ঘটল। মহড়ার চালচিত্তির পুরো আলাদা। মহড়া চলে যেন যুদ্ধের কায়দায় ফৌজি শৃঙ্খলায়। তাদের কাছে শেষের শব্দদুটি মন্ত্রের মতো প্রেয় ও শ্রেয়। কারণ নাটক নিছক প্রমোদের জিনিস নয়, চেতনার বাহন। নাটকে লোকশিক্ষা হয়, নাটক জীবনবোধের জননী— এমন অনেক কথা অনেকভাবে তারা শোনে। তার সার্থক শিল্প যদি লড়াই দাবি করে, তাহলে তো স্থির হয়েই যায় মনের মধ্যে ওই শব্দদুটিকে কোথায় স্থান দিতে হবে।

কথাগুলির উচ্চারণ ও ভাষ্য-ভাষণ সবই ঠিক আছে। তবে আমাদের মহড়াঘরটিকে সময় সময় প্রাচীন কালের গুরুমশায়ের পাঠশালা মনে হতে পারে— যেখানে ছাত্রদের দায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আর কাজের ভার বুঝে নেওয়া, প্রশ্ন করা নয়।

মহড়ার সময় ঘরে থাকে শুধু নির্দেশক ও শিল্পীরা— যখন যাকে দরকার। আমি এলে ভিতরেই বসতে বলে অম্বরিষ। আমি নেপথ্যশিল্পী, মিউজিকের লোক। এটা আমারও মহড়া বটে। যন্ত্র একটা না একটা সঙ্গে থাকেই। অভিনয় করি না এখন, তাই সব দিন আসি না।

আসেন আর একজন কখনও কখনও। অনেক প্রবীণ মানুষ-রসময়দা, একসময়ের বিখ্যাত অভিনেতা। আনন্দে সময় কাটাতে আসেন, সুযোগ পেলেই অতীত-চারণ করেন। এলে ওকে অম্বরিষ ভিতরে বসায়।

বাইরে ও রকে যারা বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের এক ধরনের পরীক্ষায় পাশ করতে হয়— কখন কার ডাক পড়বে, হুঁশে থাকা এবং কথা বলার সময় গলার ডেসিবেলে লিমিট রাখা। এই হল মোটামুটি তিন-চার ঘণ্টার মহড়ার রোজনামচা। সরকারি ছুটির দিনে কখনও হয়তো দু'বেলার মহড়া।

শিল্পী-মেম্বাররা বেশিরভাগই চাকরিজীবী— সরকারি-বেসরকারি। কিছু বেকারও আছে। মেয়েদের মধ্যে চাকরি করে চেতা, নবদিশা, ইদানীং প্রমিতাও। শহরতলি— অনেকে আসে বাসে বা সাইকেলে, কেউ হেঁটে, কেউ রিকশায়— দূরত্ব অনুসারে। মহিলাদের যাওয়া-আসা নিয়ে কখনও কখনও সমস্যা হয়। ধারা ডিরেক্টরের স্ত্রী, তার সাথির সমস্যা নেই। প্রমিতা প্রায়শ রিকশায় যাতায়াত করতে পারে বেশি দূরের নয় বলে। দয়িতা, চেতা ও বসন্তরা স্বাভাবিক সঙ্গী। নবদিশা আসে একা। ফেরার সময় তার নৈমিত্তিক সঙ্গী রেবন্ত। ওরা শহরে পাশাপাশি পল্লির বাসিন্দা। অন্যান্যদের নিয়ে সমস্যা বা অসুবিধে নেই।

এ সবের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গ পেত না, যদি কারও কারও যাতায়াতের ব্যাপারটা নির্দেশক অম্বরিষের মাথায় ভর না করত। নবদিশা ও রেবন্তর ব্যাপার নিয়ে সংগঠনের কোনও চিন্তা-

ভাবনার কারণ না দেখা দিলেও ওর মাথার ব্যথা কর্তাদের হ্যাপায় ফেলেছে। সম্পাদক সুধাকরের কথা— সঞ্জুদা, নন-ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে ফেলা অম্বুদার এক ধরনের মেন্টাল ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী করা যায় বলুন তো?

আমি বললাম— অনেক বলেছি ও শোনেনি। দলের অধিকারী তোমরা, সামলাও তোমাদের নীলমণিকে। আমি তো অতিথি! — আপনি আমাদের কাছে অনেক বেশি। আচ্ছা বলুন তো, কী দরকার ছিল নবিকে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য হঠাৎ মনুর মতো ছেলেকে পাঠানোর? নবি তো আমাকে বা অম্বুদাকে বলেনি যে, কাউকে সঙ্গে দিন।

— হুঁ। ঘোঁট পাকিয়েছে। সামলাও। গ্রুপের মানে টান পড়বে না তো?

— যা হয় হোক। আমি ওর মধ্যে ঢুকব না দাদা। যার ব্যথা তিনি সামলান।

— তা বললে কী চলে! তুমি সেক্রেটারি।

সুধাকর গরগর করতে করতে স্বরাজকে ডাকতে ডাকতে চলে গেল। একদিন মহড়ায় কোনও পার্ট ছিল না। নবদিশা অম্বরিষকে বলেছিল— আজ তো আমার পার্ট নেই। একটু আগে চলে যাব?

একটু চুপ করে থেকে অম্বরিষ বলল— বসো, দেখছি।

একটু পরে মননকে কাছে ডাকল অম্বরিষ। একান্তে বলল— মনু, তোমার আজ আর কিছু নেই। তুমি নবিকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। তুমিও বাড়ি চলে যেতে পার। নবিকে বলো, আমি যেতে বলেছি তোমার সঙ্গে।

নবদিশাকে মননের সঙ্গে যেতে দেখে রকে বসা রেবন্ত ছটফট করেছে। ভিতরের দিকে তাকায় কয়েক বার। চলে যাওয়ার কথা বলতে পারছে না অম্বরিষকে, তার পার্ট পড়বে কিনা তাও জানে না।

পরের দিন মহড়া শেষ হওয়ার আগেই অম্বরিষ মননকে ডেকে বলে দিয়েছে— তোমার তো অসুবিধে নেই, ওদিকেই বাড়ি, মহড়ার শেষে দৈনিক নবিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। নবিকে বলে দিয়েছি।

মহড়া শেষ হয়েছে। অনেকে চলে যাচ্ছে এবং গিয়েছে। মননের পিছনে নবদিশাকে যেতে দেখা গেল।

এ-গলি ও-গলি দিয়ে অনেকটা হাঁটতে হয় নবদিশার বাড়ি যেতে হলে। প্রথম গলি পেরিয়ে অন্য গলির মুখে পা ফেলেই মনন দেখে, রেবন্তর সাইকেলটা সামনে থেকে দ্রুত এসে ঘষ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে নেমে বলল— দাঁড়ালি কেন, চল।

মনন দেখল নবদিশা মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে যথারীতি হাঁটছে। মনন নিজের সাইকেলটা ডান হাতে ধরে নিয়ে আসছিল তার

> অদ্ভুত কায়দায় ওরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে তার চেয়ে পেছিয়ে যায়। মনন স্লো হাঁটার চেষ্টা করে, ওরাও তাই করে। ফিরে ফিরে ওদের লক্ষ করাটাকে মনন বিলো দ্য ডিগনিটি মনে করে। সে কখনও কখনও পিছনে তাকাবার ছল-ছুতো করেনি তা নয়।

পাশে পাশে। এখন সাইকেল নিয়ে মনন ও রেবন্ত পিছনে, নবদিশা সামনে হাঁটছে।

একটু পরে অন্য একটি গলিতে এসে মনন বলল— রেবন, তোরা চলে যাবি? আমি তাহলে এখান থেকে বাড়ি যাই।

হেসে ওঠে রেবন্ত। বলে— আমাদের জন্য তুই শহিদ হবি মনু? ইউ গুডি গুডি বয়!

মনন বলল— কথাটা বুঝলাম না নটি বয়!

— বুঝবি না-ই তো। দেখা গেল রেবন্তর এই কথায় নবদিশা আঁচলে মুখ চেপেছে।

মনন দাঁড়িয়ে পড়ে বলল— কীটা?

রেবন্ত দাঁড়ায়। দাঁড়ায় নবদিশাও।

রেবন্ত বলল— ডাইরেক্টরের অর্ডার ক্যারিআউট না করলে কী হয় জানিস না?

মনন হেসে বলল— দ্যাট'স ইট। অর্ডার ওবে করলাম তো। তোরা এবার যা।

নবদিশা বলে উঠল— না। মনুদা, তুমিও চলো। তিনজনে যেতে ভালো লাগছে, চলো।

মনন বলে— বেশ, চলো।

ওরা আবার একইভাবে যাচ্ছে। একটু পরে মনন বলে— এই রেবন, এক কাজ করলে হয় না?

— কী?

— তুই ওকে সাইকেলে নিয়ে নে। আমিও সাইকেলে উঠি। সাঁ করে চলে যাই।

— অ্যাঁ? বলছিস? তুই-ই নবিকে নিয়ে নিতে পারিস।

নবি বলল— এই! কাউকে নিতে হবে না। চলো, চলো। একটু না হয় দেরি হবে।

বউ কি বকবে, মনুদা?

— আমার বউ বকে না। রেবনের বউ— জানি না।

রেবন্ত গুন গুন করে গান ধরল— আমার— ই-ই-য়া-আন বাড়ি যায়, আ মারি আঙিনা দিয়া—

তিনজনেই হাসে।

এভাবেই চলছিল। মহড়া হচ্ছিল। আমি বেশ কয়েক দিন যাইনি। যেতে হয়েছিল অন্য একটি গ্রুপে, মিউজিকের কাজ ছিল। ওখান থেকে ফিরে আসার পরে গেলাম।

মহড়ার শেষে বেহালাটা গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। মনন সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল নিচু গলায়— সঞ্জুদা, কাল বাড়ি আছেন সকালে?

বললাম— হ্যাঁ থাকব। কেন গো?

— আমি আসব?

— নিশ্চয়ই। জিজ্ঞাসা করতে হবে নাকি? তুমি যখন ইচ্ছে চলে আসবে। আমাদের কথাগুলো কারও কানে গিয়েছে বলে মনে হয়নি। দেখলাম নবদিশা দাঁড়িয়ে আছে দূরে দরজার কাছে। প্রমিতা তার ব্যাগ গুছোচ্ছে এবং আমাকে ও মননকে লক্ষ করছে। অম্বরিষের গলা শুনতে পাচ্ছি বাইরে রোয়াক থেকে। প্রমিতার দিকে আর একবার তাকালাম উঠে দাঁড়িয়ে বেহালাটা কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে। দেখলাম ও দাঁড়িয়ে শাড়ি ঠিক করতে করতে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। কিন্তু মননের দিকে চেয়ে ওর চোখদুটো বড় হল, সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও ভারী হল। এটা দ্রুত ঘটলেও আমার নজর এড়ায়নি। প্রমিতা বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি, নবদিশার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওকে একবার, আমাদের একবার, দেখে নেয় ত্বরিত নজরে। মনন ও নবদিশা বেরিয়ে যাচ্ছে।

রোয়াক থেকে রাস্তায় নেমে আমার পা কেন যেন থেমে গেল, মুখ তুলে দেখলাম প্রমিতার রিকশাটা চলে যাচ্ছে। একটা খালি রিকশা দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকলাম। ও দাঁড়িয়েছে, উঠে বসলাম। সব কি ঠিক-ঠাক করলাম, রিকশায় উঠে ভেবে দেখলাম— যা দেখলাম, সবই কিন্তু অন্যমনস্কভাবে। তবে প্রমিতা যেন মনটাকে একটু টানল।

অন্যমনস্কতা কি কোনও অসুখ? শরীর ও মনের দুই ডাক্তারদেরই বলতে শুনেছি— রোগ-অসুখ হল মাত্রার ব্যাপার। মাত্রার বাড়তি ও কমতির পরিমাণের ওপরেই ঠিক হয় সেটা রোগ কিনা। লোকে আমাকে ভাবুক বলে। কথাটা নিন্দার, না প্রশংসার, সেটা তো ঠিক হয় কথাটা কেমন করে উচ্চারিত হল তাই দিয়ে। আমার ভরসা আছে এ-টুকুই— আমি অন্যমনস্কতাটাকে অচিরে ধরতে পারি।

সকালে মনন এল, কোনও ভূমিকা না করেই বলল— আমি পারছি না, সঞ্জুদা।

— কী হল? ওকে দেখতে লাগলাম।

গড়গড় করে মনন বলে গেল— অম্বরিষের কথামতো ও নবদিশাকে বাড়ি ফেরার সময়

এসকর্ট করছিল। কিন্তু মাঝপথে রেবন্ত এসে রেগুলার নবিকে প্রায় হাইজ্যাক করে। অদ্ভুত কায়দায় ওরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে তার চেয়ে পেছিয়ে যায়। মনন স্লো হাঁটার চেষ্টা করে, ওরাও তাই করে। ফিরে ফিরে ওদের লক্ষ করাটাকে মনন বিলো দ্য ডিগনিটি মনে করে। সে কখনও কখনও পিছনে তাকাবার ছল-ছুতো করেনি তা নয়। পলকে তাকিয়ে নিয়ে দেখেছে— সাইকেল থাকে তার ডানদিকে ও নবি থাকে বাঁদিকে। ওরা এত ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটে যে, রেবন্তর বাঁহাতটা— মনন আর বলতে পারেনি। তবে অনিবার্য কৌতূহলে মননের কানদুটো তখন প্রচণ্ড সজাগ হয়ে যায়। এটা আড়িপাতা হয়ে থাকলে তার কিছু করার নেই।

কথাগুলো শুনে হাসলাম। বুঝলাম লোভটাকে সামলে রাখতে পারে না বেচারা মনু। ওটা কঠিন।

তারপর অবাক হয়ে শুনলাম রেবন্ত বিভিন্ন দিনে যা বলেছে— বেচারা!... দালালি করছে ডাইরেক্টরের। ... মজা পেয়েছে, না! ... দাঁড়াও, এমন করব, লজ্জায় আসবে না আর... নবি বলেছে— এই! খবরদার না। ... ও অম্বুদাকে রিপোর্ট করে দেবে... অলরেডি দিচ্ছে না তো? ... যাও না, মিতাকে এসকর্ট করো না, আমাদের পিছনে কেন? ... মিতা তো সেদিন বলল— আ-মা-র সঙ্গে একটু যা-বে মনুদা?— বলতে বলতে নবদিশা হেসেছে। শুনতে পেয়েছে মনন। শুনে বললাম— তোমাকে মিতা কখনও সঙ্গে যেতে বলেছিল নাকি?

মনন বলল— হ্যাঁ। মিতা একদিন দাঁড়িয়ে ছিল, রিকশা পায়নি, তাই ওর কথায় আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। নবি এগিয়ে যাচ্ছে। তখনই একটা রিকশা আসছে দেখা গেল। দেখে মিতা কেমন অদ্ভুতভাবে বলল— যা-ও, যা-ও— তোমার ওই না-ইট ডি-উটি ফেল কোরোনা! ডা-ইরেকটর ম-শয় মা-রবে।

প্রমিতার কথাটাকে তার অদ্ভুত লাগল কেন জিজ্ঞেস করতে মনন চুপ করে গেল। মাথা নিচু করে নিয়েছে। কৌতূহলে আবার জিজ্ঞেস করলাম। মনন বলল— মানে, ওর কথাটা বিদ্রুপ, নাকি ধিক্কার বুঝতে পারিনি দাদা। আমার খুব— মনন থেমে গেল।

একটু পরে বলল ও— তারপর থেকে রেবন্ত মাঝরাস্তায় এসে জুড়ে গেলেই আমি সেখান থেকে চলে আসতাম। কী করে অম্বুদা সেটা জানতে পেরেছেন জানি না। আমাকে পরশুদিন যা-তা বললেন। অবশ্য আলাদা ডেকে নিয়ে।

— কী বলেছে অম্বু?

— ওঁর কথা জানেন তো। আগে শিল্পীদের ডিসিপ্লিন, সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি— এইসব নিয়ে একগাদা কথাবার্তার পরে বললেন— আমার মনে হচ্ছে, তোমার ওপর ভরসা করা ঠিক

ব্যাপারটা নিয়ে এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই। ওরা হয়তো কিছুটা রাস্তা গল্প করতে করতে হাঁটে। ওই নবদিশা মেয়েটি ভালো পরিবারের। সরকারি চাকরি করে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে। তোমাকে বোনের মতো বলছি, ওটা নিয়ে অত চিন্তা কোরো না।

হয়নি। আমার মনে হয়েছিল, তুমি একজন কনশাস ছেলে, তোমার মানসিকতার মধ্যে একটা ডেপথ্ আছে। নাঃ! ইউ আর অল অ্যালাইক। ঠিক আছে, তোমাকে আর যেতে হবে না। মনন থামল। বুঝলাম ও খুব আহত হয়েছে, হওয়ার কথাই। ওকে সান্ত্বনা দিলাম না। তাতে ওর কষ্টটা বাড়ত। বললাম— মনু, আমি তোমাকে কোনও জ্ঞান দেব না। ঠিক করেছ তুমি, কোনও অন্যায় করনি। রেবন এসে যাওয়ার পরে বাড়ি চলে আসতে, ঠিকই করতে। ওদের সঙ্গে ওভাবে যাওয়া খুব অরুচিকর। এখন তোমার দায় নেমে গিয়েছে ঘাড় থেকে। অম্বরিষের কথাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। শোনো, আমার কথাটা বলি, বলে রাখি, তোমার সুবিধে হবে। এটা নিয়ে অম্বরিষকে মাথা ঘামাতে বারণ করেছিলাম। ও শোনেনি। বলেছিলাম— এর মধ্যে ক্লাবকে ইন্‌ভল্‌ভ কোরো না। তুমি ইন্টারভেন করলে জড়িয়ে যাবে। ওদের ওটাকে প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দেখো, উদাসীন থাকো। কারও পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ এলে তখন গুরুত্ব ওজন করে ব্যবস্থা নেবে। ও শোনেনি। এখন দেখো, কী ঘটে।

একটু পরে মনন বলল— কিন্তু দাদা, আমি রেবন ও নবির ইয়েটা, মানে— মননকে বলতে দিলাম না, আমি বললাম— ওদের রিলেশনটা তো? হ্যাঁ সন্দেহজনক। কিন্তু আমি ভাবছি, তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার ওরা করল কেন? এত বাজেভাবে বোল্ডনেস দেখিয়ে ওদের অ্যাফেয়ার্সের কথা জানিয়ে দিল? নাকি এটা ক্যামোফ্লেজ? যাক গে, ছাড়ো। এসব চর্চা পছন্দ করি না। ফালতু জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাকে, আমার খারাপ লাগছে। তাই কথাগুলো বললাম।

অতঃপর কিছুদিন অম্বরিষকে নাটক নিয়ে মগ্ন থাকতে দেখলাম। আমি আরও দুটি নাটকের গ্রুপে আমার প্রোগ্রাম নিয়ে যাওয়া-আসা করছিলাম। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি, খুশিও হয়েছি।

কয়েক দিন বাইরে কাটিয়ে ফিরেছি। গ্রুপে যাইনি সেদিন। পরের দিন সকালে সুধাকর হাজির হল। ওর মুখে রিপোর্ট শুনে আমি থ।

তিন-চারদিন আগে রেবন্তর স্ত্রী গিয়েছিল সুধাকরের বাড়ি। অনেক কেঁদেছে ওর কাছে। বলেছে— আপনাদের এর একটা বিহিত করতে হবে। আমার স্বামী নাটক করতে ভালোবাসে, আপনাদের ক্লাবের মতো ভালো জায়গায় অভিনয় করে, আমরা খুশি। আমি এই শহরেরই মেয়ে। আপনাদের অনেকজনকে ভালোভাবে চিনি। আমার বাবা নেই, দাদা ও বোন, মা আছে। ওরাও খুশি। কিন্তু যা শুনতে হল, মুখ তুলে কথা বলতে পারছি না। আপনাদের ক্লাবে এত লোক, নিশ্চয়ই সব ওদের জানাজানি হয়েছে। ওঃ! গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে! আমার বাবার বাড়িতে কেউ জানে না, আমি বলিনি। জানলে কী যে হবে, দাদা! ওই মেয়েটার সঙ্গে বেশি ইয়ে কেন? ওকে রাতে কেন সঙ্গে যেতে হবে? কেন অন্যদিকে অতখানি রাস্তা দৈনিক হাঁটতে হবে? মেয়েটিও তো সরকারি চাকরি করে। রিকশায় যাতায়াত করছে না কেন? কেন আপনারা ওকে রাতের বেলা— রেবন্তর বউ কেঁদে ভেঙে পড়ল।

সুধাকর বলল— রেবনের বউকে বুঝিয়ে বললাম, ব্যাপারটা নিয়ে এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই। ওরা হয়তো কিছুটা রাস্তা গল্প করতে করতে হাঁটে। ওই নবদিশা মেয়েটি ভালো পরিবারের। সরকারি চাকরি করে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে। তোমাকে বোনের মতো বলছি, ওটা নিয়ে অত চিন্তা কোরো না, আমরা দেখছি। ঠিকঠাক থাকবে। মেলামেশা তো হতেই পারে। তবে কোনও অন্যায় আমরা বরদাস্ত করব না, এটা তোমাকে বলে দিচ্ছি।

কিছু বলতে পারলাম না, একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবতে শুরু করেছিলাম। কেন ভাবনাটা মনকে ঘিরে ধরল বলা মুশকিল। ভাবছিলাম— মনের প্রবৃত্তি ও বিকারের সঙ্গে মানুষের বোধের— সেটা জীবনবোধ বা আদর্শবোধ যা-ই হোক না কেন, বিরোধ কি হয় না? মন বলল— হয়তো হয়, হয়তো হয় না।

সুধাকরের গলা কানে এল দুবার, শেষেরটা জোরে।

বললাম— অ্যাঁ? সুধা, কী বললে?

— ও, আপনি ভাবছিলেন?

— ওই আর কী। বলো।

— বলছিলাম কী, রেবনের বউকে এটা জানাল কে? ও নিশ্চয় রেবনের পিছনে নিজের লোক লাগিয়ে রাখেনি।

— হুঁ। এটা জানতে হবে। আগে এটাই জানা দরকার। তবে—

— সঙ্গে জানা দরকার রেবন ও নবির সম্পর্কটা কোন স্টেজে পৌঁছেছে।

— ওটা জানা সহজ। কঠিন হল ভগ্নদূতটি কে, সেটা জানা। রেবনের বউ ওটা বলবে না।

— ঠিক। রেবনের বউ কিছুতেই বলল না, অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি। বলেছি, তোমাকে অনেক কথা রাঙিয়ে বাড়িয়ে বলতে পারে তো কেউ, নামটা বলো।

ও শুধু বলল, আপনারা জেনে যাবেন দাদা, আমাকে বলতে বলবেন না।

— ব্যস। আর কী বলবে! সুধা, তুমি তো সংগঠনের সম্পাদক, তুমি দু'একটা ভগ্নদূত তৈরি করো। পার না? নইলে সংগঠন চালাবে কী করে? যে-কোনও সময় তোমার পদটা হাইজ্যাকড্ হয়ে যাবে।

সুধাকর হেসে উঠে বলল— হয়েই আছে। দেখুন সঞ্জুদা, আপনি ওই ইয়ে খাতায় লেখা, ইয়ের পদটার নাম ধরে বলবেন না। বাপের দেওয়া নামটা নিয়ে বললে মিষ্টি লাগে।

হা-হা করে হাসলাম। বললাম— মনুর সঙ্গে তোমার মনের মিল পাই। ও— হ্যাঁ, শোনো সংকর্ষণকে রেবন্ত-নবদিশা ও মননের বৃত্তান্তটা বললাম।

শুনে সে বলল— আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না।

— সেই জন্যই তো বললাম, আমাকে সম্পাদক বলে ডেকে লজ্জা দেবেন না।

— ডাকব। ডাকব সকলকে শুনিয়ে। অপোগন্ড মেম্বারদের বয়রা-কানের তালা খুলে দেওয়ার জন্য ডাকব।

— দাদা, সবাই পোগন্ড নয়, জে এম টি টি। তালে হুঁশিয়ারদের কানের তালা ছুঁতে পারবেন না।

— আমি মনে করি, রেবনরা মনুর সঙ্গে যে ব্যবহারটা করেছে, সেটা করেছে রাগে, তোমার ডাইরেক্টরের বেয়াড়া বাড়াবাড়ির জন্য। ওদের লক্ষ্য মনু নয়। শোনো সুধা, যদি আমার কথা নাও, আমি বলি— তুমি কিছু করবে না। চুপচাপ লক্ষ করে যাও, কী ঘটে।

— হ্যাঁ, দাদা। আমি ভাবছি, নবি ও রেবনকে কী করে বলা যাবে। কে বলবে যে, তোমরা ফ্রেন্ডশিপ করো, কিন্তু পরিবেশকে কেয়ার করে চলো, ডিগনিটি রক্ষা করো। রাতে নবির সঙ্গে নাই-বা গেলে! দেখলাম সুধাকর খুব ভাবছে।

হেসে বললাম— এইজন্যই তো বলি একটা চামচা বানাও ওই তবলার মতো।

'তারকা'র নাটকে মিউজিকের ভার এমনিতে অনেকটাই বেশি। তার ওপর একটা গান আছে। তাছাড়া আমার খাটুনি খুব বাড়ে, যখন আমাকেই যন্ত্রপাতি নিয়ে 'শো' তে হাজির থাকতে হয় নির্ধারিত যন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে। অনেকগুলি যন্ত্রের যন্ত্রী হওয়ার বিড়ম্বনা।

— তবলা? হো হো করে হেসে উঠে সুধাকর বলে— অ'তপা! তপোব্রতবাবু!

দ্য গ্রেট ট্রেজারার অব তারকাপুঞ্জ ক্লাব!

এবারেও বাইরে থেকে ঘুরে এসে যা শুনলাম, তাতে একটু ভাবনায় পড়লাম। প্রমিতা এই ব্যাপারটাতে ঢুকল কেন? অবাক লাগছে— অম্বরিষ রাগ করবে জেনেও ও এমন কথা বলেছে! কেন? প্রমিতাকে নিয়ে তাহলে অন্যরকম ভাবতে হচ্ছে। ওর সম্পর্কে অম্বরিষ সুযোগ পেলেই নানা প্রশংসার বহু-ব্যবহৃত বচনে বিশেষণের মালা গাঁথতে শুরু করে। ওর হুঁশ থাকে না গ্রুপে আরও কয়েকজন মহিলাশিল্পী আছে। হ্যাঁ, ওরা কেউ ওর মতো শ্রীময়ী নয় ঠিকই, কিন্তু অভিনয়ে দক্ষ। অম্বরিষ বলে থাকে— প্রমিতা অভিনয়ে এক-এক সময় নাট্যকার-নির্দেশক হিসেবে আমাকে চমকে দেয়... অল্প সময়ে এমন গ্রহণ করার ক্ষমতা! ওয়ান্ডারফুল।... আমি তো আমার কলকাতার বন্ধুদেরও বলি— আমি আমার টিমে এক শিল্পী-রত্ন পেয়েছি। ... ও আমার মানসকন্যা... আমার কন্যাসমা ভগিনী... ইত্যাদি।

সুধাকরের কাছে প্রমিতার কথাগুলি শুনলাম। মন্তব্য না করে শুধু হাসলাম। প্রমিতার মুখে এই উচ্চারণ কেন ঘটল, সেটা জানতে হবে আগে। আমি যে এ-ব্যাপারে শুধু কৌতূহলী নই, সক্রিয় হয়েছি— এটা এখনই সুধাকরকে জানাতে চাইলাম না। উদাসীনতার ভান করলাম।

...মনুদার মতো মানুষ, যে কারও ব্যক্তিগত সাতে-পাঁচে থাকে না, পরচর্চা করে না, এমন সুশীল একটি ছেলেকে— এটা ভারি খারাপ হয়েছে। মনুদাও নিশ্চয় অপমানিত হয়েছে, না হলে যাওয়া বন্ধ করল কেন? ও তো বাজে অভিযোগ করার লোক নয়। আমাদের ডাইরেক্টরের নেই-কাজ-তো-খই-ভাজের দশা হয়েছে! খুব নবির প্রতি দরদ।

... প্রমিতা এমন কথা বলেছে! সাবাস প্রমিতা! মনে মনে বললাম।

মনন নবদিশার সঙ্গে যাওয়া বন্ধ করেছে— এটা জানা বা লক্ষ করা মোটেই কঠিন কিছু নয়, অনেকেই জেনেছে। মননকে তিরস্কার ধমক খেতে হয়েছে অম্বরিষের কাছে, এই খবরটা নিশ্চয়ই প্রমিতা পেয়েছে? তাতেই কি ওর মনে রাগের জন্ম? তার ফলেই কি অম্বরিষের প্রতি এই উষ্মা? কথাগুলি যে ঠিক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে মননের খোলা প্রশংসা এবং গড-ফাদারের ওপর তার বিরক্তি। প্রমিতা আমাকে টেনে নিয়ে গেল অন্য জায়গায়। নবদিশার ওপর অম্বরিষের ইয়ে, প্রমিতার ভাষায়, দরদ নিয়ে ওর অসূয়া স্বাভাবিক। রেবন্তর বেহায়াপনায় প্রমিতার ক্ষোভ অমূলক নয়। একান্ত শ্রদ্ধার মানুষ অম্বরিষ এ-হেন ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে পড়ুক— এটা প্রমিতার মনঃপূত না হতেই পারে। কিন্তু যেখানে এসে আমার ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে, তা হল মননকে নিয়ে প্রমিতার সাবলীল উচ্চারণ।

সময় এমনি করেই চলতে থাকল। এমন কিছু ঘটল না, যা আমার ভাবনাটুকুর জট খুলে দেবে। অবশ্য আস্তে আস্তে সেটা গুরুত্ব হারিয়ে আড়ালে চলে গেল। দু'তিন মাস কেটে গেল। নতুন নাটক তৈরি হয়ে গিয়েছে, প্রিমিয়ার শো হয়েছে, স্থানীয় ছোট বড় সাময়িক পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে। নাটকের প্রশংসা হয়েছে। প্রশংসা হয়েছে মিউজিকের। ওটা আমারই। অম্বরিষেরও হয়েছে পরিচালক হিসেবে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে স্থানীয় দু-একটি ও কলকাতার দু-একটি সাময়িকীতে। বড় দৈনিক পত্রিকায় অ্যাড দেওয়ার প্রশ্ন নেই, পয়সা কোথায়! যাই হোক, এর মধ্যেই দু-তিনটি কল-শো হয়ে গেল। 'তারকাপুঞ্জ'র নাটক ফাইনাল হয়ে যাওয়ার পরে আমাকে চলে যেতে হয়েছিল অন্য একটি টিমে। এটা একটু হালকা কাজ।

'তারকা-পুঞ্জ'র নাটকটার চেয়ে এটা ছোট নাটক। 'তারকা'র নাটকে মিউজিকের ভার এমনিতে অনেকটাই বেশি। তার ওপর একটা গান আছে। তাছাড়া আমার খাটুনি খুব বাড়ে, যখন আমাকেই যন্ত্রপাতি নিয়ে 'শো' তে হাজির থাকতে হয় নির্ধারিত যন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে। অনেকগুলি যন্ত্রের যন্ত্রী হওয়ার বিড়ম্বনা। এজন্য অন্য টিমগুলি আলাদা রেটে ভালো সম্মান-দক্ষিণা দেয়। কাউকে কিছু বলতে হয়

না, ওটা নির্ধারিত। 'তারকাপুঞ্জে'র ব্যাপারটা আলাদা, এখানে রেটের ব্যাপার নয়। আমি এখানে অ্যাসোসিয়েট, মানে চাঁদা ও ভোট না দেওয়া মেম্বার, এদের সঙ্গে সম্পর্কটা মেম্বারের চেয়ে বেশি। কমিটি মিটিংয়েও আমন্ত্রিত হয়ে প্রায়ই থাকতে হয়। বিমান আমার নাম দিয়েছে বিবেক-মেম্বার।

বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা, বাউল ও ঝুমুর গানের কিছু সুর সংগ্রহ ও তার রূপান্তরীযোগে কিছু গান তৈরির কাজ নিয়ে অনেকদিন গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ কমাতে হয়েছিল। এর মধ্যে একটি বড় ক্ষতিকর কষ্টের ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। যদিও এই সময়ে বাংলার নাটকের জগতে এমনকিছু গৌরবের জিনিস ঘটেছে, যা আমার কাছে ও আমার ভালোবাসার নাট্যগোষ্ঠীর কাছে নতুন আলো। সেই আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করে চিত্ত।

সে-কথা বলা যাবে পরে। এখন একটি ঘটনার কালো ছায়া এসে 'তারকাপুঞ্জ'র ওপর জমা হয়েছে। সেই কথাটি না বলে অন্য সুখের কথায় যেতে মুচড়ে যাওয়া মনটা রাজি হচ্ছে না মোটেই। সুখের কথা ভালো করে বলার জন্য তোলা থাক। ওই স্ববিনাশী কালো ছায়াটির কথা বলে হালকা হই। প্রকাশ্য বিলাপ দুঃখকে কমিয়ে দেয়।

কথাটি রেবন্ত-নবদিশাকে নিয়ে যে নাটিকাটি, তার শেষ দৃশ্যের। বলা যায় অম্বরিষের এখনকার 'আঁধারের মুখ' নাটকটির ভিতরের নাটক।

নাটকটিতে অম্বরিষের মুন্সিয়ানা দেখে এবারে আমার মন ভরে গিয়েছিল অনেকটা। গ্রুপের মেম্বার ও শিল্পীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরছে, নাটকের কথা বলছে। শহরে দর্শকদের মধ্যে অনেকের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তারা এক আলম্বনে দাঁড়িয়ে জীবনের ক্ষোভ জানাবার ভাষা পেয়েছে ওতে। সমাজের নানা কোষ্ঠে যারা আলো ঢুকতে দেয় না, যারা সেই আঁধারে চলাফেরা করার জন্য মানুষরূপী সরীসৃপদের অলিগলি বানিয়ে রাখে, তাদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার ভাষা পেয়েছে মানুষ। সেই অন্ধকারের গলি ও খোপগুলিকে নিরক্ষর বা স্বল্প-সাক্ষর মানুষরাও চিনতে পারবে এই নাটকটি দেখলে। তবু বলতেই হচ্ছে— ওহে নাট্যকার, আমার মনের খিদে যে মিটছে না। সেই দিকে তোমার মুন্সিয়ানাতে শান দেওয়ার চেষ্টা দেখতে পাওয়া গেল না। তুমি জান, আমার সেই খিদেটা হল শিল্পের, সৃষ্টির শিল্পীত শানিত মুখের। তা নাহলে ধারে কাটা যাবে না ওই আঁধারের চতুর সরীসৃপদের লুকনো হাত-পাগুলোকে যা দিয়ে ওরা আলোর পথ আটকে রাখে। সেই পুরনো ছাঁচ, পুরনো ভাষার ভারে ও বাঁধনে আটকে

বোঝা যায়— ওর ভিতরকার অঙ্গগুলি শিকারি গঙ্গাফড়িংয়ের লম্বা পা, শুঁড়ের ডগার চোখ ও ডানা নিয়ে ছটফট করছে। এমনিতে মাংসাশী গঙ্গাফড়িং তার লম্বা লম্বা পাগুলি গুটিয়ে রাখে সুন্দর নিরীহভাবে— মনে হয় স্নানের সময় মানুষের মতো গঙ্গাস্তব করছে।

আছে, তোমার কলম। ওরে অম্বরিষ, তাই তো আমার বাঁশির উন্মুখ আবহ পরম ছন্দে, লয়ে ও মূর্ছনায় পাখনা ওড়াতে পারছে না। তোমার নাটকের চরিত্রের মধ্যে তোমাকে এত দেখতে পাই কেন হে স্রষ্টা? শিল্প-মাধুরীতে ওরা জন্ম নিক, ওরা স্বাবলম্বী হয়ে, সমাজ-নির্ভর হয়ে আপন আপন ভাষায় কথা বলুক। ওরা কেন তোমার দাঁড়ের ময়না হয়ে থাকবে, হে নাট্যকার?

এই হল আমার মনের বেগোছ, কী বলতে গিয়ে কোন কথায় চলে যাই। এক কালো ছায়ার কথা বলতে গিয়ে, অন্য বড় আঁধারের কথা বলতে লাগলাম। তবে দেখলে দেখা যাবে— ওই কালো ছায়াটি হয়তো-বা বিসারিত বড় অন্ধকারেরই কোনও দ্রষ্ট প্রত্যঙ্গ। আমার ভাষাটা কড়া হয়ে গেল? তা হোক, আপনজনকে এভাবেই বলা দরকার। অম্বরিষের কাছে আমার যে দায়ের বাঁধন বেশি, ওর অনেক কিছুর শরিক আমরা।

এই নাটকে রেবন্ত একটি পছন্দের চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছিল, যাতে সে নবদিশার সহ-অভিনেতা হতে পারত। নবদিশাও নাকি চেয়েছিল। দু'জনেই চাইছে! পছন্দসই রোল চাই? কেন? অম্বরিষ যেন এক প্রেয়িং ম্যান্টিস, গঙ্গাফড়িংয়ের মতো ক্ষিপ্র হয়ে উঠল। ওর ক্ষিপ্রতার দেখনদারিটা বাইরে কম, ভিতরে বেশি। বোঝা যায়— ওর ভিতরকার অঙ্গগুলি শিকারি গঙ্গাফড়িংয়ের লম্বা পা, শুঁড়ের ডগার চোখ ও ডানা নিয়ে ছটফট করছে। এমনিতে মাংসাশী গঙ্গাফড়িং তার লম্বা লম্বা পাগুলি গুটিয়ে রাখে সুন্দর নিরীহভাবে— মনে হয় স্নানের সময় মানুষের মতো গঙ্গাস্তব করছে। তখন দেখতে বেশ লাগে। এমনিতে অম্বরিষের আটপৌরে ওঠা-বসা হাঁটা-চলা কথা বলা বেশ। আমি মনে করি, আমার চেয়ে ভালো।

নাটকের কোনও চরিত্র কোনও শিল্পীর বেশি ভালো লাগতেই পারে। তার ভালো লাগাটা কারও কাছে জানাতে পারে। এরমধ্যে মন্দ কিছুই নেই। বরং অভিনেতার আপন সৃষ্টিশীলতার নিরিখে তার ইতিবাচক দিক আছে, যা তাকে প্রাণিত, উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু কাকে দিয়ে কোন চরিত্রে অভিনয় করাবে, সেটা পরিচালকের একান্ত অধিকার, তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। পরিচালক এ বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করবে কিনা, কারও পরামর্শ নেবে কিনা, সেটা তার বিবেচনা। প্রত্যেক শিল্পী তা মেনে নেবে— এটাই অভিপ্রেত।

এই নাটকের ব্যাপারে এই নিয়মের কোনও ব্যত্যয় ঘটেছে, এমন কথা শোনা যায়নি।

তবু রেবন্ত ও নবদিশাকে আলাদা আলাদা ডেকে ধমকানোর দরকার কেন হল, সেটা আমার নয়, যারা ব্যাপারটি জেনেছে, তাদের কারও মাথায় ঢোকেনি। তাছাড়া, যেটুকু কথা বললেই চলে, সেটুকু বলেই অম্বরিষের তৃপ্তি হতে দেখেছি কম। এবারেও শুনেছি, নীতি ও আদর্শের আদেশ-উপদেশের সঙ্গে রীতিমতো ধমকবর্ষণ করা হয়েছে। ওদের মেলামেশা নিয়ে অনেক শ্লেষ উচ্চারণ করা হয়েছে। কোনও সৌজন্যের সীমা মানা হয়নি— রেবন্ত ও নবি দুজনেই ভীষণ কষ্টে জানিয়েছে। সুধাকরের রিপোর্ট হল, ক্ষোভ মুখে যা প্রকাশ করতে পেরেছে, ওদের ভিতরে জমা হয়েছে অনেক বেশি।

যারা জানতাম— অনেকেই এ-সব ব্যাপার জানে না, জানতে পারে না— যা আশঙ্কা করছিলাম, সে-রকমই হতে থাকল। রেবন্ত ও নবদিশা বেপরোয়া হয়ে উঠল। ওদের যাওয়া-আসা অনিয়মিত হল। মহড়া থাকলেও কখনও কখনও আসত না। দু'জনের ঘোরাফেরা ও সিনেমায় যাওয়া বেড়ে গেল। এখানে গেলাম, ওখানে গেলাম দু'জনে— এই গল্প নিজেরাই শোনাতে শুরু করল মেম্বারদের কাছে। অম্বরিষ শহরের একটি স্কুলের শিক্ষক। সময়মতো স্কুলে না-যাওয়া, হামেশাই অনুপস্থিত থাকার ব্যাপারে অম্বরিষের দুর্নাম ছিল অনেক। মেম্বারদের মুখে শোনা যেতে লাগল— রেবন্ত ও তার কয়েকজন বন্ধু নাকি ওই স্কুলের কমিটি-মেম্বার, শিক্ষক, এমনকী অভিভাবকদের কাছে অম্বরিষের নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। রেবন্ত এই শহরেরই ছেলে। অবাক হওয়ার জিনিস হল— রেবন্তর স্ত্রী এখন কারও কাছে কোনও আর অভিযোগ করছে না। কেন? চোখ বুজে ভাবতে বসলাম। কখন মগ্ন হয়েছি।

হঠাৎ একটা মুখ ভেসে উঠল। ভালো করে দেখতেই বুঝলাম ও তপা। তপা এর মধ্যে? চোখ খুলে বুঝে নিলাম— পিছনে অবশ্যই আছে অম্বরিষের মুখ। ইতিমধ্যে অম্বরিষ অন্য একটি ছেলেকে দিয়ে রেবন্তর রোলটির মহড়া করিয়েছে আলাদাভাবে।

সুধাকর ও আমি এ নিয়ে আর কিছু বলব না ঠিক করে নিলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম— ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। এ নিয়ে আর কথা বলা নিরর্থক। সালিশি করার সুযোগ পেলে আমি মজা পাই। সেই মজাটা এখন ছাড়তে হল।

কিছুদিন পরে একটি কল-শো-এর প্রস্তাব হল। সুধাকরকে অম্বরিষ বলল— সুধা, শো-টা আমরা নিচ্ছি জানিয়ে দে। পার্টি এসে বুক করে গেল। শো-এর কয়েক দিন আগে পুরো মহড়া হয়েছে। সেই মহড়ায় রেবন্তকে ডাকা হয়নি। ছিল নতুন ছেলেটি।

শো-এর দু'দিন আগে নবদিশার বাড়ি থেকে খবর এল— সে অসুস্থ, তার পক্ষে এই শো করা সম্ভব হবে না, ডাক্তারের নিষেধ।

গ্রুপে প্রায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হল। কোথা থেকে একটি মেয়েকে আনিয়ে দু'বেলা মহড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'শো' হল। জানা গেল, এই শোতে গ্রুপের সুনাম নষ্ট হয়েছে।

অম্বরিষকে দেখলে বোঝাই যায় ও ভিতরে জ্বলছে। তার চাকুরির জায়গায় দুর্নাম রটানো, তার নাটকের সুনাম নষ্ট করা— দুই অপরাধে অপরাধী রেবন্ত। নবদিশার ব্যাপারে ও সাবোটাজ করেছে। প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে কমিটির মিটিং ডাকতে বলা হল সুধাকরকে।

সভায় অম্বরিষ ঘোষণার মতো বলল— রেবন্তকে সমস্ত নাটকে অভিনয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা এবং সংগঠনের সদস্য হিসেবে তিনি থাকবেন কিনা সকলে বিবেচনা করুন। অম্বরিষের কথাগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের সুগন্ধ আছে। কিন্তু উপস্থিত কমিটি-সদস্যদের কাছে পরিচালকের মনের অধিপতি অভিপ্রায়টি স্বচ্ছ। প্রস্তাব তিনি দেননি যে, রেবন্তর সদস্যপদ বাতিল করা হোক। তবু কেন চিরাচরিত প্রস্তাবটি কেউ দিতে পারল না যে, রেবন্তকে এই বিষয়ে তার বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হোক। সুধাকরের রিপোর্ট হল— সেদিন মিটিংয়ে পরিচালকের মুড অবধান করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেবন্তকে সংগঠন থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। আমাকে ওই সভায় আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে ডাকা হলেও আমি যাইনি। নিরাপদ দূরত্বে নাকি থাকতে চেয়েছি— অনেকে বলেছে। সেটা মেনে নিতে আমার অসুবিধে নেই। অনেক সময় আমি এটা চেয়ে থাকি। ওইরকম সভায় থাকলে, আমার যা

মনে রাখবেন, আমরা নিছক একটা সখের নাটুকে দল নই। আমরা সমাজ-পরিবর্তনের কাজে দীক্ষিত। ব্যক্তিক অধিকার তার পাওনার জন্য হাত পাতবে। আর সংগঠনের অধিনায়ক কি এভাবে অজুহাতকে হাতিয়ার বানিয়ে সেই হাত কাটতে চাইবে? স্রেফ আপন-পোষণের লিপ্সায়? এই জিনিসকে মান্যতা দেওয়ার বা সহনের অভ্যাসের জীবাণু যদি ছড়ায় সংগঠনের শরীরে, তার পরিণাম কী? এই প্রশ্নগুলো অহরহ গুঁতোবেই।

স্বভাব সেটাই করে ফেলতাম— বলে ফেলতাম, রেবন্তকে একদিন পুরো কমিটির সভায় অথবা পরিচালক-সহ দু'জন কমিটি-মেম্বারের কাছে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা হোক, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। সুধাকরের রিপোর্ট অনুসারে পরিচালকের মুড সেদিন যা ছিল, তাতে এমনতর টালবাহানার বায়নাক্কাকে সে সাবোটাজ বলেই ধরে নিত। অম্বরিষ নিশ্চয় তার স্বভাবসুলভ ভাষ্যে বলত— সিদ্ধান্তগ্রহণে এই দুর্বলচিত্ততা আমাদের সংগঠনে যদি বীজাণু ছড়ায়, তার পরিণাম বাঙালিদের অন্য পাঁচটা ক্লাবের মতো হতে বাধ্য। আপনারা কি তাই চান? মনে রাখবেন, আমরা নিছক একটা সখের নাটুকে দল নই। আমরা সমাজ-পরিবর্তনের কাজে দীক্ষিত। এসব শুনে আমি তো চুপ করে থাকতে পারতাম না। ব্যক্তিক অধিকার তার পাওনার জন্য হাত পাতবে। আর সংগঠনের অধিনায়ক কি এভাবে অজুহাতকে হাতিয়ার বানিয়ে সেই হাত কাটতে চাইবে? স্রেফ আপন-পোষণের লিপ্সায়? এই জিনিসকে মান্যতা দেওয়ার বা সহনের অভ্যাসের জীবাণু যদি ছড়ায় সংগঠনের শরীরে, তার পরিণাম কী? এই প্রশ্নগুলো অহরহ গুঁতোবেই। সেই গুঁতোনি খেয়েও মনের কষ্টে উঁঃ আঁঃ করব না এমন কেঠো মানুষ আমি নই। অতএব তার ছোঁয়াচ থেকে দূরে থাকার ফিকির খুঁজতেই হয়। না, পালিয়ে বাঁচার জন্য নয়, দরকারের লড়াইটাকে আপন কায়দায় লড়বার সুযোগ রাখার জন্য।

রেবন্তকে সরিয়ে দেওয়ার কয়েকদিন পরেই নবদিশার বাড়ি থেকে সম্পাদককে জানিয়ে দেওয়া হল— তার পক্ষে অভিনয় করা ও ক্লাবের সদস্য থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

এই সকল খবরকে অম্বরিষের মনোমতো করে গুছিয়ে সাজিয়ে মেম্বারদের কানে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করার জন্য একটি গোষ্ঠী আছে। সেই গোষ্ঠীর কাপ্তান বা লায়েক হল তপোব্রত, গ্রুপের ক্যাশিয়ার-কাম-ডিরেক্টরের পি-এ। রেবন ও নবির কাহিনিকে তপা তার মুখ থেকে যেমন ভাষায় ছাড়ল, মেম্বারদের কানে তেমনি ভাবেই পৌঁছে গেল।

আমাদের কাছে আসা রেবন্তর শেষ খবর এল কয়েক মাস পরে— দূরে একটি জায়গায় তাকে বদলি করা হয়েছে। কেন এই বদলি-প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু অফিসের উত্তর অর্ডারে লেখাই থাকে— 'ইন দ্য ইন্টারেস্ট অব পাবলিক সার্ভিস'— 'জনসেবার স্বার্থে'। ন্যায়-অন্যায়, গোপন-প্রকাশ্য, যৌক্তিক-অযৌক্তিক কারণ সবই ওই প্রশাসনিক ভাষার মধ্যে হারিয়ে যায়। রেবন্তকে খুব কষ্ট করে বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

আর কয়েক মাস পরে তার এক খবরে মনের একটা চাপা কষ্ট শুকনো পাতার মতো হাওয়ায় উড়ে গেল। আগে সুধাকরের কাছে কানাঘুষো খবরে শুনেছিলাম— নাটক করে বলে নবদিশার বিয়ের পাকা কথা নাকি কেঁচে গিয়েছিল। আর কোনও ভালো সম্বন্ধ আসছিল না। শেষের উড়ে আসা খবরের লেজটি পক্ষীরাজের পুচ্ছের মতো সুন্দর— নবদিশার বিয়ে হতে চলেছে। পুচ্ছটিকে সুন্দর বলছি এইজন্য যে, নবদিশার পরিবারের লোকরা বলেছে— নবির বিয়েতে রেবনের সুকৃতি সবচেয়ে বেশি।

অম্বরিষের কানে নিশ্চয়ই খবরটি উঠবে। নিজের মুখে ওকে শোনানোর ইচ্ছে হয়েছিল।

এই বিয়েতে নেমন্তন্ন পাওয়ার ইচ্ছে না করাই উচিত। (ক্রমশ)

অনলাইনেও গ্রাহক হওয়া যায়
www.swarnakshar.in

কলেজে পড়তে পড়তেই
নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই
যে কোনও চাকরির
পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320 **E-mail:** info@swarnakshar.in

কবিতা-পরিচয়

দুঃসময়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নরেশ গুহ

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা!
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এখনো সম্মুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে!
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে।
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
'এসো এসো' সুরে করুণ-মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, 'আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
ঊষা-দিশা-হারা নিবিড়-তিমির-আঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত সপ্তম খণ্ড রচনাবলি কিংবা 'সঞ্চয়িতা'র সাম্প্রতিক সংস্করণে 'দুঃসময়' কবিতাটির তারিখ দেওয়া আছে— ১৫ বৈশাখ, ১৩০৪। পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাণ্ডুলিপির দিকে তাকালেই দেখা যাবে তথ্যটি ভুল, অন্তত নির্ভুল নয়। ১৫ তারিখে তিনি যে-খসড়াটি রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে আমাদের অতি-চেনা 'দুঃসময়' কবিতার কোনোই মিল নেই, শুধু প্রথম দুটি স্তবক ছাড়া। স্বর্গপথের বাণী শুনিয়েই সাঙ্গ হতে পারত যে-লেখাটি সেটি কখন যে 'দুঃসময়ে' পরিণত হল, কবে কাটা গেল তার শিথিল, অপরিণত নিম্নাঙ্গ এবং যোগ হল অন্য চেহারার, ভিন্ন পেশীজাত তিনটি চরিত্রবান স্তবক, যার ফলে সহজ সরল একটি পদ্য রূপান্তরিত হয়েছে অসামান্য একটি কবিতায়, তা জানাতে না পারলে ওই রচনাকাল দেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

পরিমার্জনায় পুনর্জন্ম হয়েছে কবিতাটির। আশ্চর্য এই, সন্ধ্যাগমে উড্ডীন নিঃসঙ্গ পাখির যে-চিত্রকল্পটি এ-রচনার প্রধান অবলম্বন তার সঙ্গে কিন্তু ওই খসড়াতেই আমাদের দেখা হয়, এমনকী সেখানেও তাকে 'অন্ধ' বলেই সম্বোধন করা হচ্ছে। খসড়াটিকে আরও একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথম পংক্তিটি ঠিক কীভাবে শুরু হবে তা নিয়ে দ্বিধা ছিল, বেশ কিছু কাটাকুটি করা হয়েছে:

যদিও সন্ধ্যা আসিছে (মন্দ পদে?) (মন্দ চরণে?)
তার সঙ্গে তবে মিল দেওয়া যেত—
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত (পথে) (গগনে)।

দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তি প্রথমে লিখেছিলেন—
নিম্নে মানব মহা অজাগর শ্বসিছে

অর্থাৎ মনের ভাবখানা এই : 'ক্লান্ত নিঃসঙ্গ পাখি আশঙ্কায় ভয়াল-হয়ে-ওঠা সন্ধ্যায় আকাশে উড়ে চলেছে, আর হিংস্র অজগরতুল্য মানুষেরা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে কীভাবে তাকে পেড়ে খাবে।' মানবসংসারের প্রতি বীতরাগকে লুকোবার চেষ্টাও নেই। এই বর্জিত পংক্তিটি এইজন্য উদ্ধার করছি যে তা থেকে খানিকটা হয়তো অনুমান করা যাবে অসহায় পাখিটির বিশ্বসংসারের প্রতি মনোভাব কোন ধরনের।

খসড়া থেকে ৩য় এবং ৪র্থ স্তবকের অভিপ্রায় বুঝতে গেলে 'দুঃসময়' কবিতাটির প্রভাব মন থেকে আপাতত দূর করা দরকার। পাখি উড়ে চলেছে, ধরে নেওয়া যাক স্বর্গই তার গন্তব্য। কিন্তু ৩য় স্তবকের গোড়াতেই 'এতদিনে' কথাটির তাৎপর্য নিয়ে থমকাতে হয়। পাখিটি তবে কি কিছুকাল ওই স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল? 'এতদিন পরে' ফিরে যাচ্ছে? স্খলদঞ্চলা চঞ্চলা যুবতীরাই বা সেই 'স্বর্গে' পঞ্চশায়ককে বন্দনা করার জন্য পঞ্চম রাগ গাইছে কেন? এবং আকুল কোকিলই বা কেন 'এতদিনে' সেখানে মিনতিমাখা কাকলি 'হানছে'? আদি সুখ এবং ভাবী সম্ভাবনার মধ্যবর্তী নির্বাসনের সময়টাই কি তাহলে 'দুঃসময়'?

একটু পরেই জানা যাচ্ছে স্খলদঞ্চলা যুবতীরা প্রথমত 'বিরহিণীকুল' অন্তত 'কিন্নরীকুল', এবং দ্বিতীয়ত, 'এতদিনে' তারাও ফুলচন্দনে অর্ঘ

সাজিয়ে 'বাসরদুয়ারে' (অথবা 'স্বর্গদুয়ারে') বসেছে, কেননা নবদম্পতির মিলন এতদিনে সার্থক হল। আবার প্রশ্ন জাগে, এ কোন স্বর্গ যেখানে বাসরদুয়ারে ব'সে থাকে কিন্নরীকুল এবং নির্বাসনশেষে পুনর্মিলিত নবদম্পতির জন্য অর্ঘ সাজায়? আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এই স্বর্গটি আসলে কালিদাসের কাব্যনিঃসৃত এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইতিপূর্বেই আমরা তার উল্লেখ পেয়েছি:

কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি।

খসড়াটিতে, মনে হয়, বলার ইচ্ছে— বিরহেরও অবসান আছে। নির্বাসিত যক্ষ, যিনি জগতের যতেক প্রবাসী এবং বিরহীর প্রতীক, তিনিও, বর্ষফল ভোগ করা শেষ হয়ে গেলে অলকায় প্রিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলিত হন। মিলন অসম্ভব এ-কথা স্বয়ং কালিদাসও বলেননি। সেই মিলনের আহ্বান যেন জগতের যতেক প্রবাসীর প্রাণে গিয়ে পৌঁছয়। 'স্বর্গপথে' কবিতাটির ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা আমি ভাবতে পারছি না। শাপান্তে যক্ষের নিশ্চয়ই পুনর্মিলন ঘটেছিল। জগতের বিরহী প্রবাসীদের পক্ষেও সেই অলকায় পৌঁছনো সম্ভাব্য কিনা সে-কথা এই খসড়াতে নেই, এর কয়েক মাস আগে লেখা 'চৈতালি'-এর 'যাত্রী' নামের কবিতাতেও নেই। আছে শুধু ব্যাকুলতা।

অনন্তবিরহী চিত্তকে ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ, উড্ডীন পাখির চিত্রকল্পে প্রকাশ করার চেষ্টাও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই প্রথম নয়। 'স্বর্গপথে' রচনার বছর দেড়েক আগে 'চিত্র'-র 'সান্ত্বনা' কবিতায় লেখা হয়েছে:

কোথা বক্ষে বিঁধি ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখি।
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা।
কোথা তোরে রাখি।

এইবারে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, 'স্বর্গপথে' নামের খসড়াটিকে বাতিল করে দিয়ে কেন রবীন্দ্রনাথকে ভিন্ন আর-একটি কবিতা লিখতে হয়েছিল, এবং 'চৈতালি'-র 'যাত্রী' কবিতাটির সঙ্গে খসড়াটিকে মিলিয়ে পড়লেই তার কতকটা উত্তর পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। 'যাত্রী' কবিতাটির জাত আলাদা। বিশেষ কোনো চিত্রকল্প না-থাকায় এটি ভাবালুতায়-ভরা একটি বক্তব্যে ঠেকেই শেষ হয়েছে। পাঠকের কল্পনাকে জাগিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা না-করেই সোজাসুজি বলে দেওয়া হচ্ছে কথাটি। ফলত তার তত্ত্বাংশ মনের মধ্যে

কবিতাটির প্রথম থেকেই একটি চরাচরব্যাপী নিঃসঙ্গতার ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকা হয়েছে: দিকদিগন্তে উদ্যত হয়ে উঠেছে একটি মহা আশঙ্কা। সূর্য অস্তাচলে নিদ্রিত হওয়ার পর বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সংবরণ করে স্তব্ধ আসনে বসে প্রহর গুনছে— হয়তো আলোকের বা প্রত্যুষের আবির্ভাবের জন্য,— যদিও শর্বরীর দীর্ঘতা সম্মুখে অপরিসীম।

কোনো রেখাপাত করছে না। 'স্বর্গপথে'র খসড়াতে ওই একই কথাকে চিত্রকল্প দিয়ে পুনরায় বলবার প্রয়াস দেখা যাবে। কিন্তু এত বেশি উপাদান ভিড় করে আসছে যে তাদের গুছিয়ে তুলে একটি মাত্র কবিতার অঙ্গে বিন্যস্ত করা অসম্ভব। উড্ডীন পাখির মতো একাকী বিরহী চিত্ত, অজগরসম মানবসংসারের বিরোধিতা, অলকার সৌন্দর্যপুরীতে বিরহান্তে সম্ভাব্য মিলন, এবং সেই আশা নিয়ে চিত্তবিহঙ্গের অবিরাম যাত্রার সংকল্প— এত কথা একটি মাত্র ক্ষুদ্র কবিতায় ধরানো কঠিন। শেষ পর্যন্ত তাই ওই প্রধান চিত্রকল্পটিকেই বেছে নিলেন লেখক, এবং সমগ্র কবিতাটিতে সেই একটি চিত্রকল্পেরই বিস্তারে মনোযোগী হলেন।

পুনর্লিখিত কবিতায় 'যদিও-তবু' ধরনের বাক্যের গঠন নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রতিটি স্তবক। 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,/এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা'— প্রতি স্তবকের অন্তে ধ্রুবপদের মতো পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। তথাপি প্রথম স্তবকেই শেষ হয়ে যায়নি কবিতাটি, শেষ পংক্তি পর্যন্ত বিস্তার হচ্ছে সুরের, যোগ হচ্ছে নতুন ভাব আর ইঙ্গিত, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা যেখানে পৌঁছচ্ছি তা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সচরাচর প্রত্যাশিত নয়। বুদ্ধদেব বসু ছাড়া সমালোচকদের মধ্যে কেউই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই শ্রেণির বিবাদী বা সংবাদী সুরের উপস্থিতির দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন বলে জানি না। সে-কথা পরে বলছি। এখনকার মতো উড্ডীন বিহঙ্গের চিত্রকল্পটিকে কবিতায় অনুসরণ করা যাক।

হয়তো বা ঘনায়মান অন্ধকারের ইঙ্গিতেই সব সংগীতের অবসান হয়েছে— এই হচ্ছে কবিতাটির ভূমিকা। মহা আশঙ্কাটি কে জপ করছে তা ভেবে নিতে একটু অসুবিধে হয়। বর্তমান পাঠ অনুযায়ী পংক্তির শেষে কমা মেনে নিলে 'মৌন শব্দটিকেই বিশেষ্য এবং বাক্যের কর্তা ভাবা অনিবার্য, যদিও 'মন্তরে' কথাটির তাহলে কোনোই কাজ থাকে না ওখানে। মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিতে দেখবেন কমাটি নেই, যার ফলে পরপংক্তির অবগুণ্ঠনে ঢাকা দিকদিগন্তই মৌন মন্তরে মহা আশঙ্কা জপ করছে বলে ধরে নেওয়া চলে, যে-পাঠ, আমার কাছে অন্তত, অধিক মনোমতো। ২য় এবং ৪র্থ স্তবক থেকে জানা যাচ্ছে, আকাশের যে-শূন্যপথে পাখিটির যাত্রা তার তলায় কল্লোলিত সমুদ্রের গর্জন, যা নাকি গভীর অধীর মৃত্যুসম শত তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠে পাখিটিকে গ্রাস করতে ইচ্ছুক। যে-তীরভূমি, কুঞ্জ, নীড়, কিংবা আশ্রয়শাখার জন্য পাখিটির ব্যাকুলতা তার সমান্তরাল বর্ণনা আছে 'মানসী'-র 'মেঘদূত' কবিতায়। এই পাখিটি যে কোনো জাগতিক বিহঙ্গ নয়, প্রতীকধর্মী, তা ৩য় স্তবকে এসেই স্পষ্ট হচ্ছে। মরণোদ্বেল সমুদ্রের ওপর দিয়ে সারারাত্রি ধরে উড়ে চলার জন্য অনুনয় করা হচ্ছে তাকে। দেশান্তরী পাখিদের সঙ্গে তার খানিকটা যদিও বা মিল থাকতে পারে তবু এ-কথা বোধ করি বলা যায় না যে দেশান্তরী বিহগেরা একাকী সমুদ্র পাড়ি দেয়। আসলে কবিতাটির প্রথম থেকেই একটি চরাচরব্যাপী নিঃসঙ্গতার ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকা হয়েছে: দিকদিগন্তে উদ্যত হয়ে উঠেছে একটি মহা আশঙ্কা। সূর্য অস্তাচলে নিদ্রিত হওয়ার পর বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সংবরণ করে স্তব্ধ আসনে বসে প্রহর গুনছে— হয়তো আলোকের বা প্রত্যুষের আবির্ভাবের জন্য,— যদিও শর্বরীর দীর্ঘতা সম্মুখে অপরিসীম। আপাতত কোথাও সান্ত্বনার কিংবা প্রত্যাশাপূরণের কোনো ক্ষীণ সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না, যদি-না অকূল তিমিরে সন্তরণরত একাকিনী একরত্তি চাঁদকে, বা বিন্দুপ্রমিত নক্ষত্রমণ্ডলিকে প্রতিশ্রুতির প্রতিবিম্ব বলে ধরা হয়। বিপুল বিশ্বে সঙ্গবিরহিত অস্তিত্বের নিরর্থকতা যা-কিছু দিয়ে লাঘব করা যেত তার কিছুই নেই কোথাও। আশা যেমন নেই, তেমনি ভয়ও নেই, কেননা এমনকী কান্নার ভাষাতেও ব্যক্ত করা যায় যে-যন্ত্রণার উপলব্ধি তাকেও অতিক্রম করে যায় পাখিটির আতঙ্কময়

অস্তিত্বের নিঃসীমতা। থাকার মধ্যে আছে গতিসঞ্চারী একজোড়া পাখা, আর আছে নিবিড়-তিমির-আঁকা এবং উষার দিশা-হারানো একটি অন্তহীন আকাশ। (অন্য বহু পাঠকের মতো আমিও এতকাল, হয়তো ছন্দের দোলার উপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে, 'মহানভ-অঙ্গন'-এর পরে একটি যতিচিহ্নের কল্পনা করেছি, এবং পরবর্তী পংক্তিকে পড়েছি যেন নতুন একটি বাক্যের শুরু হচ্ছে ভেবে যার কর্তা দিশা-হারা উষা।) এই পাঠের ফলে সম্ভাব্য প্রত্যূষকে কবিতায় প্রত্যাসন্ন মনে করা অসম্ভব নয়। 'দিশা-হারা' এবং 'উষা'র মধ্যবর্তী হাইফেন-চিহ্নের প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বুদ্ধদেব বসু, যার ফলে সমস্ত কবিতাটির অভিপ্রায় নিগূঢ়ভাবে বদলে গেছে আমার সঙ্গে। কবিতাটিতে এমন কথা বলা হচ্ছে না যে পূর্ব দিগন্তে উষা কোনো কারণে দিশা-হারা। সন্ধ্যাগমে উড্ডীন পাখিটি এই কবিতা শেষ হতে-হতে উষার তীরে পৌঁছচ্ছেই না। অন্ধকার বরং ক্রমে আরও ঘনীভূত হবে, সূর্যাস্তের পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদও শিগগিরই অস্তে যাবে, এই রকম কথাই বলা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের আস্তিক্যে বিশ্বাস এতটাই নিশ্চিন্ত ভাবে মেনে নিয়েছি আমরা যে আলোচ্য কবিতায় অন্ধকারের এই শ্বাসরোধকারী চেহারা দেখে চমকে উঠতে হয়। অমঙ্গল বা অশুভকে এতখানি স্বীকৃতি দেওয়ার দৃষ্টান্ত সমগ্র রবীন্দ্রনাথেই যেন অভাবনীয়।

কবিতাটি বিষয়ে আরও দু-একটি জরুরি কথা আছে। প্রথমত, পরিমার্জিত পাঠের এই অন্ধ বিহঙ্গটি কে বা কী? এবং তাকে অন্ধই বলা হচ্ছে কেন? মনে রাখা দরকার, ম্যাকমিলানের রবীন্দ্রকাব্যসংগ্রহে কবিতাটির যে সারানুবাদ ছাপা আছে (রবীন্দ্রনাথেরই করা?) তাতে অন্ধতার শাপ থেকে বিহঙ্গটিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, অথচ কবিতা পত্রিকার শততম সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু এ-কবিতার যে-উৎকৃষ্ট অনুবাদটি প্রকাশ করেছিলেন তাতে বিহঙ্গের অন্ধতা ন্যায্যভাবেই স্বীকৃত। দুই অনুবাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি যে অধিক মান্য সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। পাখি-প্রতীকটির এমন মানে অনায়াসেই করা যায় যে বিরূপ বিশ্বের সে একান্তভাবে কবি-চৈতন্যেরই প্রতিভূ। রচনার ইতিহাস মনে রেখে আমি প্রস্তাব করছি, বিহঙ্গটি বিরহী চিত্তের প্রতীক। প্রস্তাবের সমর্থনে ৪র্থ স্তবকটি আর-একবার পড়তে অনুরোধ করছি। দেশান্তরী প্রকৃতির হোক বা না-হোক উড্ডীন যে-পাখিটিকে অন্ধকার সাঁতরে, ক্লান্ত অথচ অন্তহীন যাত্রায় উৎসাহিত করার চিত্র এ-কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সঙ্গে বহু দূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি/'এসো এসো' সুরে করুণ-মিনতি-মাখা'— এই দুই পংক্তির কী সংগতি থাকতে পারে একবার ভেবে দেখুন। একি কোনো খাঁচা থেকে পলাতক পোষা পাখিকে কেউ ফিরে ডাকছে? কবিতার যেটা চিত্ররূপগত আকৃতি তার সঙ্গে এই দুই পংক্তির অভিপ্রায় মোটেই খাপ খায় না। আমার ধারণা, পরিমার্জনাজনিত রূপান্তর সত্ত্বেও খসড়া থেকে আসা এই পরিত্যাজ্য অংশটি শেষ পর্যন্ত কবিতার শরীরে অস্বস্তিকর ভাবে লেগে রয়েছে। এবং তাকে অস্ত্রচিকিৎসকের ত্রুটি না বলে উপায় নেই। 'এসো এসো' সুরে ডাকছে যারা তারা হচ্ছে খসড়া থেকে পরিত্যক্ত অংশেরই বিরহিণী কিংবা কিন্নরীকূল।

> কবিতা-পরিচয়ের কয়েকটি লেখায় পারস্পরিক নেপথ্য আলোচনার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এতে রচনায় বেশ একটি সহজ অন্তরঙ্গতার সুর আসে, মনে হয় কবিতাটিকে সবাই মিলে ভাবছেন, আমরা পাচ্ছি সেই ভাবনার চেহারা। কিন্তু একটি প্রশ্ন মনে হয়, সব কথাই কি সর্বত্র উল্লেখযোগ্য?

দ্বিতীয়ত, বলা দরকার যে অন্ধকারের জয়গান দিয়ে কবিতাটি শেষ হয়নি। অন্ধকার কেটে যাবে এমন কথা অবশ্য কোথাও নেই, বরং সেই কালিমাকে কবিতায় ক্রমেই আমরা ঘনতর হতেই দেখছি, তবু প্রথমাবধি এ-কথাটাই বারংবার বলা হচ্ছে যে অন্ধকার দৃষ্টিকে আবৃত করলেও— যে-কারণে পাখিটিকে সম্বোধন করা হচ্ছে 'অন্ধ' বলে— তার কাছে আত্মসমর্পণ অকল্পনীয়। বহির্বিশ্বে কোথাও আশার চিহ্ন না-থাকতে পারে, তথাপি নিজেরই চিত্তলোক থেকে নিষ্কাশিত করে বিশ্বাসকে আরোপ করতে হবে। এ-অর্থে 'দুঃসময়'কেও আস্তিক্যের কবিতাই হয়তো বলা চলে, কিন্তু সে-আস্তিক্যবোধ প্রেরিত নয়, অর্জিত।

শুভময় রায়

কবিতার পাণ্ডুলিপি কবির পদ্ধতিকে বুঝতে অনেকটা সাহায্য করে, এটা হয়তো ঠিক। এমনকী সমগ্র কবিতার অভিপ্রায় বুঝে নেবার জন্যও কখনো-কখনো রচনার সমস্ত ক্রমটা জানতে পারলে হয়তো ভালো। সম্ভবত সেইজন্যই আধুনিক সাহিত্য সমাজে পাণ্ডুলিপির প্রতি কৌতূহল ক্রমশ এত প্রবল হচ্ছে।

তবে সবাই মানবেন যে এ-ধরনের কৌতূহলে অতিসতর্কতার প্রয়োজন। তা নইলে অনেক সময় অন্ধকারে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। 'দুঃসময়' আলোচনাটিতে এমন কোনো বিপদ ঘটেনি তো? 'এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে'-র পূর্বপাঠ, নরেশবাবু বলছেন, 'নিম্নে মানব মহা অজাগর শ্বসিছে'। এবং তাঁর আলোচনায় এ-লাইনটি যে কেবল তথ্য হিসেবে উপস্থাপিত তা নয়, এই সূত্রেই আমরা মন্তব্য পাচ্ছি— 'কবির মনের ভাবখানা: ক্লান্ত নিঃসঙ্গ পাখি আশঙ্কায় ভয়াল-হয়ে-ওঠা সন্ধ্যায় আকাশে উড়ে চলেছে, আর হিংস্র অজগরতুল্য মানুষেরা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে কীভাবে তাকে পেড়ে খাবে'।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পাণ্ডুলিপিতে লাইনটি কি সত্যিই ও-রকম ছিল? আমি যতদূর পড়তে পারছি তাতে দেখা যাচ্ছে কথাটা 'নিম্নে সাগর মহা অজগর শ্বসিছে'। অর্থাৎ প্রথম পাঠ এবং পরিণত পাঠে প্রভেদ ভাবনাগত নয়, নিছক রচনাগত। 'এ নহে' দিয়ে শুরু-করা দু'টি লাইনের মাঝখানে 'এ যে' কথা-দুটি বেশ গাঢ়তা পাচ্ছে (দ্বিতীয় পাঠের 'যেন'ও তাই বর্জন করলেন কবি: নিম্নে > যেন > এ যে), 'নিম্নে সাগর মহা অজাগর শ্বসিছে'র চেয়ে ধ্বনিগুণে অনেক সম্পন্ন মনে হল তাঁর 'এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে'। ঠিক-ঠিক শব্দ নির্বাচন করে নেবার কৌশলে লাইনটিকে আর একটু মনোগ্রাহী করে তোলা ছাড়া এ-পরিবর্তনের আর-কোনো বড় উদ্দেশ্য আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

'সাগর' শব্দটিকে নরেশবাবু কেন তবে 'মানব' পড়লেন? আমার এইরকম মনে হয়: পাণ্ডুলিপিতে লাইনটির ওপর কাটাদাগগুলি চলে গেছে শব্দটির বুকের ওপর দিয়ে, ফলে 'স' এবং 'গ'-কে কারও মনে হতে পারে 'ম' এবং 'ন', আর 'র'-এর বিন্দুটি দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প একটু নীচে নেমে আসায় তাকে সহসা দেখায় যেন 'ব'। অতএব এই বিভ্রম। কবিতাটির ব্যাখ্যা বিষয়ে অবশ্য কোনো বক্তব্য

নেই। একটি কেবল সন্দেহ কখনো-কখনো মনে আসে। রবীন্দ্ররচনায় ভূমা ইত্যাদি প্রসঙ্গে যেমন অতিপ্রগলভতা দেখেছি একসময়ে, আজ আবার তার উলটো ঘটছে না তো? তাঁর নাস্তিক্য অথবা তাঁর অমঙ্গলভাবনা, এ-সব কি একটু বেশি মাত্রায় প্রশ্রয় পাচ্ছে না আধুনিক আলোচনায়? 'দুঃসময়' কবিতার ভাবনায় সত্যি কি তত জটিলতা আছে? কবিতাটির পাণ্ডুলিপি থেকে যে 'শিথিল, অপরিণত নিষ্পাঙ্গ' বর্জিত হল, তার থেকে জন্ম নিয়েছিল 'কল্পনা'র আর-একটি কবিতা যার নাম 'অসময়'। এ-দুটি রচনাকে তুলনা করে ভাবা হয়তো এ-ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারত।

কবিতা-পরিচয়ের কয়েকটি লেখায় পারস্পরিক নেপথ্য আলোচনার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এতে রচনায় বেশ একটি সহজ অন্তরঙ্গতার সুর আসে, মনে হয় কবিতাটিকে সবাই মিলে ভাবছেন, আমরা পাচ্ছি সেই ভাবনার চেহারা। কিন্তু একটি প্রশ্ন মনে হয়, সব কথাই কি সর্বত্র উল্লেখযোগ্য? যেমন, উষা-র পরবর্তী হাইফেনটি প্রথম দেখিয়ে দেন বুদ্ধদেব বসু, এ-ও কি বলবার ছিল? হাইফেন ছাড়া 'পাঠের ফলে সম্ভাব্য প্রত্যুষকে কবিতায় প্রত্যাসন্ন মনে করা অসম্ভব নয়'— নরেশবাবুর এই সিদ্ধান্ত বোধহয় মেনে নেওয়া কঠিন, সত্যি তা মনে করা সম্ভব নয়। এ-রকম 'অন্য বহু পাঠকের' কথা কি সত্যিই আমাদের ভাবতে হবে যাঁরা উষাকে কল্পনা করবেন নিবিড়-তিমির আঁকা বলে? দিশাহারা এবং নিবিড়-তিমির-আঁকা উষা? তাহলে সে-রকম উষা প্রত্যাসন্ন হলেই বা কী সুবিধে?

প্রসঙ্গক্রমে আর-একটি প্রশ্ন নিবেদন করা যায় বিশ্বভারতীর প্রতি। 'এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা' লাইনটিতে কটা কমা আছে? পাণ্ডুলিপিতে এবং এতাবৎকালের মুদ্রণে আমরা একটি দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে 'এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা'। কোন সূত্রে এই পরিবর্তন, জানতে পারলে ভালো হত। এটা হয়তো এমন-কিছু ব্যাপার নয়; কিন্তু একেবারেই কি নয়?

দেবেশ রায়

পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্ত সংখ্যায় শ্রীনরেশ গুহর 'দুঃসময়' কবিতাবিষয়ক আলোচনাটি পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। এ-বিষয়ে আমার দু-একটি কথা মনে হয়েছে— নিবেদন করতে চাই।

শ্রীনরেশ গুহ 'সঞ্চয়িতা'-য় প্রকাশিত খসড়ার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা যুক্তিসংগতভাবেই উপস্থাপিত করেছেন। তুলনা করতে গেলে যেটা মুশকিল হচ্ছে— তা

নবসন্তে বনবনান্তে যেখানে যুবতীসমাজ স্খলদঞ্চলা সেখানে কোকিলের মিনতি বিফলে যায় কেন? অপরদিকে চতুর্থ স্তবকে কিন্তু এই বিফলতার সুর নেই, আছে আয়োজনের বর্ণনা, —সেই ভাবীস্বর্গের দুয়ারে নন্দন-ফুলচন্দনের অর্ঘ্য, নবদম্পতির আছে মিলনের মোহ।

হল এই খসড়ার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য বিস্তর এবং খসড়াতে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া সহজ নয় যাতে এই পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করা যায়। তাই শ্রীনরেশ গুহ দুটো কবিতাকে প্রায় স্বতন্ত্র ধরে নিতে চেয়েছেন ('...তিনি যে-খসড়াটি রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে... 'দুঃসময়' কবিতার কোনোই মিল নেই...') অবিশ্যি প্রথম দুই স্তবকে আছে। তিনি প্রথম দুই স্তবকের গদ্য অন্বয় করেছেন— 'ক্লান্ত নিঃসঙ্গ পাখি আশঙ্কায় ভয়াল-হয়ে-ওঠা সন্ধ্যায় আকাশে উড়ে চলেছে, আজ হিংস্র অজগরতুল্য মানুষেরা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে কীভাবে তাকে পেড়ে খাবে'। এই অন্বয়ে তিনি পৌঁছেছেন দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় চরণের এই বাতিল পাঠ-কে ভিত্তি করে: 'নিম্নে মানব মহা-অজাগর শ্বসিছে।'— খসড়ার এই লাইনটি তিনি ভুল পড়েছেন; আমি তো আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করেও পড়ছি 'নিম্নে সাগর মহা-অজাগর শ্বসিছে।' চরণটি কেটে দিয়ে কবি যে-লাইন টেনেছেন তার সঙ্গে 'স'-এর বাঁ-দিকের নিম্নাংশ মিশে গিয়ে গুহমহাশয়কে 'ম' পড়িয়েছে। একটু খেয়াল করলে দেখবেন পরের চরণে 'কুন্দ' শব্দটির বাঁ-পাশে 'সাগর'-এর 'র'-এর বিন্দুটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যদি গুহমহাশয়ের পাঠটি শুদ্ধ হত, সুতরাং তৎকৃত অন্বয়ও, তাহলে তো আরও বেশি করে প্রমাণ হত যে 'দুঃসময়' কবিতার সঙ্গে 'স্বর্গপথে' কবিতার বিষয়েরই মিল রয়েছে। তিনি প্রথম দুই স্তবকে 'দুঃসময় ও 'স্বর্গপথে'-র মিল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবিতা বাদ দিয়ে কবির মনের খবর নিয়েছেন: 'উড্ডীন পাখির মতো একাকী বিরহী চিত্ত, অজগরসম মানবসংসারের বিরোধিতা, অলকার সৌন্দর্য-পুরীতে বিরহান্তে সম্ভাব্য মিলন, এবং সেই আশা নিয়ে চিত্তবিহঙ্গের অবিরাম যাত্রার সংকল্প— এত কথা একটিমাত্র ক্ষুদ্র কবিতায় ধরানো কঠিন।'— আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না কেন কঠিন, গুহমহাশয় যেভাবে সাজিয়েছেন তেমনি সাজিয়েই চারটি স্তবক হতে পারে— 'শেষ পর্যন্ত তাই ওই প্রধান চিত্রকল্পটিকেই বেছে নিলেন লেখক, এবং সমগ্র কবিতাটিতে সেই একটি চিত্রকল্পেরই বিস্তারে মনোযোগী হলেন'— এই সিদ্ধান্তে গুহমহাশয় এসেছেন খসড়ার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের নিশ্চিত একটি পাঠ ধরে নিয়ে। তাঁর কাছে তৃতীয় স্তবকের 'এতদিনে সেথা'— বাক্যাংশের অদ্বিতীয় অর্থ 'কালিদাসের কাব্যনিঃসৃত' 'আদিযুগ ও ভাবী সম্ভাবনার' 'স্বর্গ'। আমার কাছে মনে হয়েছে তৃতীয় স্তবকের 'এতদিনে সেথা বিহঙ্গের ছেড়ে-আসা তীরভূমি—এবং খসড়ার তৃতীয় স্তবকটির সৃষ্টি হয়েছে বিহঙ্গের অতীত বোঝাতে আর চতুর্থ স্তবকটি রচিত হয়েছে বিহঙ্গের ভবিষ্যৎ বোঝাতে। অবিশ্যি তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের উদ্দেশ্যগত বিভিন্নতা বোঝার পক্ষে অসুবিধে সৃষ্টি করেছে উভয় স্তবকের বর্ণনীয় প্রকৃতির আকৃতিসাম্য। কিন্তু এটা লক্ষ না করে পারছি না যে তৃতীয় স্তবকের কোকিল আকুল ক্রন্দনে 'হানিছে কাকলি বিফল মিনতি-মাখা': নবসন্তে বনবনান্তে যেখানে যুবতীসমাজ স্খলদঞ্চলা সেখানে কোকিলের মিনতি বিফলে যায় কেন? অপরদিকে চতুর্থ স্তবকে কিন্তু এই বিফলতার সুর নেই, আছে আয়োজনের বর্ণনা, —সেই ভাবীস্বর্গের দুয়ারে নন্দন-ফুলচন্দনের অর্ঘ্য, নবদম্পতির আছে মিলনের মোহ। খসড়ার চতুর্থ স্তবকের প্রথম আর তৃতীয় চরণে 'এতদিনে শব্দটি কবি কেটে দিয়েছেন। গুহমহাশয় বলতে পারেন— এ 'এতদিনে' ওই তৃতীয় স্তবকের 'এতদিনে'-ই, সুতরাং দুই স্তবকে একই প্রসঙ্গ। খুব শক্ত না-শোনালেও আমি এই কথা বলতে পারি— 'এতদিনে'-শব্দটি ব্যবহারের ফলে কালপার্থক্য ঘুচে যাচ্ছে দেখেই কবি ওটাকে চতুর্থ স্তবকে বাদ দিয়েছেন। ওই যুক্তি না দিয়ে আমি বরঞ্চ সরাসরি স্বীকার করতে চাই যে 'স্বর্গপথে', কবিতাটি যতবারই পড়ছি ততবারই তৃতীয় স্তবকের 'এতদিনে'-র ওপর ভর করছে বিহঙ্গের স্মৃতি, দ্বিতীয় স্তবকের শেষেই যে তার মনে পড়ে গিয়েছে 'বনমর্মর', 'কুন্দকুসুমরঞ্জিত'

কুঞ্জ, 'ফুলপল্লবপূজিত' সে-তীর। 'দুঃসময়' বা 'স্বর্গপথে'-র দ্বিতীয় স্তবকের এই চরণগুলিকে পরপারের তীর বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু নিম্নে গর্জমান সমুদ্রের অনুষঙ্গে যে-বনমর্মরের, বা দোলায়িত ফেনরাশির অনুষঙ্গে যে-কুন্দকুসুমের কথা এসেছে তা কি বিহঙ্গের স্মৃতিজাত নয়? আর যে-কালে চরাচরব্যাপী অন্ধকার ধীরে-ধীরে বিহঙ্গ আচ্ছাদিত হয়ে পড়ছে, পাখা বন্ধ না-করাটাই যেখানে কবির ধ্রুববাক্য, সেখানে পরপারের নীড়, আশ্রয়শাখা দেখাটা ঠিক কল্পনার শৃঙ্খলা মানে না। যত নিশ্চয়তার সঙ্গে কবি দ্বিতীয় স্তবকে সমুদ্র আর ফেনহিল্লোলকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে মনে হয় বিহঙ্গের পাখা থেকে সব স্মৃতি কবি মুছে নিচ্ছেন, ধীরে-ধীরে নয়, দ্রুত, নিষ্ঠুরভাবে, নইলে শেষের স্তবকের নিখিল নাস্তিতে 'পাখা', 'মহানভ-অঙ্গন', 'নিবিড়-তিমির'—এই তিন 'আছে'-তে পৌঁছনো যায় না। 'দুঃসময়' নামকরণের মধ্যেই সমবিষয়ক তুলনা গোপন আছে। যা দুঃসময় ছিল না— তারই ইঙ্গিত কবিতাটির ও খসড়ার দ্বিতীয় স্তবকে এবং খসড়ার তৃতীয় স্তবকেও। যখন দুঃসময় থাকবে না তার ইঙ্গিত কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে: 'বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি/'এসো এসো' সুরে করুণ-মিনতি-মাখা।' গুহমহাশয় বলেছেন এই চরণ-দুটি 'অস্ত্রচিকিৎসকের ত্রুটি'। বস্তুত এই দুটি চরণ সমগ্র কবিতার ভিত্তি, এমন কোনো আহ্বান বিহঙ্গের কাছে এসে না পৌঁছলে, নীড় আর আশ্রয়শাখা ত্যাগ করে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে স্বভাব-অন্ধ সে ঝাঁপ দেবে কেন? সন্ধ্যায় পাখিরা অন্ধ— এই নিয়তিকে স্বীকার করেই দুঃসময়েই পাখি বেরিয়েছে। 'কল্পনা'র স্তরে বা কোনো স্তরেই রবীন্দ্রনাথ কি কবিতার সেই ভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন যেখানে যুক্তিশৃঙ্খলা দৃশ্যত খুব প্রয়োজনীয় নয়? তাহলে আমরা কী করে ব্যাখ্যা করব এই ঘটনাটি: যে-সন্ধ্যায় 'আশ্রয় শাখা'র 'নীড়ে' বিহঙ্গের নিরাপদে থাকবার কথা সেই সায়-লগ্নে গভীর অধীর উচ্ছল মরণকে সে অতিক্রম করতে চায় কেন, যায় কেন, —সন্ধ্যায় পাখিরা অন্ধ, সন্ধ্যায় পাখিরা মূক— এই ভবিতব্য জেনেও। কবিতাটিতে 'অন্ধকারের শ্বাসরোধকারী চেহারা' গুহমহাশয় 'এতটাই নিশ্চিতভাবে মেনে' নিয়েছেন যে তিনি লক্ষ করতে চাননি কবিতার মধ্যেই নানা জায়গায় ইঙ্গিত আছে— পরপারের, অন্ধকারের পরবর্তী উষার, আলোকের। তাঁর অন্বয় যদি মেনেই নিই, তাহলেও জিজ্ঞাসা করতে পারি, অবগুণ্ঠনে ঢাকা দিকদিগন্ত 'আশঙ্কিত' কেন— যদি অন্ধকার এতই

সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরবর্তী অর্থাৎ সন্ধ্যার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ক্ষীণ হয় না তো। আর, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদকে ক্ষীণ হতে হলে সূর্যাস্তের বহু পরবর্তী হতে হয় অর্থাৎ প্রত্যুষের কাছাকাছি উঠতে হয়। কিন্তু তাহলে অভিপ্রেত সন্ধ্যার পটভূমি পাওয়া যাবে কী করে?

নিশ্চিত। আমার তো মনে হয় দুঃসাময়িক আশঙ্কা সেখানেই থাকতে পারে যেখানে উত্তরণের প্রতীক্ষা আছে। 'ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে'—নিদ্রিত হলেও 'অরুণ' আর 'অস্ত-অচলে'র আনুষঙ্গিক উদয়াচল মিলে আশার বাণী আনে না? আর অন্ধকার যদি এতই ধ্রুব তবে নিশ্বাসবায়ু সংবরণ করে বিশ্বজগৎ 'প্রহর গনিছে' কেন এবং তা-ও 'স্তব্ধ আসনে' ও 'বিরলে'। সেই দুঃসময় থেকে উত্তরণের জন্য তপস্যার একটি চিত্রাভাস আসে না? উপান্ত্য স্তবকে 'ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি' অঙ্গুলি মেলে বিহঙ্গের দিকে চেয়ে কীসের 'ইঙ্গিত' করছে? আমার তো মনে হয় তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে চরাচরব্যাপী অন্ধকারের সঙ্গে সংগ্রামী এই অন্ধ মূক পাখি যেমন আছে তেমনি আছে নিহিত একটি চিত্র— যেন এই লড়াইয়ে হারা-জেতার ওপর অনেক-কিছু নির্ভর করছে চরাচরের। অবিশ্যি তাঁর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে এইরকম কথা গুহমহাশয় একবার বলেছেন। সে-ক্ষেত্রে তাঁর অন্ত্য ও প্রাক-উপান্ত্য অনুচ্ছেদের শেষাংশকে যথাযথ সংগত করা যায় কি?

আমার সিদ্ধান্ত ও গুহমহাশয়ের সঙ্গে মত বিরোধিতার সারকথা হল:

১. 'দুঃসময়' কবিতাটি 'স্বর্গপথে'-খসড়ারই সংস্কৃত রূপ। এমনকী স্তবকানুগ মিলই কবিতা-দুটিতে বেশি। খসড়াতেই উড্ডয়নের অভিপ্রায়ের ওপর জোর ছিল, অন্তত নামকরণে।

২. 'দুঃসময়' কবিতাটিতে উড্ডয়নের কালটুকুর ওপর জোর এসেছে। রূপান্তরেই এইটুকুই ঘটেছে। যা ছিল খসড়ায় স্থানিক, তা-ই হয়ে উঠেছে কালিক।

বিজয়া দাশগুপ্ত

কবিতা-পরিচয় পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্ত সংকলনে শ্রীনরেশ গুহ-কৃত রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার আলোচনা পড়ে উপকৃত হয়েছি। শ্রীগুহ ঠিকই বলেছেন (অথবা বুদ্ধদেব বসু): 'মহানভ-অঙ্গন'-এর পরে যতিচিহ্নের কল্পনা করে আমরা এতদিন উষা ও দিশাহারার মধ্যবর্তী হাইফেন সম্পর্কে, অতএব কবিতার শেষ স্তবকের সমুদ্রিত গাঢ় অন্ধকার সম্পর্কেও, অন্ধ ছিলুম। বর্তমানে আলোচনাজাত বৈশদ্যে এখন এই অংশটির অর্থ নিটোল ও সুসমঞ্জস্য হয়ে উঠল। চতুর্থ স্তবকের পাঁচ-ছয় পংক্তি সম্পর্কে সন্দেহের ('দুঃসময়' যাদেরই প্রিয় কবিতা, তাদের মনে কোনো-না-কোনো সময় এই লাইন-দুটি অস্বস্তি জাগিয়েছে নিশ্চয়) যে-নিরসন শ্রীগুহ দিয়েছেন, তা গবেষকের যুক্তিসিদ্ধ বলে অঙ্গীকার না করে পারছি না, কিন্তু এই অংশটিকে 'অস্ত্রচিকিৎসকের ত্রুটি' হিসেবে দেখা ছাড়া কি উপায় নেই? আমার তো 'সবে দেখা দিল...ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা'— এই অংশকেও সমপরিমাণ ত্রুটিযুক্ত বলে মনে হয় (খুঁটিয়ে দেখলে আরও কিছু অংশকেও)। কিন্তু সেভাবে কি বরাবর দেখা চলে? কী জানি। উল্লিখিত পংক্তি সম্পর্কে, প্রসঙ্গত বলি, শ্রীগুহ লিখেছেন—'সূর্যাস্তের পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদও শিগগিরই অস্ত যাবে...' ইত্যাদি। কিন্তু সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরবর্তী অর্থাৎ সন্ধ্যার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ক্ষীণ হয় না তো। আর, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদকে ক্ষীণ হতে হলে সূর্যাস্তের বহু পরবর্তী হতে হয় অর্থাৎ প্রত্যুষের কাছাকাছি উঠতে হয়। কিন্তু তাহলে অভিপ্রেত সন্ধ্যার পটভূমি পাওয়া যাবে কী করে?

প্রবন্ধের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে লেখক বলেছেন: 'বুদ্ধদেব বসু ছাড়া সমালোচকদের মধ্যে কেউই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই শ্রেণির বিবাদী বা সংবাদী সুরের উপস্থিতির দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন বলে জানি না।' বিবাদী ও সংবাদী শব্দ-দুটির যেহেতু পারিভাষিক অর্থ রয়েছে, অতএব আলোচ্য প্রসঙ্গে সংবাদী কথাটি, মনে হয় না, অপ্রযোজ্য? (সংবাদী সুর বা স্বর তা-ই, কোনো রাগে বাদী বা প্রধান সুরের পরেই যার প্রাধান্য। বিবাদী সেটি, যা কোনো রাগের অনুকূল স্বর কিন্তু কখনো-বা যার প্রতিভাসম্পন্ন স্বল্প প্রয়োগে রাগটির অভিনব শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে)। আর-একটি কথা। 'মৌন' শব্দটি তো বিশেষ্যই (সপ্তম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), যে-কোনো অবস্থাতেই। আমরা অবশ্য স্বচ্ছন্দে প্রায়ই একে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করি এবং এমনকী রবীন্দ্রনাথও আলোচ্য কবিতায় তা-ই করেছেন বলা যায়,

যদি তাঁর পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী 'মন্তরে' শব্দটির পরে কমা বাদ দিয়ে দিই এবং যার ফলে, সত্যিই, সব মিলিয়ে অর্থটি অনেক বেশি মনোমত হয়।

নরেশ গুহ

'দুঃসময়' কবিতায় আমি যে-আলোচনা লিখেছিলাম আপনারা তার তিনটি সমালোচনা ছেপেছেন। প্রত্যুত্তরে আমার দু'একটি বক্তব্য আছে:

পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারে ত্রুটি স্বীকার করলেও আমার মূল বক্তব্য কিছুমাত্র বদলায় বলে মনে হচ্ছে না। কবিতাটি যেহেতু ভৌগোলিক বর্ণনা সংক্রান্ত নয়, কাজেই 'মানব' না হয়ে নিম্নে যদিবা 'সাগর' গর্জায় তাহলেও না। এখানে 'সাগর'-এর অর্থ যে সাগর নয়, মানবসংসার এবং হয়তো বা আমরা যাকে পার্থিব জীবন বলি তা-ই, এ কথা আশা করি তর্কাতীত।

দেবেশবাবু আদি খসড়ার সঙ্গে 'দুঃসময়' কবিতার বিষয়ের মিল আছে বলেছেন! কবিতায় কাকে 'বিষয়' বলে আমি জানি না। যে যে শব্দ, চিত্রকল্প বা প্রতীক, ছন্দমিল শৃঙ্খলার সমন্বয়ে যে-পর্যায়ক্রমে রচনাতে প্রয়োগ করা হয় সেই সবের ফলাফল অনুধাবনের ওপরেই তো রচনাটির ক্রিয়া নির্ভরশীল? বিষয়ের কথা ভেবে কী লাভ? কোনো কবিতা প্রসঙ্গে যদি বলা যায় যে তার বিষয় হচ্ছে প্রেম বা মৃত্যু বা আশা কিংবা ওই রকম কিছু, তাতে কি কবিতাটির অনুধাবনে খুব বেশি সাহায্য হয়? আমার তো বিশ্বাস 'কবিতা-পরিচয়ে' অনুসৃত আলোচনা-পদ্ধতি এই ধারণার যথেষ্ট প্রতিবাদ।

খসড়ার তৃতীয় স্তবক দেবেশবাবু যেভাবে পড়েছেন তার একাংশ আমি স্বীকার করতে রাজি আছি। অথচ আশ্চর্য এই যে তবু আমার মূল বক্তব্য যা ছিল তা-ই থাকে। এই স্তবকে যদি অতীতের স্মৃতিমন্থন আছে বলেই ধরি তবু সে-অতীতে কিন্তু পূর্ণমিলন অভাবনীয়। দেবেশবাবু লক্ষ করেছেন, সেখানে কোকিলের মিনতি বিফলে যায়। এই কারণেই কি বিরহী বিহঙ্গ 'স্বর্গপথে' যাত্রা করেনি, বিরহান্তে পূর্ণমিলন যেখানে সম্ভব?—যে-কথা আমার লেখাটিরও বক্তব্য ছিল? খসড়ার ওই স্তবক বিষয়ে আমার কয়েকটি লাইন বাদ দিয়ে দেবেশবাবুর এই ব্যাখ্যা বসাতে আমার আপত্তি নেই যে এখানে অতীতের স্মৃতি-মন্থনই কবির অভিপ্রেত: কিন্তু তাই বলে তাঁর এ-ইঙ্গিত মানা অসম্ভব যে এই স্মৃতি-উদ্রেককারী অতীতে দুঃসময় ছিল না। স্বর্গেও সুসময়, পৃথিবীতেও তাই, দুঃসময় শুধু এপার গঙ্গা ওপার-গঙ্গার মধ্যে প্রসারিত আকাশখানাতেই— এইরকম কিছু কথা কবিতাটিতে আছে বলে কি দেবেশবাবুর অনুমান? তাছাড়া 'মহা আশঙ্কা' মানে 'উত্তরণের প্রতীক্ষা' বলে বুঝাতেও আমি অপারগ। আদি খসড়ার পরিত্যক্ত অংশ নিয়ে ভিন্ন একটি কবিতা প্রস্তুত করা হয়েছিল, শুভময়বাবু তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু তা থেকেও 'দুঃসময়' কবিতার গঠন সংক্রান্ত প্রশ্নের কিছুমাত্র মীমাংসা যে হয় না এ-কথা যদি আমার আলোচনাতে স্পষ্ট হয়ে না-থাকে সেটা তাহলে আমার রচনারই ত্রুটি, বোধ করি। শেষ স্তবকে 'উষা'-র পরে হাইফেন না-থাকলেও আছে বলে যাঁরা পূর্বেই ভেবে নিয়েছেন তাঁরা কবিতার আদর্শ পাঠক সন্দেহ নেই, কিন্তু যে-আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য কবিতার গড়ন সেখানে ওই ক্ষুদ্র চিহ্নটির আয়ব্যয়ের ক্ষমতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্বক, দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি সংগত মনে করেছিলাম। সেজন্য এখনো আমি দুঃখিত নই, কেননা এই লেখা ছাপা হবার পরেও দেবেশবাবু শেষ স্তবকের 'নিখিল নাস্তি' থেকে, দুই নয়, তিন অস্তিতে পৌঁছেছেন, 'নিবিড় তিমির'কে তিনি, বিশেষণ নয়, বিশেষ্য হিসেবে পড়েছেন বলেই। হাইফেন লক্ষ করলে নিশ্চয়ই এই অসতর্ক উক্তি তিনি করতেন না।

প্রতিবাদপত্রগুচ্ছের তৃতীয়টিতে আমার লেখার একটি গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ আছে। বিজয়া দাশগুপ্ত ঠিকই বলেছেন, ক্ষীণশশাঙ্ক কৃষ্ণপক্ষের নয়, শুক্লপক্ষের। ফলত, কবিতাটিতে আস্তিক্যের ইঙ্গিত আর একটু স্পষ্ট। একটু, তার বেশি নয়। কিন্তু অত জোর দিয়ে তিনি না-বললেই পারতেন যে 'মৌন' শব্দটি যে-কোনো অবস্থাতেই বিশেষ্যবাচক। শব্দটি বিশেষ্য একমাত্র নাট্যশাস্ত্রের অর্থে, যখন তা মানে দাঁড়ায়: ব্রীড়াব্যঞ্জক নীরবতা। বাংলা ভাষায় ব্যবহারকালে প্রধানত এটি বিশেষণ, এবং বাংলাভাষা যেহেতু 'সংস্কৃতের বংশধর নয়' (প্রমথ চৌধুরী) কাজেই এই বাংলা অর্থই আমরা প্রথম মানব।

শেষ পর্যন্ত তাহলে 'দুঃসময়' বিষয়ে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, এখনো চাই, তা হচ্ছে এই যে এটিকে আস্তিক্যের কবিতাই হয়তো বলা চলে, কিন্তু সে-আস্তিক্যবোধ প্রেরিত নয়, অর্জিত। অন্য অনেক অস্তিবাচক কবিতার তুলনায় 'দুঃসময়' তাই এমন নিবিড়ভাবে নাড়া দেয় আমাদের।

চিঠি তিনটিতে বর্তমান লেখকের নাম নানাবিধ প্রণালীতে উল্লেখ করা হয়েছে যার সবগুলি ঠিক সুখশ্রাব্য নয়। বাংলারীতি এবং উচ্চারণ-সৌষ্ঠবের কথা ভাবলে আমি সবিনয়ে বলতে বাধ্য যে শুভময় রায় এ-বিষয়ে অবিচার করেননি।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্ত সংকলন বছর
(মাস-সাল অনুল্লিখিত)

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড।
ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন।
ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া।
ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া।
মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া।
চেক রিপাবলিক। নেপাল।
নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়।
হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া।
অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ।
কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

রা ত্রি র ক য়ে ক প ং ক্তি

১

চোখে মিথ্যে, চুলে মিথ্যে, স্বরে মিথ্যে হাসে
জীবন কত কী খ্যালে
কেউ জেতে কেউ একা রাত্রি হয়ে মিশে যায় ঘাসে।
আমিও প্রস্থানপালা লিখে রাখি বুকে
পাথর সরিয়ে কেউ যদি দ্যাখে, কে জানে সে কবে,
সূর্যকেও দুঃখ দেওয়া মহাপাপ হবে।

২

বড়ই প্রাচীন রাত, তবু আর কতটুকু বাকি?
মৃত্যু মানে মৃত্যু তার আর কোনও অর্থ হয় না কি!

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে **কর্মক্ষেত্র**: www.ekarmakshetra.com

কলকাতার নানা স্ট্রিট, লেন বা বাই-লেন। জব চার্নক এ-শহরের পত্তন গড়ার ডাক দেওয়ার বহু আগে থেকেই একটু একটু গড়ে উঠেছে এই বর্ণময় শহর। এ-শহরের পায়ে-পায়ে ইতিহাস। এই শহর জায়গা করে নিয়েছে বহু কবি ও লেখকের সাহিত্যকর্মে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বর্তমান প্রতিবেদক কলকাতা শহরের নানা পল্লি, নানা রাস্তায় ফেলেছেন তাঁর পা-ছাপ। কখনও প্রধান রাস্তায়, কখনও অলিগলিতে ঘুরেছেন কাজে ও অকাজে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ, কখনও পেয়েছেন কোনও কবি বা লেখকের লেখায় সেই সব রাস্তার উল্লেখ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে বহু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত, সেই সব বইয়ের সাহায্য নিয়ে এই কলামে চিত্রিত সাহিত্যের সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাস।

স্ট্রিট লেন বাই-লেন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

শ্যামবাজার মোড়

জানো শক্তি, অনাময় মারা গেছে— এই বলে সুনীল বাসের মধ্যে দৌড়ে দুপরে—কিংবা

কে? মারা গেছে? কোথায়? ভর-দুপুরে? তারাদের তো কুলুজি ভর্তি করে থাকার কথা এখন— হাত আড়াল করে, তারা

ছিঃ শক্তি, অনাময়, অনাময় দত্ত গত পরশু (কোন হাসপাতালে?) থেকে আর নেই, তন্ময়ের ভাই—

তোমার শোকসভায় আমি যাইনি, তোমাদের নতুন বাড়ি শ্যামবাজার মোড় থেকে হেঁটে— জানি না কোথায়

(অনাময়ের স্মৃতি: শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

রাস্তায় দুই কবি-বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন, তন্ময় দত্তর ভাই অনাময় দত্তের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে এক বন্ধু সুনীল দৌড়ে উঠে গেলেন বাসের মধ্যে, অন্য বন্ধু শক্তি, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তখন সেই সংবাদের খেই ধরে প্রবেশ করলেন এক রহস্যময় কবিতার মধ্যে, যে

কবিতার শুরুটাই এক ঘোর রহস্যময়ঃ

দরজা বন্ধ থাকলে তোমাকে ডাকতে পারতুম

ভিতরে নেইই যদি—তবে সাড়া দিচ্ছ না কেন?

কবিতা লিখতে গিয়ে কবি তখন পাঠককেও দাঁড় করিয়ে রেখে গেছেন শ্যামবাজার মোড়ে। কোনদিকে অনাময়ের বাড়ি তা জানা নেই বলে এক মস্ত বিভ্রান্তি! পাঁচমাথার মোড় বলে খ্যাত এই জায়গা থেকে প্রধান পাঁচটি রাস্তা চলে গেছে কলকাতার নানা দিকে। কিন্তু অনাময়দের বাড়ি তো সেই বড় রাস্তায় নয় নিশ্চয়, কাছাকাছি অনেকগুলো তুতো-রাস্তা আছে সেখানেই হয়তো কোথাও! মোড় থেকে এগিয়ে গেলে কোনওটা শ্যামবাজার স্ট্রিট, অন্য দিকে একটু এগোলে— বাগবাজার স্ট্রিট। মোড় থেকে হাঁটা শুরু করে ঠিক কোনদিকে গেলে অনাময়দের বাড়ি!

আমি নিজেও তো শ্যামবাজারের অলিগলি তেমন চিনি না! শ্যামবাজার মোড় খুবই বিখ্যাত, সাতের দশকের শেষদিকে ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতায় মিটিং করতে এসে সন্ধের পর শ্যামবাজার মোড়ে পৌঁছতাম, এদিক-ওদিক তাকালে চোখে পড়ত একটা বাটার দোকান, সেই দোকানকে চাঁদমারি করে খুঁজে বার করতাম বাগবাজার স্ট্রিট। এখানেই ছিল একদা-বিখ্যাত 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিস। সেই কাগজের রবিবারের পৃষ্ঠায় আমি নিয়মিত লিখি, সে সব লেখা জমা দিতে যাই বিখ্যাত লেখক ও সম্পাদক প্রফুল্ল রায়ের কাছে। নানা বিদেশি কবি-লেখকদের অদ্ভুত জীবনযাপন নিয়ে লিখছি। রবিবারের পৃষ্ঠায় আমার প্রিয় কবি-লেখকদের নিয়ে লেখা বেরোনো মানে শরীর ও মনে প্রবল শিহরন। তখনও যতদূর মনে হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র এই মোড়ে অশ্বারূঢ় হননি। এত গাড়িরও ধকল নিতে হত না শ্যামবাজার মোড়কে। একেবারে

নীলনির্জন না-হলেও রাস্তা পার হওয়া যেত নির্ভয়ে। গাড়িগুলো এখনকার মতো ঘাড়ের ওপর এসে পড়ত না! তবে মোড়টা ছিল আরও ঘিঞ্জি, আরও সংকীর্ণ।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে আমার মতো বহু পাঠক তখন পাঁচমাথার মোড় থেকে এক অনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশে মনে মনে যাত্রা শুরু করেন, হয়তো একসময় পৌঁছে যান ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে বহু দূরত্বের এক পথ। কলকাতার পায়ে-পায়ে অসংখ্য ইতিহাস।

কলকাতা ক্রমশ কল্লোলিনী তিলোত্তমা হচ্ছে, কিন্তু তার সব ইতিহাস কি সংগৃহীত কোনও মহাফেজখানায়! শ্যামবাজার নামটিরও কি কোনও ইতিহাস রচিত হয়েছে কোথাও!

ওল্টাতে থাকি ইতিহাসের পৃষ্ঠা। শ্যামবাজার নাকি ঠিক এখানেই ছিল না প্রথমে! 'কলকাতার ইতিবৃত্ত'-র লেখক প্রাণকৃষ্ণ দত্তের মতে 'শ্যামবাজার, বর্তমান শ্যামবাজারের দক্ষিণ দিকে ছিল। সার্কিউলার রোড প্রস্তুতের সময় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। হলওয়েল সাহেবের ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে পুরাতন বাজার তালিকামধ্যে ওই শ্যামবাজারকেও নূতন শ্যামবাজার বলা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান করা হয়, ১৭৫০ খ্রীঃ পূর্বে কম্বুলিয়াটোলাতেই পুরাতন শ্যামবাজার ছিল। শকের মানচিত্র অনুযায়ী বেলগাছিয়া খালের পূর্বপারে, বর্তমান আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের মোটামুটি বিপরীতে শ্যামবাজার গঞ্জ বলে চিহ্নিত রয়েছে।'

ইতিহাসের পৃষ্ঠা আরও উল্টে দেখি, পলাশি যুদ্ধের এগারো বছর পরে ১৭৬৮ সালে প্রকাশিত কলকাতার আঠারোটি 'তৌবাজারি' (যে বাজারের দোকানগুলি থেকে আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদির শুল্ক আদায় করার জন্য ডাক হত) বাজারের তালিকায় শ্যামবাজারের উল্লেখ নেই, কিন্তু হাটখোলা বাজার, সুতানুটি বাজার, শিমলা বাজারের সঙ্গে উল্লেখ আছে কোনও এক 'চার্লস বাজার', যে-বাজারটির অস্তিত্ব আর কোনও সরকারি নথিতে পাওয়া যায়নি, সে-কারণে কেউ কেউ মনে করেন এই চার্লস বাজার নামটি তালিকায় লেখা হয়েছে ভুলক্রমে, এই বাজারটিই আসলে শ্যামবাজার হবে, কেন না এরকম একটি তালিকায় শ্যামবাজারের নাম থাকবে না তা কি কখনও হয়! সেই 'চার্লস বাজার'এর বাৎসরিক জমার পরিমাণ একশো চল্লিশ সিক্কা টাকা যেখানে দেখা যাচ্ছে শোভাবাজারের জমা টাকার পরিমাণ দুশো পঁচাত্তর সিক্কা টাকা।

কিন্তু শ্যামবাজারের নাম কেন শ্যামবাজার হল তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

১. কটন সাহেবের মতে, পলাশি আমলের বিখ্যাত শোভারাম বসাকের দালানে অধিষ্ঠিত শ্যামরায় বিগ্রহের নাম থেকে বাজারের নাম হয়েছে শ্যামবাজার।

২. 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' গ্রন্থের লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন প্রাণকৃষ্ণ দত্তের উক্তি, 'এই এলাকায় শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তিনি নিজের অর্থে এখানে খনন করেছিলেন একটি বিশাল পুষ্করিণী, সেই পুষ্করিণীর নিকটস্থ শ্যামবাজারও তাঁরই সম্পত্তি ছিল। তাঁর নামেই শ্যামবাজার। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র মনোহর মুখোপাধ্যায় এই এলাকায় নির্মাণ করেছিলেন একটি বালাখানা (বা বৈঠকখানা), সেই জায়গাটির বর্তমান নাম বালাখানা স্ট্রিট।'

৩. 'এ শর্ট হিস্ট্রি অফ ক্যালকাটা' গ্রন্থের লেখক অতুলকৃষ্ণ রায়ের মত আবার ভিন্ন, তিনি উল্লেখ করেছেন শেঠ বসাক পরিবারের নাম, তাঁদের এক নামীদামি মানুষ শ্যাম বসাকের নামে হয়েছে শ্যামবাজারের নাম।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের এবার বিভ্রান্তি ঘটে। এরকম বিখ্যাত শ্যামবাজার মোড়, তার সংলগ্ন শ্যামবাজার স্ট্রিট, কিন্তু কেন যে তার এরকম নাম হল তা নিয়ে কতরকম মত, আর কোন মতটি অভ্রান্ত তা নিয়ে আজও কোনও চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি!

তবে পুরনো কলকাতার নামকরণের অনেক ইতিহাস বিস্মৃতিতে ডুবে গেলেও হারিয়ে যায়নি রাস্তাগুলির গড়ে ওঠা। চৌরঙ্গি রোড থেকে শ্যামবাজার— এখন যে-রাস্তার অনেকগুলি নাম: চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ, গিরিশ অ্যাভেনিউ, ভূপেন বোস অ্যাভেনিউ— এই দীর্ঘ রাস্তাটি ১৯২২-এ নির্মাণ করেছিল কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট। তার মাত্র এক বছর আগেই অনুমোদিত হয়েছে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আইন। কলকাতার প্রথম দিকে যে কয়েকটি মাত্র রাস্তা তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে এটি একটি।

শ্যামবাজার থেকে অন্য প্রধান রাস্তা সার্কুলার রোড (পরবর্তীকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড) তৈরি হয়েছিল মারাঠা খাত বুজিয়ে, ১৮৬৩তে। পাকা হয়েছে অনেক পরে।

রাস্তা তো হল, এখন যানবাহন! কবেই বা চেরোট, পালকি গাড়ি, ব্রাউনবেরি, বগি, জুড়িগাড়ি, চৌঘুড়ি, ফিটন ইত্যাদির যুগ পার হয়ে এখানে চালু হল বাস-ট্রাম ইত্যাদি যানবাহন!

ঘোড়ায় টানা ব্রাউনবেরি চালু হয় ১৮২৭এ। ঘোড়ায় টানা বাস প্রথম চলেছিল ১৮৩০ সালে। ঘোড়ায় টানা ট্রাম প্রথম চলেছিল ১৮৭৩-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি। আর তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটল ১৯০২-এর ২৭ মার্চ। সেই ট্রাম খিদিরপুর লাইনে। কিন্তু শ্যামবাজারে ট্রাম চলতে দেরি হল অনেক। রাধারমণ মিত্র জানাচ্ছেন ১৯৪১ সালে রাজাবাজার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত চালু হয় আপার সার্কুলার রোডে ট্রামলাইন।

আর প্রথম মোটর চালু হয় ১৯২২ সালে। বাস ১৯২৬-এ। রাধারমণ মিত্র জানাচ্ছেন, '১৯২৬ সনে ওয়ালফোর্ড কোম্পানি শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রিট, বৌবাজার, রাসমণি বাজার থেকে ডালহৌসী হয়ে কালীঘাট পর্যন্ত বাস চালাবার ব্যবস্থা করে। কিছুদিন পরে ট্রাম কোম্পানিও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শ্যামবাজার থেকে আলম বাজার ও বেলেঘাটা রাসমণি বাজার থেকে ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত বাস চালু করে। ট্রাম কোম্পানির সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় ওয়ালফোর্ড কোম্পানি উঠে যায়, ট্রাম কোম্পানিও নিজের বাস সার্ভিস বন্ধ করে দেয়।'

আর দোতলা বাস চালু হল আরও পরে। সেই দোতলা বাসের প্রাথমিক চেহারা ভারি মজার তা আমরা পাই অহীন্দ্র চৌধুরীর ভাষায়, '...বেন্টিক স্ট্রিটের পূর্বদিকে— লালবাজারের মোড়ে পৌঁছবার কিছু আগে— একটা (সরকারি নয়, প্রাইভেট) ডিপোমতন ছিল, সেখানেই প্রধান আড্ডা হল (লাল রঙের) বাসগুলির। এরাই প্রথম দোতলা বাস আনল কলকাতায়। ডবল ডেকার বাস যা আজকাল দেখা যায়, তার মতো ছাদওয়ালা নয়। বৃষ্টিতে সব ছাতা মাথায় বসে আছে দোতলায়, আর বাস চলেছে। গ্রীষ্মের সময় প্রচুর হাওয়া। লোকে হাওয়া খেতে বাসে উঠত। কালীঘাট থেকে এক বাসে শ্যামবাজার গিয়ে, আবার ওই বাসেই কালীঘাটে ফিরে আসা, এ তখন ছিল বহু লোকের শখ।'

কিন্তু আমরা যারা একটু পুরনো যুগের মানুষ, সেই ষাটের দশক থেকে কলকাতার অদলবদল দেখছি, তারা দোতলা বাসে চড়তে খুবই অভ্যস্ত ছিলাম। দোতলা বাসের দোতলায় যাওয়া-আসার যে কী মজা তা এখনকার ছোটরা জানলই না!

ছি ন্ন বি চি ন্তা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গর্বের গ্রন্থঘর: কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি

কবি কি কেবল পাপিয়াকুহরে বোধ করবেন কাব্যস্বাদ, কাব্যপ্রেরণা? গ্রন্থপাঠ করবেন নদীতরঙ্গে, গিরিশালায় পড়বেন নীতিপাঠ, ঐকাত্ম্য লাভ করবেন তরুবল্লরীর ছন্দমর্মরের? কবি কি কেবলই স্বভাবকবি? স্বভাবকবিত্বমূলক লোকবলয়ের, শ্রমশিক্ষা পরিশীলন কবির নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ গগন হরকরার সমঝদার, কিন্তু নিজে বাতি পুড়িয়ে উজাগর রাত পুইয়েদের পড়ার তৃষ্ণা পান করতে। একটি লেখাকে সংশোধন করেছেন বারবার যোগ্য রূপ দেওয়ার তাড়নাতে। পরে তাঁরই ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগার। তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথ ছিলেন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির প্রোপাইটর বা প্রথম অংশীদার। সেই হল কলকাতায় সাধারণজনের জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ— গ্রন্থাগার

পর্ব: ৩

বসতের পুজোমণ্ডপের লাগোয়া ক্লাবঘরে লাইব্রেরি বসল। একজন তাঁর ঘরের একটা আলমারি দান করলেন। দুটো সস্তা বুক-র‍্যাক তৈরি করিয়ে নেওয়া গেল। বইয়ে স্ট্যাম্প করে, নম্বর লাগিয়ে ঋণযোগ্য করে তোলা হল।

চালানোর জন্য ডাক্তার এফ পি স্টুং তাঁর ১৩ নম্বর এস্প্লানেড রো-এর বাড়ির নীচতলা বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের সেই হল গোড়াপত্তন, আজকে যে বেলভেডিয়ারের ভাষাভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। তার বইয়ের তালিকা দেখলে দেখা যায় কত কত ব্যক্তিগত দুর্মূল্য সংগ্রহ তাকে পুষ্ট করে তুলেছে।

এ হল সবার জন্য গ্রন্থাগার। যদিও শিক্ষার্থী, গবেষণাকর্মী, অধ্যাপনরতজনই বিশেষ উপকৃত হন এখানে যাওয়া আসা করে। অনেক ব্যক্তিগত সংগ্রহও এখানে এসে মিশেছে। যেমন স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বহু বিচিত্র বিষয়ের বিপুল সংগ্রহ। কিংবা বহরমপুরের প্রসিদ্ধ লেখক রামদাস সেনের সংগ্রহ। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দুর্লভ্য বই সংগ্রহ আজ রয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে।

কবিদের সংগ্রহের কথা বলি। কাছাকাছি সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নানা ভাষার কাব্য আর কাব্যানুষঙ্গী বিষয়ের বইও শোভা পাচ্ছে আজ পরিষদে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সংগ্রহ গেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক'জনারই বা সংগ্রহের কথা আমরা জানি। তাঁদের পাঠরুচি জানারই বা কী উপায়? সংরক্ষণ পাওয়ারও উপায় বড় নেই। কিন্তু প্রত্যেক কবি-লেখকেরই যে একটা স্বতন্ত্র বইয়ের বলয় আছে, তাঁদের লেখা পড়ে তা মনে হয়। যে ঔপন্যাসিকদের মুখ্য তাঁদের সামাজিক অবধান আর পর্যবেক্ষণ, তাঁদেরও একটা নিজস্ব গ্রন্থবলয় নিশ্চয় আছে। যখন ছাপার যন্ত্র আসেনি এমন বহুল সংখ্যাধিক্য ছিল না এক বইয়ের, কিন্তু এক রচনার বহু পুঁথি দেখা গিয়েছে বিভিন্ন স্থানে। ছাপা-যন্ত্রের কাজ ছিল নানা স্থানের পুঁথিলেখকের, লিপিকারের। পুঁথির সংগ্রহ ছিল মন্দিরে বিহারে রাজকীয় পুঁথিশালায়। ব্যক্তিগত সংগ্রহের কমি থাকলে অভিলাষীজন কে এমন সহায় গ্রহণ করেননি? কেবল প্রকৃতিপাঠের রসজ্ঞতাতেই কি লেখা গিয়েছিল মেঘদূতের অমন ঘননিবদ্ধ শ্লোকসমুদায়, হিমালয়সানু থেকে দক্ষিণবিস্তারী আর্যাবর্তের অতখানি সানুপুঙ্খ ভূগোল বিবরণ? কালিদাসের নাটক থেকেই যে জানা গেল সৌমিল্ল কবিপুত্র ভাসের নাটকের কথা, যার প্রথম দুই নাট্যকারের লেখা আজও মেলেনি। কোথা থেকে পেলেন সেসব নাট্যলেখা? রঘুদিগ্বিজয়ের দেশ পরিক্রমার অত তথ্যই বা জানলেন কোথা থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অতিগ? অশ্বঘোষের কাব্যও পড়েছিলেন কালিদাস, তাঁর বাড়ি সাকেতে (অযোধ্যায়), উজ্জয়িনী থেকে ঢের দূর। তাঁর সময়ও কালিদাসের না-হোক দু'শো বছর আগে। যে রাজসভার তিনি সভাকবি সেই বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুঁথিভাণ্ডাগার কি পাননি প্রয়োজনে?

বিদ্যাপতি কবিও মিথিলার কীর্তিসিংহ রাজার রাজকবি। অবহট্ঠে লেখা 'কীর্তিলতা' কাব্য লিখেছিলেন তিনি। কীর্তিসিংহেরই কাহিনি। তুর্কি আক্রমণের যে সন্ধিক্ষণের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাব্যখানি স্থাপিত সে শুধু রাধাকৃষ্ণলীলার চিরায়ত নয়, বহুতথ্যভারবহ। তাতে পুঁথিশালার আবশ্যক করে। আমাদের কৃত্তিবাস কবি বড়গঙ্গা পার হয়ে উত্তর দেশে বিদ্যা অর্জন করতে গেলেন। বিদ্যা সমাপন করার পর তিনি হলেন ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস। লোক বুঝাইতে তাঁর কাব্য রচনা, কিন্তু পণ্ডিত বলেই জানেন নিজেকে : 'মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি। পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী।।' পণ্ডিত না হলে পরে লোকে নিঃশর্তে শিরোধার্য করবে কেন কবিকথা?

আরেক কবির কথা বলি যদি স্বগুণেই সর্বজনপরিচিত তিনি : 'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।' কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে গুণকর উপাধি দিয়ে মূলাথোড় গ্রামখানি দান করে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর গুণালীক্রমে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় কৃতবিদ্য, রামচন্দ্র মুনসীর বাড়িতে থেকে পারস্য ভাষা অধ্যয়নকালে মুনসীবাড়ি সত্যনারায়ণের সির্নির অনুষ্ঠানে স্বরচিত সত্যপীরের পাঁচালি পাঠ করে উপস্থিতজনেদের মোহিত করেন। তাঁর যাবনী মিশাল ভাষা রচনারও এখানেই সূত্রপাত। শুধু ফারসি মিশ্র সাবলীল বাংলা নয়, অন্নদামঙ্গল পড়লে দেখি বিবিধ পুরাণ, মনু, কালিদাস মাঘ আদি কবির বয়ান বা প্রসঙ্গের অনায়াস ব্যবহার, সমকালীন ইতিহাসের বিস্তার পটভূমি। বহু পাঠ ব্যতিরেকে তা হয় না।

কোথায় পাওয়া যাবে এত পাঠ্য পুঁথিশালা বিনা? রামচন্দ্র মুনসী সত্যপীরের সির্নি উপলক্ষে ঘর থেকে 'পুঁতি' আনতে চেয়েছিলেন, ভারত তাঁকে নিবৃত্ত করে নিজের রচনাই অনুষ্ঠানে পাঠ করেন। পুঁথির সঞ্চয় তবে ছিল ঘরেও। পুরনো যত লেখার ইতবৃত্ত সে তো জানা গিয়েছে পুঁথি থেকেই। তুর্কি আক্রমণের দিনে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে মন্দির বিহার উজাড় করে সে পুঁথি আশ্রয় নিয়েছিল নেপালে তিব্বতে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজার পুঁথিশালা থেকে উদ্ধার করে আনলেন বাংলা সাহিত্যের পুরাতনতম রচনা 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'। তারও আগে শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতের রাজধানী লাসার পোতালা রাজপ্রাসাদের পুঁথিশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন কবি ক্ষেমেন্দ্রের লুপ্ত কাব্য 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা'। শরৎচন্দ্র দাসের লামার ছদ্মবেশে দার্জিলিং থেকে লাসার দুর্গম পাহাড়ি পথে পায়ে হেঁটে অথবা জো-এর পিঠে চেপে অভিযাত্রার বিবরণ তিনি নিজেই রক্ষা করেছেন 'এ জার্নি টু লাসা' বইয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উত্তরসূরি হিসেবে শশীভূষণ দাশগুপ্ত পুনরায় সন্ধান করতে গিয়েছিলেন কাঠমাণ্ডুর রাজকীয় গ্রন্থশালা। নিয়ে গিয়েছেন পরবর্তী দিনে একই ধারায় লেখা সব চর্যাপদ।

আদি আর্য ভারতীয় রচনা থেকে কতক দিন আগে পর্যন্তও পুঁথি ছিল সর্বদেশ বিস্তারী। কত যত্নে লিপি করা ভূর্জপত্ত-তাড়িপাতে, তুলোট কাপড়ে বা কাগজে। কত যত্নে পুঁথির সে পাতড়া গ্রন্থনা করে রাখবার পাটা। কত কারু তাতে, এমনকী পুঁথির লিপিতে। কোরান হাতে লিখে অনুলিপি করা মহাপুণ্য কাজ, নবাব-বাদশারাও এই পুণ্যভাগী হতে চেয়েছেন। আরবি লিপির চাইতে নাগরী কম নয়, সেও দেবনাগরী। সে লিপিকে স্থায়িত্ব দিতে মসী বানাবারই বা কত করণ। বাংলা পাঠশালায় সেদিনেও পোড়ো যেত তাড়ি বগলে, অমৃতলাল বসু পোড়োর মসী বানানোর করণ লিখেছেন : 'আতপ চাল হাঁড়িতে চড়িয়ে চুঁইয়ে তা থেকে বাঙ্গলা কালি তৈরি করে দিতেন পোড়োদের মা-ঠাকুরমারাই।' পুরনো একটা কালিপ্রস্তুতের ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন পঞ্চানন মণ্ডল, এখানে উদ্ধৃত করেনি :

লোধ লাহা লোহার ওঁড়ি /অর্কাঙ্গার সবার কুড়ি /গাবের ফল হরীতকী /ভৃঙ্গার্জুন আমলকী / বাবলা ছাল জাঁটির রস /ডালিম সেছে করিবে কম / ভেলায় কব্য এক আলি / চারিযুগলা উঠবে কালি

নিশ্চয় ভালো কালিই উঠবে। কিন্তু ডটকলম জেলকলমের যুগে তার আর দরকার কেউ বোধ করবেন না। পুঁথির কথাতেই ফিরি। চিত্রণের বহুতর অবকাশ ছিল আমাদের পুঁথিতে। কাঠের পাটাতেও। আসলে মধ্যযুগের মোগল রাজপুত গুজরাটি ছবি সব কোনও-না-কোনও কাব্যকাহিনির চিত্রায়ন বা ইলাস্ট্রেশন উপলক্ষেই আঁকা।

আরও একটা কথা। লিপিলিখন বা ক্যালিগ্রাফিও চিত্রাঙ্কনেরই একটা প্রকারভেদ। তার আলোচনা হয়েছে মধ্যযুগেই। আইন-ই-আকবরীর ৩৪তম অধ্যায়ের নাম 'হস্তলিপি ও চিত্রশিল্প', সেখানে আটরকম হরফশৈলির কথা আছে, অবশ্যই আরবি হরফ। বাংলাতে একালেও কত ধারার ছাপার হরফের নমুনা দেখেছি বইয়ের পাতে, কারও না কারও লেখার ছাঁদে বানানো সে হরফ। একটি পুঁথি নিজেই চিত্রকর্ম হয়ে উঠতে পারে। তার পাতায় পাতায় নকশাপাড় দেয়। থাকতে পারে, ছবি আর কাব্যের পাঠ মিলিয়ে তৈরি হতে পারে এক-একটি পাতা। পুঁথির পাতড়ার মাঝখানে বাঁধবার সুতো গলাবার জন্য যে ফুটো করা হয়, সেখানে দু'টি রংয়ের ফুটকি বসিয়ে চারপাশ ঘিরে থাকতে পারে অলঙ্করণ। চিত্রে লিপিতে মিলন ঘটিয়ে যে লেখা, বা ছবি, তার সূত্রে মনে পড়ল একালের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষ্ণলীলা সিরিজের ছবিগুলির কথা। অবশ্য তার চিরায়ত দৃষ্টান্ত ব্লেকের হাতে লেখা চিত্র করা কাব্যগুলি। সে তাঁর নিজেরই লেখা গীতিকবিতা বা মহাকাব্যোপম বইগুলি, অপর রচনা বা তার ইলাসট্রেশন নয়। আর সে সব অনবদ্য পুঁথি, নিজস্ব উপায়ে তামার পাতের উপর এচিং করা, তার বহুবর্ণ ছাপ নিয়ে স্থায়িত্ব দেওয়া।

সারা জীবনে তাঁর লেখা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, শুধু পাগলা কবি বলে তাঁর নাম করে দিয়েছিল।

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত,
দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায় ₹৯৯

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস

বিষাদগাথা

হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত
বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে
দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র
কিংবা সমকালীন রূপকথা।

₹২০০

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: info@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

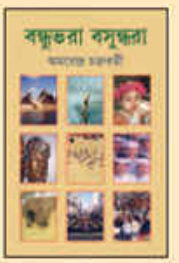

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▸ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
কালের কষ্টিপাথর
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 2 No. 9 □ 1 April 2014 □ Rs. 30 RN WBBEN/2012/50069 Postal Regn. No. KOL RMS/460/2014-2016

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd.
Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd.,
Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com